ডা. বিধানচন্দ্র রায় :
জীবন ও সময়কাল



দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

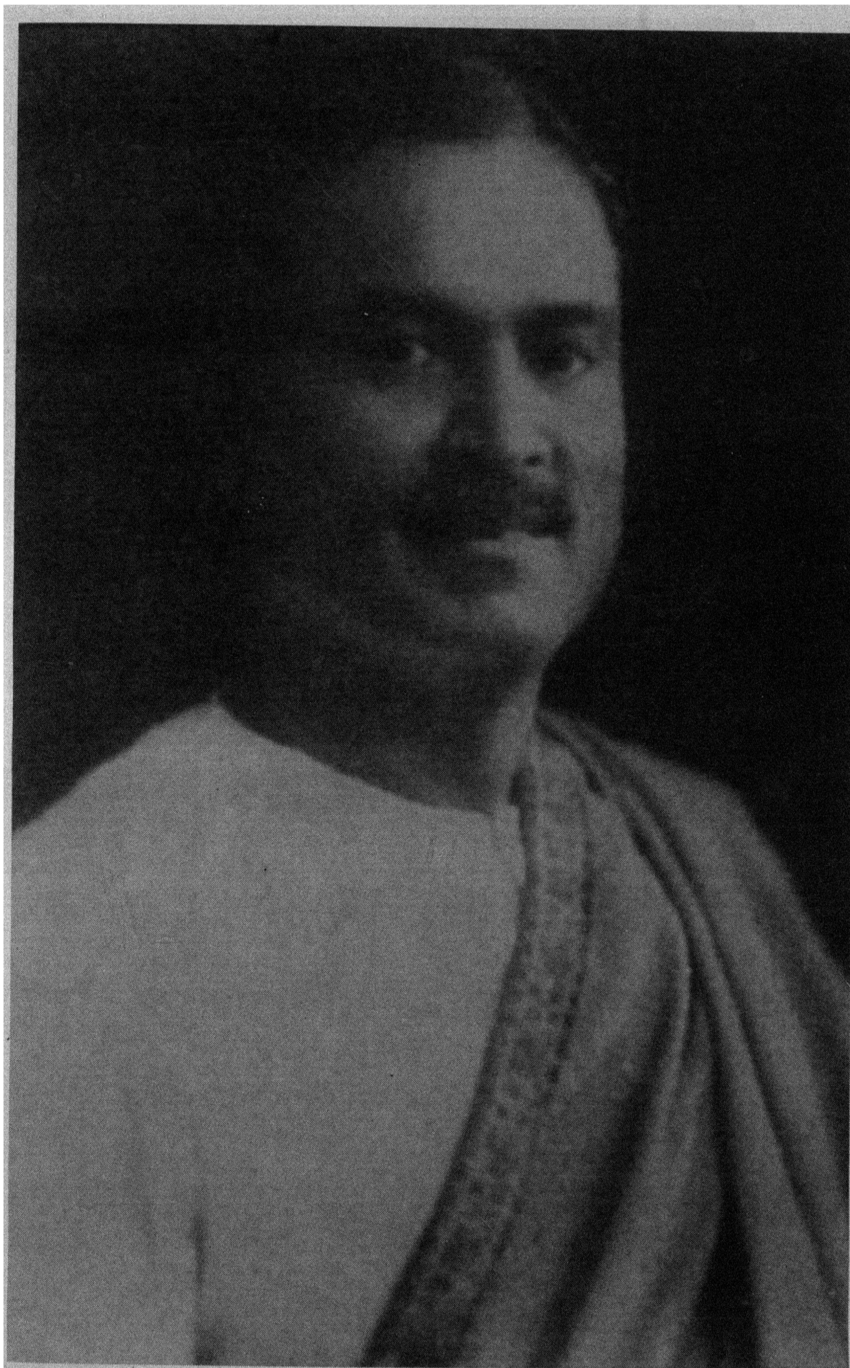
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৬০

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

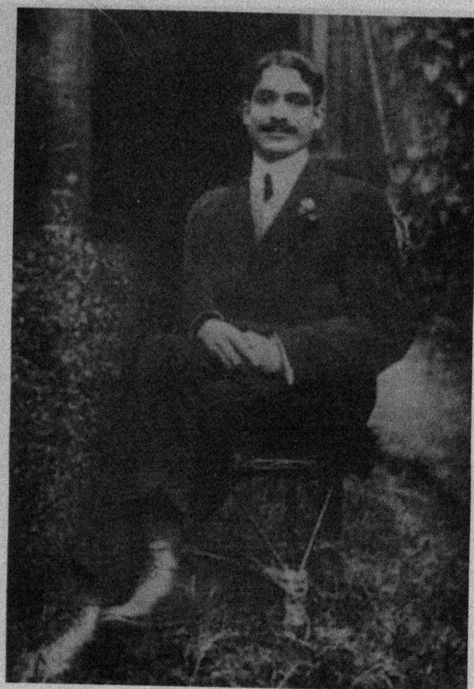
বর্ণ-সংস্থাপনা · দিলীপ দে। লেজার অ্যান্ড গ্রাফিকস্
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে। দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

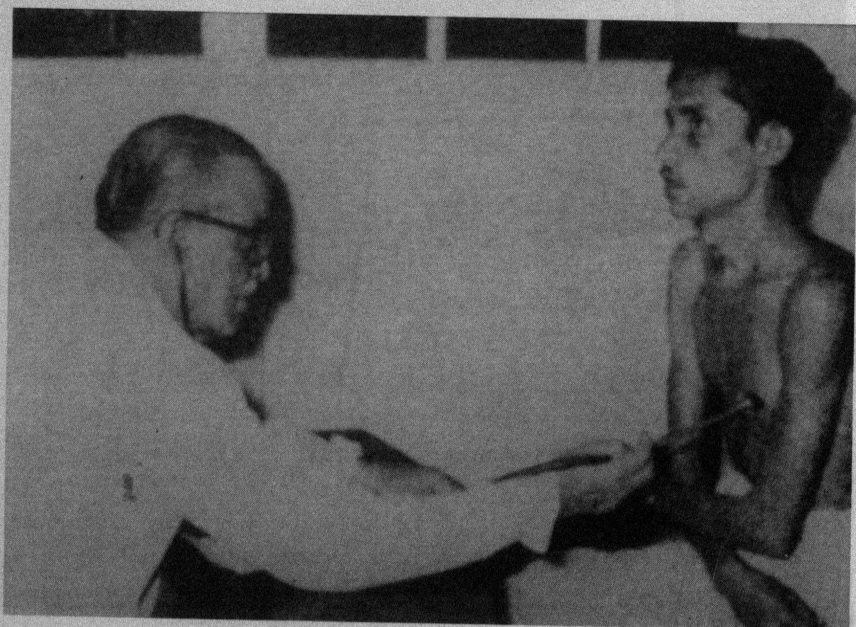
সূচি



ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়



তখন লন্ডনে, ডাক্তারির ছাত্র।



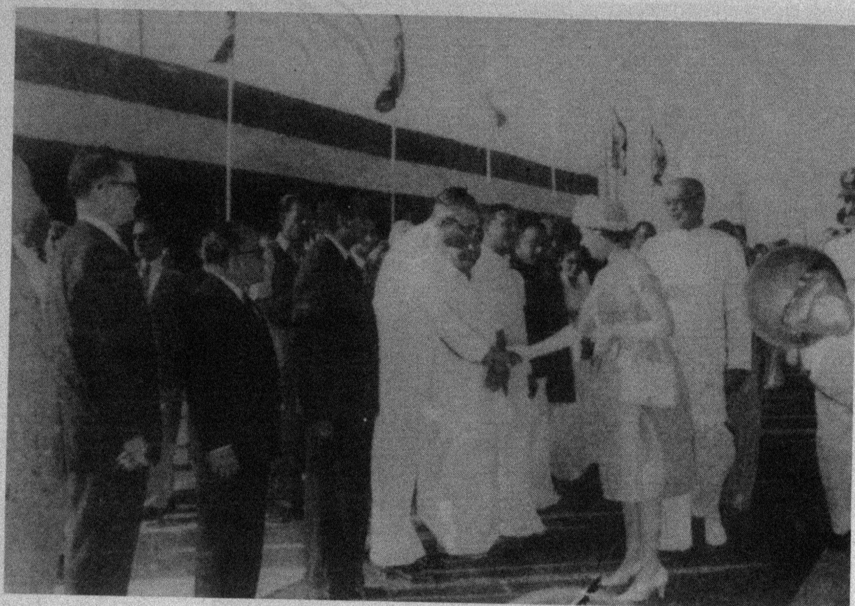
রোগী দেখছেন ডাঃ রায়।



কল্যাণী কংগ্রেসে জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে।



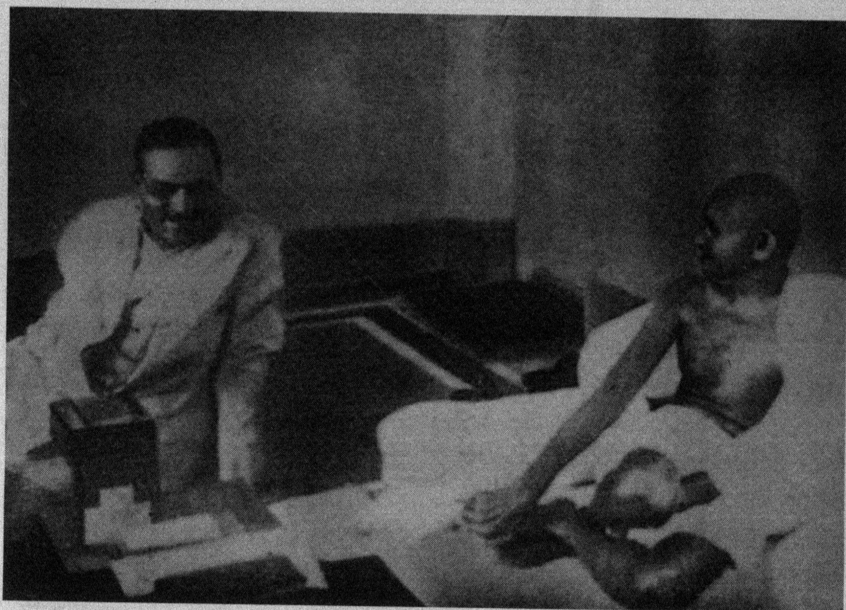
দমদম বিমানবন্দরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী
জওহরলাল নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে।



রানি এলিজাবেথের সঙ্গে।



শেখ আবদুল্লা, অতুল্য ঘোষ, জওহরলাল নেহরু ও অন্যান্যদের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টের সফরকালে, বিমানবন্দরে।



মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে।



দিল্লিতে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে।



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে।



ডাঃ. রায়ের সঙ্গে লেখক, মিশরের প্রেসিডেন্ট কর্নেল নাসের ও জওহরলাল নেহরু দমদম বিমানবন্দরে। — ছবি : অমিয় তরফদারের সৌজন্যে



অন্তিম শয়ান। শেষ শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, পদ্মজা নাইডু, অতুল্য ঘোষ, প্রফুল্ল সেন ও অন্যান্যরা।

১

বাল্যকাল এবং প্রথম শিক্ষালাভ

দেশ বিভাগোত্তর নয়া পশ্চিমবাংলা রাজ্যের রূপকার, বিশ শতকের ভারতের জাতীয় জীবনের প্রখ্যাত নেতা ও দেশের কিংবদন্তি চিকিৎসক বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম হয় ১৮৮২ সালের ১ জুলাই বিহারের পাটনা শহরের সংলগ্ন বাঁকিপুরে। তাঁর পিতা ছিলেন প্রকাশচন্দ্র রায়। বাংলার মধ্যযুগীয় ইতিহাসের প্রবাদপ্রতিম বারো ভুঁইয়াদের অন্যতম যশোরের মহারাজা প্রতাপাদিত্যের বংশধর। বাঙালির অস্তিত্ববোধের মুহূর্ত থেকে একথা সুবিদিত যে মুঘল সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে যে বাঙালি প্রথম বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত করেছিলেন তিনি হলেন প্রতাপাদিত্য রায়—বাংলার লোক-গাথায় যাঁর পরিচয় 'যশোর নগর ধাম মহারাজা প্রতাপাদিত্য নাম'। প্রতাপাদিত্যের বিদ্রোহ দমন করতে সম্রাট জাহাঙ্গির মেবার অধিপতি মহারাজা মানসিংকে বাংলার গভর্নর করে পাঠিয়েছিলেন।

প্রকাশচন্দ্র রায়কে জীবনের প্রথমদিকে অভাব ও অনটনের সঙ্গে যুঝতে হয়েছে। বহরমপুর থেকে তিনি এন্ট্রাস (এখনকার স্কুল ফাইন্যাল) পরীক্ষায় পাস করেন। কলেজে ভর্তি হলেন। কিন্তু অর্থাভাবে কলেজের শিক্ষায় বিঘ্ন ঘটল। ওই সময় তিনি খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন এবং প্রায় খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে চলেছিলেন কিন্তু ওই সময়েই আবার তিনি ব্রাহ্ম সমাজের কয়েকজন প্রচারক বিশেষ করে কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে আসেন : মূর্তিবিহীন বেদান্তমতে অর্চনা ও প্রার্থনায় তাঁর গভীর আগ্রহ জন্মে। অবশেষে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন এবং নিজেকে ব্রাহ্ম সমাজের একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এদিকে দারিদ্র্য তাঁর পিছু ধাওয়া করাতে তিনি প্রথমে বহরমপুরে পোস্টমাস্টারের চাকুরি নেন এবং পরে কলকাতায় একটি ছাপাখানায় চাকুরি পেয়ে সেখানে চলে আসেন। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রকাশচন্দ্র রায় বি-এ পাস করলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তৎকালীন বঙ্গীয় সরকারের অধীনে আবগারী ইন্সপেক্টরের (Excise Inspector) চাকরি পেলেন। ১৮৬৮ সালে প্রকাশচন্দ্র বিপিনচন্দ্র বসুর সুন্দরী কন্যা অঘোরকামিনী দেবীকে বিবাহ করেন। অঘোরকামিনী সুন্দরী হলেও বিয়ের সময় তিনি একেবারেই লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু প্রখর বুদ্ধিমতী ছিলেন। স্বামী প্রকাশচন্দ্র তাঁকে প্রথমে বাংলা ও পরে ইংরেজি শেখাতে আরম্ভ করলেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের জোরে তিনি বাংলা ও ইংরেজিতে বলা কওয়া ও লেখায় পারদর্শী হলেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে অঘোরকামিনী ব্রাহ্ম সমাজের সকল অনুশাসন ও বৈদান্তিক ক্রিয়াকলাপ শিখে একজন সক্রিয় ব্রাহ্ম সমাজবাদী হয়ে উঠলেন। নারী

শিক্ষার প্রচারক হয়ে তিনি বিদ্যালয়ে মেয়েদের পড়াতেন ও ব্রহ্ম উপাসনা ও সংগীত শেখাতেন। স্বামী-প্রকাশচন্দ্র সামান্য সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত থাকার ফলে মাঝে মাঝে বদলি হতেন। এ অবস্থায় তাঁদের সংসারে অভাব এসে যেত। কিন্তু অঘোরকামিনী সেদিকে দৃকপাত না করে নারীশিক্ষার বিস্তারে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতেন। ১৮৬৮ সালে বিয়ের পর থেকে পরবর্তী ১৪ বছরে পাঁচটি সন্তান জন্ম নেয়। এদের মধ্যে প্রথম দুজন কন্যা ও পরের তিনজন পুত্র। এই পুত্ররা হলেন সুবোধ, সাধন ও বিধান। ওই সময়ে প্রকাশচন্দ্র তাঁদের সাংসারিক জীবন নিয়ে 'অঘোর প্রকাশ' নামে ইংরেজিতে দিনলিপির আকারে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর এই রচনা তৎকালীন বাঙালি সমাজজীবনের একটি প্রতিচ্ছবি। তাঁদের প্রথম দুই কন্যা যখন বড় হয়ে উঠছে সেই সময় অঘোরকামিনী উচ্চতর ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তিনি তখন তাঁর দুই মেয়েকে নিয়ে লখনউতে ইসাবেলা থোবর্ন কলেজে (Isabela Thoburn College) এক বছরের জন্য পড়তে এলেন। ভারতীয় মেয়েদের মধ্যে উচ্চতর ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের অগ্রগণ্য এই যশস্বিনী ইংরেজ মহিলা ইশাবেলার সঙ্গে অঘোরকামিনীর নিবিড় বন্ধুত্ব হয়ে গেল। এই মিশনারি মহিলার উৎসাহে এবং অন্তরের অফুরন্ত তাগিদে অঘোরকামিনী পাটনার বাঁকিপুরে মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। স্বামীর সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে এবং অন্য কারো অর্থানুকূল্য ছাড়া তিনি এই বিদ্যালয় পরিচালনা করেছেন। এই বিদ্যালয়টি পরবর্তীকালে সরকারি বিদ্যালয় হিসাবে পাটনায় নারীশিক্ষার অগ্রগণ্য শিক্ষায়তনে পরিণত হয়। পরে কোনও এক সময়ে বাঁকিপুরে অঘোরকামিনীর নামে মেয়েদের আর একটি বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে বিধানচন্দ্র রায় তাঁর এই মহীয়সী মা-র নামে দীঘার সমুদ্র সৈকতাবাসে একটি সরকারি চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন।

১৮৮২ সালে প্রকাশচন্দ্র ও অঘোরকামিনীর কনিষ্ঠ সন্তান বিধান জন্মাবার কিছু আগে প্রকাশচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করলেন তাঁর নয়া অনুশাসন 'নববিধান'-এর মাধ্যমে। বিধানের জন্মের পর পিতা প্রকাশচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পরামর্শ চাইলেন পুত্রের নামকরণের জন্য। কেশবচন্দ্র সেন তাঁর 'নববিধান' অনুশাসনের সঙ্গে মিল রেখে প্রকাশচন্দ্রকে পুত্রের 'বিধান' নাম রাখতে বললেন। বন্ধুর কথা গ্রহণ করে প্রকাশচন্দ্র তাঁদের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রাখলেন বিধানচন্দ্র রায়। নবজাতকের নামকরণের সময় প্রকাশচন্দ্র ও অঘোরকামিনী পুত্রের মাথায় হাত রেখে পরমপিতার কাছে যে আশীর্বাদ চেয়েছিলেন, পরমপিতা সকলের অলক্ষ্যে তাঁর অদৃশ্যলিপি আশীর্বাণী বিধানের ললাটে লিখে দিয়েছিলেন। বিধানচন্দ্র তাঁর সমগ্র জীবনে জাতিকে সর্বক্ষেত্রে নতুন নতুন বিধান দিয়ে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন। এখানেই হল তাঁর 'বিধান' নামের সার্থকতা। বিধানের জন্মের তিন বছর পর প্রকাশচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও

ডেপুটি কালেক্টরের পদে উন্নীত হন। এর ফলে তাঁর আর্থিক উন্নতি হয়েছিল অনেকটা। কিন্তু তিনি তাঁর সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা থেকে কখনো সরে আসেননি। ভগবানের প্রতি বিশ্বাসকে তিনি এমন এক জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন যে, যেদিন তিনি মাইনে পেতেন, সেদিন সন্ধ্যার প্রার্থনায় তিনি পুরো মাইনের টাকা ভগবানের নামে উৎসর্গ করতেন। প্রকাশচন্দ্র ও অঘোরকামিনী তাদের প্রাত্যহিক জীবনে কুসংস্কার এবং সংকীর্ণ আচার-বিচারের উর্ধ্বে থেকে সকল ধর্মের মানুষের সেবায় এগিয়ে আসতেন। যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে ১৮৮৫ থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে পূর্ববঙ্গের দক্ষিণাংশের কয়েকটি জেলায় এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে অসংখ্য লোকের প্রাণনাশ হয় এবং হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। ব্রহ্মাচার্য কেশবচন্দ্র সেন আর্তত্রাণে সাহায্য করার জন্য দেশের ব্রাহ্মদের কাছে আবেদন জানান। অঘোরকামিনী তৎক্ষণাৎ তার অলঙ্কারাদি বিক্রি করে সেই অর্থ কেশবচন্দ্রের হাতে তুলে দেন। প্রকাশচন্দ্রের সঙ্গে সেই সময়কার বহু নামকরা হিন্দু ও ব্রাহ্ম পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। এদের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র সেন এবং ময়ূরভঞ্জ ও কোচবিহারের রাজপরিবার উল্লেখযোগ্য। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র উভয়েই ভ্রমণপিপাসু ছিলেন। তারা দুজনেই হিমালয় ও অন্যান্য পাহাড়ি অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন আত্মার শান্তির জন্য। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেক সময় থাকতেন তাঁর পুত্র রবীন্দ্রনাথ। বিহারের পাহাড়ী অঞ্চলে এরা বেড়াতে গেলে অনিবার্যভাবেই প্রকাশচন্দ্র ও অঘোরকামিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। সংসারী জীবনের ব্যস্ততা, সেইসঙ্গে সমাজসেবা ও শিক্ষাবিস্তারে অক্লান্ত পরিশ্রমে অঘোরকামিনীর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ফলে ১৮৯৬ সালে তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে। জীবনসঙ্গিনী-স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্রকাশচন্দ্র ১৫ বছর বেঁচে ছিলেন। এই সময়ে সমাজ ও সংসারের কাজকর্ম এবং সন্তানদের দেখাশোনা খোঁজখবর নেওয়া এসবই তাকে একাই করতে হতো। মাঝে মাঝে তার অন্তরের ইচ্ছামতো উপাসনা করতে পারতেন না। এরকম সময় একদিন তিনি একটু বিপন্নভাবে বলে ফেলেছিলেন 'আজ আর সাধন ভজন ঠিক মতো হল না।' বিধানের কানে একথাটি যাওয়া মাত্র তিনি পিতাকে সহাস্যে বলেছিলেন, 'কেন? সাধন-ভজন তো সব সময়েই তোমার কাছে রয়েছে।' (প্রকাশচন্দ্রের মা তাঁর সবচেয়ে ছোট নাতি বিধানকে 'ভজন' বলে ডাকতেন। সেই থেকে 'ভজন' বিধানের ডাক নাম হয়ে গিয়েছিল। এদিকে আগের ভায়ের নাম সাধন তাই বিধান পিতাকে রসিকতা করে ওই কথা বলেছিলেন।)* প্রকাশচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৯১১ সালের ৭ ডিসেম্বর। ওই সময়ের মধ্যে তার সন্তানেরা সকলেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলেন। প্রথম পুত্র সুবোধ ব্যারিস্টার হয়ে এসেছেন। দ্বিতীয় পুত্র সাধন

কে পি টমাস ডাঃ বি সি রায়, (পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি)

বিলাতের ইঞ্জিনিয়ার এবং কনিষ্ঠ পুত্র বিধান চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর অসামান্য পারদর্শিতা দেখিয়ে নজিরবিহীনভাবে মেডিসিন ও সার্জারি উভয়ক্ষেত্রে ডিগ্রি নিয়ে ইংলন্ড থেকে ফিরে এসেছেন।

প্রকাশচন্দ্র যে সময় বি সি এস অফিসার হয়েছিলেন, তখন বিহার প্রশাসনিকভাবে 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির' (Bengal Presidency) অন্তর্গত ছিল। ফলে তাঁকে বিহারের বিভিন্ন জেলায় বদলি হতে হতো। বিধানও পিতার সঙ্গে সেসব জায়গায় যেমন মতিহারি ও মুঙ্গেরে গিয়ে থেকেছেন। বিধানের বিহার জীবনের সময় থেকে পরবর্তী অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে বিহারের যেসব ব্যক্তিত্ব স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনকে নেতৃত্ব দিয়েছেন যেমন রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, বিনোদানন্দন ঝা ও অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহকে বিধান তাঁর কৈশোর জীবন থেকে চিনতেন। এসবের জন্যই বিহারের সমাজজীবনের সঙ্গে তাঁর বন্ধন গড়ে উঠেছিল। যে বিধান ডাক্তারি পড়তে গিয়ে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন সেই বিধান কিন্তু স্কুলজীবনে মোটেই 'ভাল ছাত্র' হিসাবে চিহ্নিত ছিলেন না। পড়াশোনায় তিনি বেশ অমনোযোগীই ছিলেন। এন্ট্রান্স পরীক্ষার সময় তিনি তার বই খাতা খুলে রেখে ফুটবল খেলতে চলে গিয়েছিলেন। এ কাজটি তিনি করেছিলেন তাঁর ড্রয়িং পরীক্ষার আগের দিন। বিধানচন্দ্র তাঁর পরবর্তীকালের কর্মময় জীবনের ব্যস্ততার মধ্যে কখনই ভগবানের নাম করা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেননি। তিনি প্রতিদিন সকালে বাংলা 'গীতা'-র অংশবিশেষ পাঠ করতেন। উচ্চারণ করতেন 'ব্রহ্ম স্তোত্রম' ও উপনিষদের বাণী। তাঁর শিয়রে 'গীতা' ও 'ব্রহ্মস্তোত্রম' গ্রন্থ দুটি রক্ষিত থাকত এবং তিনি বাইরে গেলে ওই দুটি সঙ্গে নিয়ে যেতেন। বিধানের পাটনার স্কুল ও কলেজ জীবন বেশ সাদামাঠাই ছিল। প্রভাত সূর্য দেখে সারাদিনটা কেমন যাবে, বোঝা যায় এই প্রবাদ কিন্তু তাঁর জীবনের সঙ্গে একেবারেই মেলেনি। বিধান পাটনা কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করেন ১৮৯৭ সালে। ওই কলেজে ১৮৯৯ সালে কলেজ থেকে এফ এ (পরবর্তীকালে আই এ) এবং ১৯০১ সালে থেকেই অঙ্কশাস্ত্রে অনার্সসহ বি এ পাস করেন। বিধানের জীবনচর্চায় তাঁর বাবা-মা'র প্রভাব খুব বেশি ছিল। তাঁদের দুজনের সরল জীবনযাত্রা ও গভীর ভগবৎভক্তি বিধানকে সারাজীবন অনুপ্রাণিত করেছে। পিতা প্রকাশচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে থেকে শেষজীবনে 'এক্সসাইজ সুপারিন্টেন্ডেন্ট' হয়েছিলেন। কিন্তু ওই পদ কখনই বড় মাইনের পদ ছিল না। তাঁদের জীবন যে একটা কৃচ্ছ্রসাধনের ব্যাপার ছিল, এটা বিধান ছোটবেলায় বুঝতে পেরেছিলেন। ফলে তাঁর নিজের জীবনযাত্রাকে সেভাবেই তৈরি করে নিয়েছিলেন। মা অঘোরকামিনীর স্মৃতি তাঁর মনকে বিশেষ আচ্ছন্ন করে রাখত। মা'র মৃত্যুর (১৮৯৬) সময় বিধানের বয়স ছিল মাত্র চোদ্দ (১৪) বছর। সুতরাং মা'র স্নেহ মমতা ও শাসন তাঁর কাছে কৈশোরের স্মৃতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পঞ্চাশের যুগের মাঝামাঝি সময়ে তিনি একবার একদিনের জন্য এক

সরকারি কাজে পাটনা গিয়েছিলেন। সকালে গিয়ে যাতে সন্ধ্যায় কলকাতা ফিরতে পারেন সেজন্য তিনি রেলওয়ের সেলুন নিয়েছিলেন। পাটনায় সরকারি সম্মেলনের কাজ সেরে তিনি স্টেশনে রওনা হওয়ার আগে বাঁকিপুরে তাঁর বাবার পুরানো বাড়িও গেলেন। সেখান থেকে স্টেশনে এলেন খবরের কাগজে মোড়া একটি পুটলি নিয়ে। পাটনা স্টেশনে রেলের সেলুনে অফিসাররা অপেক্ষা করছেন। এ-সময় উৎফুল্লচিত্তে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সেলুনে এলেন। তিনি সেলুনে ঢুকতেই অফিসারেরা উঠে দাঁড়ালেন। তিনি সবাইকে বসতে বলে খবরের কাগজের মোড়ক থেকে পাট করা একখানা শাড়ি বের করলেন। বিধান শিশুর মতো হাসি ছড়িয়ে সবাইকে অবাক করে দিয়ে বললেন, 'তোমরা দ্যাখো, এ শাড়িটা আমার মা পরতেন। আমাদের সেই বাড়ির এখনকার মালিকেরা মা'র এই শাড়িখানাকে যত্ন করে আলমারিতে তুলে রেখেছিল আমাদের পরিবারের কারও হাতে তুলে দেবে বলে।' এই একটি ঘটনা প্রমাণ করে যে মা'কে বিধানচন্দ্রের কীভাবে মনে পড়ত।*

২

মেডিকেল শিক্ষার্থী বিধান

পাটনা কলেজ থেকে বি এ পাস করার পর তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিলেন। পিতা প্রকাশচন্দ্র তাঁর ছেলেদের কেবল একটা পরামর্শই দিয়েছেন সেটি হল, তাঁরা যেন কেউ সরকারি চাকুরিতে যোগ না দেন। স্বাধীন জীবিকার মধ্যে আইন একটা বিশেষ কলকাতা ক্ষেত্র। কিন্তু আইন পড়া সম্পর্কে বিধানের খুবই অনিচ্ছা ছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি শিবপুরে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এবং মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য দরখাস্ত দিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে তাঁর বেশ আগ্রহই ছিল। কিন্তু মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে ওই কলেজে ভর্তির জন্য প্রথম চিঠি পাঠালেন। ফলে বিধান মেডিকেল কলেজে ভর্তির তোড়জোড় আরম্ভ করলেন। এদিকে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকেও তাঁকে ভর্তি হতে চিঠি দেওয়া হল। কিন্তু ততক্ষণে বিধান মেডিকেল পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। একটা প্রবাদ আছে যে নিজের অনুভূতি থেকে সে সিদ্ধান্ত আসে সেটা হল ভগবানের, দ্বিতীয় অনুভূতির সিদ্ধান্ত হল সবুরের এবং তৃতীয় অনুভূতির সিদ্ধান্ত হল শয়তানের। বিধান সম্ভবত এই প্রবাদ বাক্যে বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি মেডিকেল ছেড়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গেলেন না। ১৯০১ সালের ১ জুন তিনি কলকাতায়

*মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের সেক্রেটাবি সুধীরমাধব বসুর সঙ্গে লেখকের কথোপকথন।

এলেন মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য। সেই আমলে কলকাতার মেডিকেল ছাত্রদের জন্য কোন আলাদা হস্টেল বা মেস ছিল না। ফলে তিনি কলকাতা পড়ার জীবনে থাকার জায়গা হিসাবে বেছে নিলেন কলেজ স্ট্রিটের ওয়াই এম সি এ (YMCA) হল। ওখানে তাঁর রুমমেট ছিলেন তাঁর চেয়ে সিনিয়র একজন ছাত্র। ঘরে বিধানের পিঠ ঘেঁষে একটি বড় জানলা ছিল। সেই সময় বিধান বেশ রুগ্ণ প্রকৃতির। তাঁর প্রায় সবসময় সর্দি-কাশি লেগে থাকত এবং মাঝে মাঝে জ্বরও হতো। ফলে বিধান চাইতেন জানালাটি বন্ধ রাখতে যাতে তাঁর হাওয়া বেশি না লাগে। কিন্তু তাঁর রুমমেট ছিলেন বেশ শক্তপোক্ত চেহারার লোক এবং তিনি চাইতেন জানালাটি সবসময় খুলে রাখতে। যেহেতু তিনি সিনিয়র ছিলেন, সেহেতু বিধানকে জানলা খুলেই রাখতে হতো। ফলে বিধানের অসুখ লেগেই থাকত।

বিধান যে সময়ে কলকাতায় পড়তে আসেন তখন বাংলা সবেমাত্র বিংশ শতাব্দীতে পা দিয়েছে। কলকাতা তখন সবদিক দিয়ে পূর্বভারতের প্রাণকেন্দ্র। বাঙালি জীবনের প্রভাব তখন বিহার ওড়িশার সীমানা পেরিয়ে একদিকে নাগপুর ও অন্যদিকে এলাহাবাদ-লখনউ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। কলকাতা তখন দেশের রাজা মহাবাজা ও ধনাঢ্য জমিদার সন্তানদের লেখাপড়া ও বিলাসিতাব জায়গা ছিল। এসব ছেলেরা কলকাতার জীবনকে চিনে নিজেদের চালাক, চতুর এবং কখনও কখনও চালিয়াত করে ফেলেছে। বিধান মফস্বল থেকে আসার ফলে ওইসব ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মিশতে পারতেন না। ফলে প্রথমদিকে তাঁর বেশ কিছুটা আড়ষ্ট ভাব ছিল। এর আর একটা কারণ ছিল বিধানের আর্থিক সীমাবদ্ধতা। প্রকাশচন্দ্র তাঁকে কলকাতার খরচ চালাতে প্রতিমাসে যে টাকা পাঠাতেন, তাতে বিধানের টাকা ওড়াবার কোন ব্যাপার ছিল না। কলেজের ফি ও হস্টেলের খরচ দিয়ে তাঁর হাতে এমন কিছু বাড়তি টাকা থাকত না যে বাজে খরচ করা যায়। এছাড়া পিতার কাছ থেকে পাওয়া সরল সাধারণ জীবন যাপনের অনুশাসনগুলি তিনি মেনে চলতেন। মেডিকেল কলেজে যেদিন প্রথম বিধান ডিসেকশন টেবিলে মড়াকাটায় হাত দিলেন সেদিন মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শিরা-উপশিরা স্নায়ু তাঁকে এক অন্য জগতে নিয়ে গেল। মানবদেহের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের দরজা তাঁর কাছে উন্মোচিত হল। সমগ্র দেহ ও মন দিয়ে, বলতে গেলে এবং গভীব অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি প্রতিনিয়ত মানুষের শরীরকে উপলব্ধি করেছেন। ফলে পরবর্তী জীবনে তিনি যেন অসুস্থ মানুষকে দেখেই বুঝতে পারতেন, শরীরের কোন জায়গায় ব্যাধি রয়েছে। তাই তিনি একসময় হয়েছিলেন ধন্বন্তরি চিকিৎসক। তাঁর ছিল একটা দিব্যদৃষ্টি।

মেডিকেল কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময় বিধানের কেবলই মনে হতো যে বাবা শিগগিরই অবসর নেবেন। তখন বাবা মাসে মাসে টাকা পাঠাতে পারবেন তো? যদি না পারেন, তাহলে? কিন্তু সেকেন্ড ইয়ারে তিনি যখন স্কলারশিপ পেলেন, তখন তাঁর এই ভাবনাটা অনেকটা কমল। সত্যিই ওই সময়ে পিতা প্রকাশচন্দ্র অবসর

নিলেন। সেই আমলেও মেডিকেল পড়ার খরচ অনেক ছিল। মেডিকেল ছাত্রদের অনেক বই, অনেক যন্ত্রপাতি কিনতে হয়। যে পাঁচ বছর বিধান মেডিকেল কলেজে পড়েছেন, তার মধ্যে তিনি মাত্র একটি বই কিনতে পেরেছিলেন পাঁচ টাকা দিয়ে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর সহপাঠীদের বই থেকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কপি করেছেন, কখনও বা কলেজ লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে ওই কাজ করেছেন। সে সময়েও মেডিকেল কলেজে অনেক পার্ট টাইম কাজের ব্যবস্থা ছিল। তিনি ছুটির দিনগুলোতে ক্লাস না থাকার সময় 'পুরুষ নার্স' হিসাবে কাজ করেছেন। কখনও বা তাঁর শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত প্রাইভেট নার্সিং হোমে ডিউটি দিয়েছেন। এভাবে তিনি দিনে আট টাকা পর্যন্ত রোজগার করেছেন। এসব কাজেব মধ্য দিয়ে বিধান ধীরে ধীরে নিজেকে সার্জারি ও মেডিসিন উভয়ক্ষেত্রে ভাল ছাত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেন। একদিন মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল জেনাবেল বমফোর্ট (Gen. Bomfort) ছাত্রদের 'ডিসেকসনের' কাজ দেখতে 'অ্যানাটমি' হলে এলেন। এ সময়ে স্বভাবতই ছাত্ররা প্রিন্সিপালের নজরে পড়ার চেষ্টা কবে থাকে। কিন্তু বিধান যথারীতি নিজের টেবিলে 'ডিসেকসন' নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। প্রিন্সিপাল অ্যানাটমির অধ্যাপককে সঙ্গে নিয়ে বিধানের টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি বিধানের দিকে তাকিয়ে সরাসরি প্রশ্নে করলেন 'ওহে তুমি কি খুব ভাল ছাত্র?' বিধান এই প্রশ্ন শুনে হতচকিত হলেন। কারণ, এ প্রশ্নের উত্তর তিনি কী দেবেন। কিন্তু উত্তর দিলেন অ্যানাটমির অধ্যাপক। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, 'হাঁ স্যার, বিধান খুবই ভাল ছাত্র।' অধ্যাপক বিধানের কাজ সম্বন্ধে আরও কিছু প্রিন্সিপালকে বললেন। তখন প্রিন্সিপাল জেনারেল বমফোর্ট সাহেব বিধানের দিকে চেয়ে বললেন, 'বিধান, তোমার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু আশা করবো।' বিধানের শিক্ষকদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি ছাপ বিধানের মনে ফেলতে পেরেছিলেন, তিনি হলেন কর্নেল লুকিস (Col. Lukis)। লুকিস সাহেব জেনারেল বমফোর্টের পর মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল হয়েছিলেন তাঁর এই প্রিয় শিক্ষক সম্পর্কে বিধান নিজেই বলেছেন, 'আমি রোগী দেখার ঘরে আমার টেবিলে তাঁর ছবি রেখেছি। তিনিই আমার গুরু আমার জীবনের অনুপ্রেরণা। তিনিই আমার মধ্যে পৌরুষ জন্মিয়েছেন, তিনি আমার মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগিয়েছেন। তিনি এক ধর্মীয় অনুশাসনের মতো আমাকে দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ করে গিয়েছেন।'*

কর্নেল লুকিস ভাইসরয় লর্ড কার্জনের ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতীয়দের জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় চেতনার প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধা ছিল। এই সময়ে অর্থাৎ ১৯০৫ সালে বিধানচন্দ্র যখন মেডিকেল কলেজের

টমাস-ডাঃ বি সি রায় পৃ ৪৯

ছাত্র, তখন দেশ বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে জাতীয় জোয়ারে ভাসছে। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের যে শিক্ষা প্রজ্বলিত হয়েছিল তা বিধানকে ছাত্রাবস্থায় উত্তপ্ত ও প্রভাবিত করেছিল পরবর্তী জীবন গড়ে তুলতে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ প্রতিবাদ আন্দোলন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কাছে এক নতুন পথ নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করেছে। ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল আবেদন নিবেদন ও অনুরোধের উপর। এই সাল থেকেই আন্দোলনকারীদের একাংশ পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ধাবিত হলেন। একদিকে কলকাতার পথে পথে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিক্ষোভের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন, অন্যদিকে সর্বভারতীয় স্তরে লালা লাজপত রায়, বালগঙ্গাধর তিলক ও বিপিনচন্দ্র পাল ওই বিপ্লববহ্নিকে সম্প্রসারিত করেছেন কংগ্রেসের মধ্যে এক বিক্ষুব্ধ দাপটের গোষ্ঠী গঠন করে। তাঁদের 'স্বরাজেব' আহ্বান সারা দেশে পরিব্যাপ্ত হল। কলকাতার ওই অগ্নিগর্ভ পরিমণ্ডল বিধানকে স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবিত ও উদ্বুদ্ধ করল এবং পোশাক পবিচ্ছদে ও মননে বিধান হয়ে উঠলেন একজন জাতীয়তাবাদী স্বরাজপন্থী। ওই সময় তিনি ও তাঁব মেডিকেল কলেজের এক বন্ধু বর্ধমান গিয়েছিলেন। বর্ধমান থেকে কলকাতা ফেরবার পথে তাঁরা দুজনে উচ্চশ্রেণীতে রেলের কামরায় উঠলেন। কিন্তু কামবায় এক অ্যাংলো ইন্ডিযান দম্পতি দুটি বার্থ জুড়ে শুয়ে আছেন। তাঁরা কিছুতেই বিধানদের বসতে জাযগা দেবেন না। প্রথম বিধান অনেক অনুনয় বিনয় করলেন। কিন্তু ওবা অনড়। ফলে বিধান ও তাঁর বন্ধু অ্যাংলো সাহেবকে জাপটে ধবে বার্থ থেকে নামিয়ে দিলেন। বহুবছর পরে এই ঘটনাটি বিধান গল্পচ্ছলে বলতে গিযে বলেছিলেন, 'ওই সাহেবটাকে জোর করে বার্থ থেকে নামিয়ে দিয়ে আমার মনে হয়েছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিতে গিয়েছি।' কিন্তু ইংরেজ জাতির প্রতি তাঁর কোন বিদ্বেষ ছিল না ইংরেজদের সংস্কৃতি, দেশ-প্রেম, ধৈর্য এবং সর্বোপরি মেয়েদের প্রতি সম্ভ্রমবোধকে বিধান উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করতেন। খুব অল্পবয়সে বিধানেব একসময় ইংরেজদের অনুকরণ করার প্রবল আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। তখন তিনি পরিহাস কবে নিজেকে বন্ধুদের কাছে পরিচয় দিতেন 'বেঞ্জামিন চার্লস রয়' (Benjamin Charles Roy) বলে। কিন্তু এসবগুলি কখনই তার জাতীয়তাবোধ ও তীব্র ভারতীয়ত্বকে ম্লান করতে পারেনি। ইংরেজদের বিকৃত বর্ণ-বৈষম্য, প্রভুত্ব ও আধিপত্যকে কখনই বরদাস্ত করতেন না। মেডিকেল কলেজে তাঁর প্রিয় অধ্যাপক কর্নেল লুকিসকে তিনি যেমন গুরুর আসনে বসিয়েছেন তেমন আর একজন ইংরেজ অধ্যাপককে তিনি চরম অশ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। ধাত্রী বিদ্যার এই অধ্যাপক কর্নেল পেক (Col. Peck) তাঁর শিক্ষাজীবনের সাংঘাতিক ক্ষতি করেছেন। যে ঘটনার জন্য বিধানের এই ক্ষতি হয়েছিল সেই ঘটনাটি ছিল এরকম। বিধান একদিন মেডিকেল কলেজে ঢোকার মুখে গেটে দাঁড়িয়েছিলেন। এই

সময় কর্নেল পেকের ঘোড়ার গাড়ি কলেজের গেটের দিকে আসছে। ঘোড়ার গাড়ির পিছনে একটি ট্রাম আসছিল। কর্নেল পেকের গাড়ির কোচোয়ান 'সাহেবের গাড়ি' বলে কোনরূপ নিশানা না দেখিয়ে কলেজ গেটের দিকে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিল। ট্রাম চালকের সেটার আন্দাজ করা সম্ভব ছিল না। ফলে ট্রামের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ির ধাক্কা লাগল। কর্নেল পেক ট্রাম কোম্পানির বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা করলেন এবং বিধানকে মামলায় তাঁর পক্ষে সাক্ষী দিতে বললেন। বিধান সাক্ষী দিতে রাজি হলেন না এবং পেক সাহেবকে বললেন যে, তাঁর কোচোয়ানের দোষেই ধাক্কা লেগেছে। কর্নেল পেক তাতে বিধানের উপর ক্রুদ্ধ হলেন। এর কিছুদিন পর ফাইনাল এম বি পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষা (Viva Voce) আরম্ভ হল। কর্নেল পেক বিধানকে মৌখিক পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দিলেন। বিধান খুবই ভেঙে পড়লেন। জীবনে এই প্রথম তাঁর পরীক্ষায় ফেল। কর্নেল লুকিস এই দুঃসময়ে আবার তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। কর্নেল লুকিস বিধানকে বললেন, "যা হয়েছে তা খুবই দুঃখজনক ও লজ্জার ব্যাপার। কিন্তু এখন তো আর কিছু করার নেই একপক্ষকালের মধ্যেই এল এম এস (LMS) পরীক্ষায় তাকে বসতে হবে। এর দু'বছর পরে এম ডি পরীক্ষাও দিতে হবে তাকে। তাহলে এম বি'র মৌখিক পরীক্ষায় অসমর্থ হওয়ায় তার যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ কবা যাবে।" কিন্তু মর্মাহত বিধান লুকিস সাহেবকে বললেন যে, সেক্ষেত্রেও তো কর্নেল পেক সাহেবই মৌখিক পরীক্ষার দায়িত্বে থাকবেন! এবার প্রিন্সিপাল লুকিস কর্নেল পেক সাহেবকে বললেন যে তিনি তাঁর নিজের ছাত্রের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করেছেন এ কথায় পেক সাহেবের একটু অনুশোচনা হল। তিনি বিধানকে ডেকে বললেন যে, বিধান কেন তাঁর কাছে গিয়ে আবার পরীক্ষা নেওয়ার দরখাস্ত জমা দিলেন না। কলকাতা মেডিকেল কলেজে যে বিধানের প্রতিভা ছিল এক কিংবদন্তি, সেই বিধান কিন্তু এম বি পাস করে মেডিকেল গ্রাজুয়েট হননি তাঁকে এল এম এস (LMS) পাস করে মেডিকেল গ্রাজুয়েট হতে হয়েছিল, যা কোন ভালো ছাত্রের পক্ষে অগৌরবের। এটা ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ছাড়া আর কিছু নয়।

ভাগ্যের এই বিড়ম্বনার মধ্য দিয়ে বিধান বেঙ্গল মেডিকেল সার্ভিসে যোগ দিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেনের পদ পান এবং প্রাদেশিক সরকার তাঁকে কলকাতা মেডিকেল কলেজে কর্নেল লুকিসের অধীনে হাউস ফিজিসিয়ানের পদে নিয়োগ করেন। বলতে গেলে এই পদে থেকেই তিনি তাঁর চিকিৎসক জীবনের গৌরব উজ্জ্বল দিনগুলি আরম্ভ করেন। তিনি নিজেকে কেবল রোগীদের ওষুধ দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি নিজের হাতে তাঁদের খাবার তৈরি করে দিয়েছেন। এখানে তিনি ছাত্রদের 'ক্লিনিক্যাল' ক্লাস নিতেন। একজন রোগীকে কেবল চোখে দেখে তাঁর রোগ ধরে নেওয়ার যে দৈববিদ্যা তিনি অর্জন করেছিলেন, তার সূচনা এখান থেকেই। প্রাইভেট প্র্যাকটিসে তাঁর 'ফি' ছিল মাত্র দু'টাকা (Rs. 2/-)। এই দু'টাকা 'ফি'র বিধান

ডাক্তারই খাইবার গিরিবর্ত্ম থেকে বার্মা মুলুকের সমতলভূমি পর্যন্ত তৎকালীন ভারতবর্ষের সর্বজনবিদিত ডাক্তার হয়েছিলেন। এই অসম্ভব ব্যাপারের সূতিকাগার ছিল এই মেডিকেল কলেজ। এ কাজের মধ্য দিয়েই তিনি এম ডি পরীক্ষার জন্যও প্রস্তুত হচ্ছিলেন। বিধানের তখন মাসিক বেতন ছিল ৭০ টাকা ; এই বেতনের টাকা থেকে তিনি বাড়িভাড়া দিয়েও কিছু অর্থ সঞ্চয় করতেন ইংলন্ডে যাবার জন্য। চিকিৎসা বিদ্যায় বিলাতে উচ্চতর শিক্ষালাভের স্বপ্ন তিনি অনেক আগে থেকেই দেখছিলেন। মেডিকেল কলেজে বিধানের সঙ্গে মাঝে মাঝে এক শ্রেণীর সাহেব ডাক্তারদের সংঘর্ষ হতো। ওই দাম্ভিক আই এম এস (IMS) ডাক্তাররা বর্ণ-বৈষম্যের পীড়ায় ভুগতো এবং ভারতীযদের হীন দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত ছিল। একবার বিধান তাঁর মাসিক 'ডিসেকসন' ফি দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট অধ্যাপক তাঁকে একটাকা জরিমানা করে নোটিস দিলেন। বিধান তখন প্রিন্সিপালকে লিখিতভাবে জানালেন যে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁর মাসিক স্কলারশিপ কযেকমাস ধরে দিচ্ছেন না, অথচ তিনি একমাস 'ডিসেকসন' ফি দেননি বলে তাঁকে জরিমানা দিতে বলা হল! প্রিন্সিপাল তখন তাঁব জরিমানা মকুব করলেন। আর একবার এক ইহুদি মহিলাকে নিয়ে এক ঘটনা ঘটল। সেই আমলে ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডে ইহুদি সম্প্রদায়ের রোগীদের ভর্তি করা হতো না। তাদের জন্য পৃথক 'এজরা' হাসপাতাল (Ezra Hospital) ছিল। একদিন ভুলক্রমে এক ইহুদি মহিলাকে ইউরোপিয়ান মহিলা ওয়ার্ডে ভর্তি করা হল একটি নতুন বেড সংযোজন কবে। বিধান ওয়ার্ড রাউন্ডে এসে এটা দেখতে পেলেন এবং তিনি ওই মহিলাকে 'এজরা' ওযার্ডে সরিয়ে দিতে লিখিত নির্দেশ দিলেন। আগেব নির্দেশটি এসেছিল একজন সাহেব আই এম এস ডাক্তারের কাছ থেকে। তিনি যা লিখিত নির্দেশ দিয়েছিলেন তা হল 'extra bed'। বিধান রায় ঠিকই ধরলেন যে ওটা ছিল 'Ezra bed'। দুর্বোধ্য হাতের লেখার জন্য 'extra bed' পডা হয়েছিল। একজন ভারতীয় তাঁর ভুল নির্দেশ সংশোধন করবে এটা সেই সাহেব ডাক্তার কিছুতেই মানতে পারছিলেন না। তিনি তাঁর আগের নির্দেশই বহাল রাখলেন। বিযয়টি প্রিন্সিপাল অবধি গডাল এবং তিনি বিধানের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করলেন। বিধানচন্দ্রের চিকিৎসক জীবনের মহাগুরু কর্নেল লুকিস তাঁর এই ছাত্রটির দৃঢ় ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ ছিলেন। তিনি একদা বিধানকে বলেছিলেন, "ডাঃ রায় আমি চাইব, তুমি কখনই কোন ইংরেজের কাছে নিজেকে এক ইঞ্চিও নোয়াবে না। কারণ তুমি যদি এক ইঞ্চিও নোয়াও, তাহলে সে চাইবে তোমার মেরুদণ্ড একেবারে নুইয়ে দিতে।" বিধান তাঁর সমগ্র জীবনে এই মন্ত্র থেকে সরে আসেননি। এজন্যই মেডিকেল কলেজের দাম্ভিক আই-এম-এস সাহেব ডাঃ কর্নেল পেকের সঙ্গে বিধানের বারংবার সংঘর্ষ হয়েছে। কিন্তু বিধান কখনই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেননি।

বিলাত যাত্রা

বিধানের সব সময়ই আকাঙক্ষা ছিল ইংলন্ড থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর বিদ্যা অর্জন করা। তাঁর এই স্বপ্ন ১৯০৯ সালে বাস্তবরূপ ধরে কাছে এসে গেল। তিনি ইংলন্ডে উচ্চতর শিক্ষার জন্য দু বছর তিন মাসের ছুটি চেয়ে বাংলা সরকারের কাছে আবেদন করলেন। আবেদনে তিনি সরকারকে জানালেন যে তিনি বিনা বেতনেই ছুটি চাইছেন। কিন্তু বাংলা সরকারের মেডিকেল বিভাগ বিধানের দরখাস্ত নামঞ্জুর করে দিলেন এই যুক্তিতে যে তাঁর সরকারি চাকুরির মেয়াদ মাত্র দু'বছর হয়েছে। আবার তিনি তাঁর গুরু কর্নেল লুকিসের শরণাপন্ন হলেন। কর্নেল লুকিস তাঁকে বাংলার লেফটান্যান্ট গভর্নরের কাছে আবেদন করতে বললেন এবং আবেদনের মুসাবিদাও ঠিক করে দিলেন। বিধান লেঃ গভর্নরের কাছে লেখা আবেদনে বললেন যে, ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের (আই এম এস) ডাক্তাররা তাঁদের চাকুরির মেয়াদ দু'বছর পূর্ণ করলেই ইংলন্ডে উচ্চতর শিক্ষার জন্য সবেতন ছুটি পেয়ে থাকেন। কিন্তু তিনি বিনা বেতনে ছুটি চাওয়া সত্ত্বেও তাঁর আবেদন কেন নামঞ্জুর হল? (সে সময়ে দেশে সব আই এম এস ডাক্তাররা ছিলেন ইংরেজ)। বিধানের আবেদন জমা পড়ার পর কর্নেল লুকিস বাংলার লেঃ গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। কর্নেল লুকিস গভর্নরকে একথা বললেন যে, বিধানের দরখাস্ত নামঞ্জুর হয়েছে বিধান ভারতীয় বলেই। এটাকে বর্ণ-বৈষম্যমূলক আচরণ বলেই মনে করা হতে পারে। তিনি এই যুক্তিতেই গভর্নরকে বাংলা সরকারের সিদ্ধান্ত নাকচ করতে অনুরোধ করলেন। লেঃ গভর্নর বিধানের আবেদন মঞ্জুর ও বাংলা সরকাবের সিদ্ধান্ত নাকচ করে দিলেন। কিন্তু বিঘ্নের শেষ নেই। সরকারের কাছ থেকে তিনি যেদিন ছুটির লিখিত অনুমতি পেলেন, ঠিক তার পরের দিনই কলকাতা থেকে ইংলন্ড যাওয়ার জাহাজ ছাড়ার কথা। বিধান ছুটলেন জাহাজ কোম্পানির অফিসে। কিন্তু কেবিন বার্থ মিলছে না। তখন রেওয়াজ ছিল একই কেবিনে ইউরোপিয়ান যাত্রীদের সঙ্গে ভারতীয়দের এক কেবিনে টিকিট দিতে চাইত না জাহাজ কোম্পানিগুলি। বিধানকে কোম্পানি বলল তাঁকে কেবিনের দুটি বার্থ নিতে হবে অথবা অন্য একজন ভারতীয় যাত্রী তাঁকেই খুঁজে নিতে হবে কেবিনের দ্বিতীয় বার্থের জন্য। মহাফ্যাসাদে পড়লেন বিধান। এদিকে জাহাজ ছাড়তে মাত্র একদিন বাকি। আবার তিনি গেলেন তাঁর ত্রাতা সেই কর্নেল লুকিসের কাছে। কর্নেল লুকিস জাহাজ কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজারকে এই চিঠি লিখলেন, 'বিধানের দেহের রঙ কালো হলেও বিধান যে কোন ইংরেজের চেয়ে বেশি পরিচ্ছন্ন।' ('Cleaner than the

Englishman though his skin may be darker') কর্নেল লুকিসের এই শ্লেষাত্মক চিঠি পেয়ে জেনারেল ম্যানেজার বিধানকে কেবিনের একটি বার্থের টিকিট দিলেন। এবার কর্নেল লুকিস বিধানকে শেষবারের মতো এই পরামর্শ দিলেন "বিধান, তুমি দুটি পরীক্ষায় বসবে। একটি হল এম আর সি পি (লন্ডন) ও আর একটি হল এফ আর সি এস (ইংলন্ড)। (MRCP, London ; FRCS, England) কিন্তু তুমি কখনই Indian Medical Service (IMS)-এর পরীক্ষায় বসবে না। কারণ কলকাতা চিকিৎসা ব্যবস্থায় আগামী দশ বৎসরের মধ্যে ভারতীয়দের কর্তৃত্ব আসবে। আমি চাই, তুমি কলকাতায় থাকবে এবং শহরে মেডিকেল প্র্যাকটিসে অংশ নেবে।" বিধান তাঁর এই মহান শিক্ষাগুরুর উপদেশ শিরোধার্য করে ১৯০৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বন্দর থেকে জাহাজ উঠলেন। বিধান তাঁর শিক্ষাজীবনের বছরগুলিতে স্কলারশিপের যে টাকা পেয়েছিলেন, সেটা তিনি জমিয়ে রেখেছিলেন বিলাত যাওয়ার জন্য এবং ওই সঞ্চয়ই ছিল তাঁর বিলাত যাত্রার সম্বল। বিধান লন্ডন পৌঁছুলেন। কিন্তু একদিকে অর্থের টানাটানি অন্যদিকে পছন্দমতো কলেজে ভর্তি হতে বাধা তাঁকে কিছুটা বিপন্ন করে তুলল। কর্নেল লুকিস সহ কলকাতা মেডিকেল কলেজের তাঁর অনেক অধ্যাপক লন্ডনের সেন্ট বার্থালোমিউজ (St. Barthalomews) কলেজের ছাত্র। তাঁরা তাঁদের কলেজে কর্তৃপক্ষের কাছে বিধানের যে পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন, সেগুলিকে এই কলেজের ডিন ডাঃ শোর (Dr. Shore) একেবারেই পাত্তা দিলেন না। তিনি বিধানকে সাফ মুখের উপর জানিয়ে দিলেন যে, সেন্ট বার্থালোমিউজে তাঁর জায়গা হবে না। তিনি বিধানকে অন্য হাসপাতাল খুঁজে নিতে বললেন। বিধান খুবই বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। কিন্তু হাল ছাড়েন নি। কারণ, তখনকার দিনে এটাই একমাত্র শিক্ষায়তন সেখান থেকে একই সঙ্গে এম আর সি পি ও এফ আর সি এস ডিগ্রি লাভ করা যায়। বিধান দেড় মাসে অন্তত ত্রিশবার ডাঃ শোরের সঙ্গে দেখা করেছেন। যুক্তি দিয়েছেন, অনুনয় বিনয় করলেন। কিন্তু ডাঃ শোরের পাথরের মতো কঠিন ও নিষ্প্রাণ। কিন্তু কখনও কখনও পাষাণের হৃদয় গলে এবং একদিন সম্ভবত ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে ডাঃ শোর বিধানকে বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি এক্ষুনি ভর্তির ফর্ম ও ফিজ নিয়ে এসো।' ওখানে ভর্তি হতে লাগে ৪০ গিনি। ওই পরিমাণ অর্থ তখন বিধানের কাছে নেই। অবশেষে বিধান তিনমাসের অগ্রিম দিয়ে ভর্তি হলেন। বাকি দেয় অর্থ তাঁকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা দেওয়ার অঙ্গীকারে ডাঃ শোর বিধানের ভর্তির আবেদন মঞ্জুর করলেন। এবার আরম্ভ হল বিধানের দু'বছরের নিরলস সংগ্রাম। কারণ ওই সময়ের মধ্যেই তাঁকে এম আর সি পি এবং এফ আর সি এস পরীক্ষায় পাস করতেই হবে। মানবদেহের গঠন প্রকৃতি ঐ শারীরতত্ত্ব নিখুঁত অনুধাবনের জন্য হাসপাতালে চলল তাঁর অহর্নিশি পরিশ্রম। তাঁর এই কাজে 'ডিসেকসন' টেবিলে ভেনেজুয়েলার একজন ছাত্রের সঙ্গে তিনি মানবদেহকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করতেন। তাঁর এই কাজে 'অ্যানাটমির'

অধ্যাপক ডাঃ এডিসনের দৃষ্টি বিধানের প্রতি আকৃষ্ট হল। বিধানের ভর্তির ব্যাপারে অধ্যাপক ডাঃ এডিসন কলেজের ডিন ডাঃ শোরের উপর সচেষ্ট প্রভাব খাটিয়েছিলেন। তখনকার দিনে ভারতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সে সব বিষয়ে পড়ানো সম্ভব ছিল না, বিধান যে সব বিষয়ে পড়াশুনো করতে লাগলেন। এই বিষয়গুলির মধ্যে একটি হল চর্মরোগ। তিনি চর্মরোগের অধ্যাপকের অবৈতনিক সহকারীর কাজে যোগ দিয়ে সপ্তাহে তিনদিন তাঁর ক্লিনিকে হাজিরা দিতেন। তিনি শারীরবিদ্যা বিষয়ে অতিরিক্ত ক্লাসগুলিতে যোগ দিতেন। এছাড়া 'অ্যানাটমি' বিষয়ে তিনি প্রাইভেট কোচিং নিতেন। এই সময়টাতে তাঁর কখনও কখনও অর্থ সংকট দেখা দিত। ওই সংকট মোচনের জন্য তিনি তাঁর কলেজের অধ্যাপকদের চেম্বারে পার্ট টাইম কাজ করতেন। তাঁরা যখনই ছুটি কাটাতে লন্ডনের বাইরে যেতেন বিধান তাঁদের চেম্বারে রোগী দেখতেন। তার এই সকল প্রয়াস, তাঁর সব কৃচ্ছ্রসাধন সফল হল যখন ১৯১১ সালের মে মাসে বিধানচন্দ্র রায় সেন্ট বার্থালোমিউজ কলেজ থেকে একই সঙ্গে গৌরবময় এম-আর-সি-পি ও এফ-আর-সি-এস ডিগ্রি পেলেন। এ যেন সেই 'মরু তীর হ'তে সুধা শ্যামলিমা পারে...।' বিধানের এই সাফল্যে মুগ্ধ হয়ে কলেজের ডিন ডাঃ শোর তাঁকে লিখিতভাবে জানালেন : 'ডাঃ রায়, আমি আমার ব্যবহারের জন্য সত্যিই লজ্জিত। তুমি যখন ভর্তি হতে আমার কাছে এলে, তখন প্রথমদিকে আমি তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছি। তোমার দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেছি। আমি ওই কাজ করেছিলাম কারণ তুমি বাংলা থেকে এসেছো এবং বিশেষ করে বাংলা থেকে আসা ছেলেদের সম্পর্কে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা ভাল ছিল না। আমার মনে হয়েছিল যে তোমাকে আমাদের কলেজে ভর্তি করলে কলেজের ঐতিহ্য নীচে নেমে যাবে। সেজন্যই আমি এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তোমার ভর্তিতে বাধা দিয়েছিলাম। কিন্তু আজ আমি আনন্দের সঙ্গে তোমাকে এ কথা বলছি যে, তুমি এই বিদ্যায়তনের মুষ্টিমেয় ছাত্রদের একজন যে অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে একই সঙ্গে দুটি কৃতিত্বপূর্ণ ডিগ্রি লাভ করেছো। এখন আমি তোমার প্রতি আমার অতীত আচরণ সংশোধন করছি। ভবিষ্যতে তোমার কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে কোন ছাত্র আমাদের এই শিক্ষায়তনে ভর্তির জন্য এলে তাঁর ভর্তি অবধারিত, একথা আজ তোমাকে বলছি।' (Dr. Roy, I am really ashamed of my earlier conduct in not admitting you into this Institution when you come to me first. I had rejected your application because I felt, as you came from Bengal and our experience with other Bengali students had not been very happy, that you might if admitted lower the tradition of this college. Therefore I was refusing you entry into this Institution. But I am glad to tell you that you are perhaps one of the very few students who have obtained both the degrees within short possible time. I will therefore make amend for my past conduct. I would in future, admit

student who obtains a letter of introduction from you without any question') ডাঃ শোর ওই চিঠিতে বিধানকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা অনেক অনেক বছর তিনি পালন করেছেন। ডাঃ বি সি রায়ের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে সে সব ছাত্র ডাঃ শোরের কাছে গিয়েছিল, তাঁদের সেন্ট বার্থালোমিউজ কলেজে ভর্তি অনিবার্যভাবেই হয়েছে।

৩

দেশে প্রত্যাবর্তন : প্র্যাকটিসের সূচনা

১৯১১ সালেব জুলাই মাসে বিধান ফিবে এলেন কলম্বো ও মাদ্রাজ হয়ে। বঙ্গ প্রদেশ তথা সারা ভাবতবর্ষ তখন উত্তাল। ১৯০৫ সালের লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গেব সিদ্ধান্ত রদ হয়ে গিয়েছে এবং ১৯১১ সালের ডিসেম্বরে আবার যুক্ত বাংলা ফিবে এল এবং লুপ্ত হল কার্জন সাহেবের গড়া 'গভর্নমেন্ট অব ইস্টার্ন বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম' (Government of Eastern Bengal and Assam) প্রজেক্টটি। কিন্তু এব জন্য বাংলাকে অনেক মূল্য দিতে হল। সারা ভারতবর্ষের বাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হল এবং অন্যদিকে উড়িষ্যা ও বিহাবকে ছেড়ে দিতে হল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে। বিহার ও উড়িষ্যা পেল আলাদা প্রদেশেব মর্যাদা। সেখানে বিধানের শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের অনেকগুলো বছর কেটেছে। বিধান কলকাতা মেডিকেল কলেজে তাঁর কাজের জায়গায় ফিরে এলেন। কিন্তু এমনই এক বিকৃত বর্ণ-বৈষম্যবাদ তখন মেডিকেল কলেজে চলছিল যে, তাঁর মতো একজন একইসঙ্গে এম-আর-সি-পি ও এফ-আর-সি-এস হওয়া ডাক্তাবেব জন্য উপযুক্ত মর্যাদার পদ পাওয়া গেল না! কারণ, সব ভালো পদগুলিতে ইংবেজ ডাক্তাররা বসে আছেন। তাঁরা সকলেই ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের, কিন্তু অনেকেই এম-আর-সি-পি বা এফ-আর-সি-এস নয়। বিধান তখন একদিন বাংলা সরকারের সার্জেন জেনারেলের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। ইনি আসলে প্রাদেশিক সরকাবের মেডিকেল বিভাগেব ভাগ্যবিধাতা। তিনি বিধানকে তাঁর পরীক্ষার কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দন জানালেন। কিন্তু বললেন বিধান মেডিকেল কলেজে যে ধরনের অধ্যাপক পদের জন্য আকাঙিক্ষত, সেই পদ তাঁকে এখন দেওয়া যাবে না। অথচ বিধান যে যোগ্যতার অধিকারী সেই সমান অথবা কম যোগ্যতাসম্পন্ন ইংরেজ ডাক্তাররা ওই সকল অধ্যাপনার পদে রয়েছেন। সার্জেন জেনারেল এই সাফ কথা বললেন যে, তিনি বিধানকে ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে শিক্ষকের পদ দিতে পারেন। অন্যথায় বিধান চাইলে তাঁকে জেলায সিভিল সার্জেনের পদ দেওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি বিধান সরাসরি প্রত্যাখ্যান

করলেন। কারণ তাঁর বহুদিনের ইচ্ছা যে কলকাতা শহরে থেকে প্র্যাকটিস করা। ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের শিক্ষকের পদটি পেতে বিধানকে ন'মাস অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এ শিক্ষকতার পদটি ছিল কলকাতা পুলিশের কনেস্টেবলদের প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতি (First Aid training) শেখানো। এম আর সি পি ও এফ আর সি এস বিধান এই কাজটি নিয়ে নিলেন এবং সেই সঙ্গে সার্জারিতে টিউটোরিয়াল ক্লাস নিতে লাগলেন। এখান থেকেই তাঁর কিছু নামডাক ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর ফিজ দু'টাকা থেকে আট টাকায় বেড়ে গেল রোগীদের প্রকৃত রোগ নিরূপণ এবং তার প্রতিকারের সম্পর্কে ওষুধ স্থির করে দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি একজন ধন্বন্তরি হয়ে উঠলেন। কোন গরিব তাঁকে দেখাতে এসে যদি ফিজ্ দিতে না পারতেন, তাহলে বিধান সেই রোগীর কাছ থেকে টাকা নিতেন না। একবার একজন বড়লোক রোগী তাঁকে দেখাতে এলেন। তিনি বিধানের চিকিৎসায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে তাঁর পারিবারিক চিকিৎসক নিযুক্ত করতে চাইলেন বছরে ১৫০ টাকা পারিশ্রমিকে। বিধান ডাক্তার তাঁকে হেসে হেসে বলেছিলেন, ১৫০ টাকা তো তিনি তাঁর মতো রোগীর কাছ থেকে একবারেই চার্জ করতে পারেন। ঘটনাচক্রে বেশ কিছুদিন পরে ডাঃ রায় এক বাড়ি থেকে ‘কল’ পেলেন। বাড়ির একটি যুবতী মেয়ে আফিং খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। বিধান রোগী দেখেতে গিয়ে দেখলেন, আফিং খাওয়া যুবতী সেই ভদ্রলোকেরই মেয়ে, যিনি তাঁকে বছরে ১৫০ টাকা দিতে চেয়েছিলেন। মেয়েটিকে সুস্থ করার পর মেয়ের বাবার কাছে ডাঃ রায় ১৫০ টাকা ফি চাইলেন এবং ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে তাই দিলেন। বিধানচন্দ্র রায় তাঁর অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময়ের ডাক্তারি জীবনে বোধহয় ওই একবারই নিজের মুখে ফিজ চেয়ে নিয়েছিলেন। পরে বিধান বলেছিলেন যে ওটা তিনি ইচ্ছে করেই করেছেন। কারণ. তিনি ওই ভদ্রলোককে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে চিকিৎসকের একটা মর্যাদা আছে। বিধান ডাক্তার তাঁর ডাক্তারি জীবনে কখনই কোন রোগীকে ‘ফিজ’ বাবদ বিল পাঠাননি এবং কোন রোগী তাঁর আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী তাঁকে যা ‘ফিজ’ দিয়েছেন, তাই নিয়েছেন। রোগীর দেহে কঠিন ও দুরারোগ্য ব্যাধির অস্তিত্ব খুঁজে বের করায় তাঁর সমকক্ষ কোন ডাক্তার তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্তও এই উপমহাদেশে ছিল না। সম্ভবত এই কারণে মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন—Bidhan the safety hand of India...। ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর ‘দেশবন্ধু স্মৃতি’ গ্রন্থে লিখেছেন, দার্জিলিং থেকে দেশবন্ধুর মৃত্যুর সেই ভয়ংকর সংবাদ নিয়ে টেলিগ্রাম কলকাতায় পৌঁছনোর পর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁর রাজনৈতিক দীক্ষাগুরুর জীবনসঙ্গিনী বাসন্তীদেবীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তখন বাসন্তী দেবী ডুকরে কেঁদে বলেছিলেন, “বিধান তুমি থাকতে উনি বিনা চিকিৎসায় এভাবে চলে গেলেন!” ১৯৪১-৪২ সালে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যখন ফজলুল হক সাহেবের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রী তখন শ্যামাপ্রসাদ এক ভয়ংকর হৃদরোগে

আক্রান্ত হন। কলকাতার খবরের কাগজগুলো শ্যামাপ্রসাদের 'মৃত্যু আসন্ন' ধরে নিয়ে তাঁর কর্মময় জীবনী 'কম্পোজ' করে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু বিধান তিনদিন অহর্নিশি শ্যামাপ্রসাদের রোগশয্যার পাশে থেকে তাঁকে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলেছিলেন। ১৯৫৩ সালের ২৩ জুন শ্রীনগরে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু হল। পরদিন রাত্রি প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ওই বাড়িতে গিয়ে শ্যামাপ্রসাদের মায়ের সামনে দাঁড়ালেন। শ্যামাপ্রসাদের মা অশ্রুজলে ভেসে বলেছিলেন, 'বিধান, তুমি থাকতে আমার শ্যামা ভুল চিকিৎসায় মারা গেল!' নুরুল হক (Nurul Huq) নামে একজন বাঙ্গালি মুসলমান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারে ১৯৫৫-৫৬ সাসে বাণিজ্যমন্ত্রী ছিলেন। শাহিদ সুরাবর্দি তখন পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রী। বিধান ডাক্তারকে লেখা সুরাবর্দির একটি ব্যক্তিগত চিঠি নিয়ে নুরুল হক সাহেব স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ডাঃ রায়ের কাছে এলেন। নুরুল হকের রোগ ঢাকা করাচি ও লাহোরের কোন ডাক্তার ধরতে পারছিলেন না। মুখ্যমন্ত্রী বিধান অনেকক্ষণ ধরে নুরুলকে পরীক্ষা করলেন। তারপর স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই তাঁর দোতলার ঘরে নিয়ে গেলেন। ডাঃ রায় ওঁদের কয়েকটি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রশ্ন করার পর ওঁদের জানালেন, এই রোগের চিকিৎসা এই উপমহাদেশে তো দূরের কথা, ইউরোপ ও আমেরিকায় পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। তবে লন্ডনের একজন ডাক্তার এ ব্যাপারে কিছু গবেষণা করেছেন। ওই ইংরেজ ডাক্তারকে ডাঃ রায় চেনেন। রোগী ও তাঁর পরিবার চাইলে ডাঃ রায় তাঁকে চিঠি দিতে রাজি আছেন। নুরুল হক সাহেব ডাঃ রায়ের প্রস্তাবে রাজি হলে ডাঃ রায় ওই ইংরেজ ডাক্তারের নামে চিঠি লিখে নুরুল হকের হাতে দিলেন। ওঁরা চলে যাওয়ার আগে ডাঃ রায়ের মিসেস হককে একটু আলাদা করে ডেকে বলেছিলেন তাঁর স্বামী আর কতদিন বাঁচতে পারেন। নুরুল হক সাহেব লন্ডনে ডাক্তার দেখাতে গিয়ে মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুর খবরের সঙ্গে ডাঃ রায়কে দেখানোর অজানা তথ্যটি ঢাকার খবরের কাগজগুলিতে বেরিয়েছিল। ১৯৬১ সালে বাংলার কিংবদন্তি জনপ্রিয় নেতা ফজলুল হক গুরুতর ইউরোমিয়াতে আক্রান্ত হন। ঢাকার ডাক্তাররা হিমসিম খাচ্ছেন। বৃদ্ধ হক সাহেব বারবার ঢাকার ডাক্তারদের বলছেন, 'তোমরা কলকাতায় বিধানকে জানাও আমার কথা।' ঢাকা থেকে কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বিধান রায়ের কাছে ফোন এল। বিধানবাবু ফোনে যা জানবার জেনে নিলেন। তিনি সেসময়কার কলকাতার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ 'ইউরোলজিস্ট' ডাঃ আর এন চ্যাটার্জির সঙ্গে কথা বলে তাঁকে ঢাকা পাঠিয়ে দিলেন হক সাহেবকে দেখতে। এই ঘটনাগুলি প্রমাণ করে ডাক্তার হিসাবে তাঁর রোগ নির্ণয়ের ক্ষমতা ও নির্ভরযোগ্যতা কীভাবে দেশ ও কালের সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর রোগ ব্যাধি সম্পর্কে বুঝবার এত ক্ষমতা ও অন্তর্দৃষ্টি জন্মেছিল এজন্য যে মানবদেহের গঠন প্রণালী, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্প্রসারণ ও সংকোচন এবং ব্যক্তিবিশেষের জীবন ধারণ ও খাদ্যগ্রহণের পদ্ধতি

মানবদেহের বিভিন্ন স্থানকে কীভাবে প্রভাবিত করে এগুলি সম্পর্কে তাঁর সম্যক উপলব্ধি ও অনুভূতি। তিনি একজন রোগীকে চোখে দেখে ও স্টেথো লাগিয়ে তাঁকে তাঁর শ্বাস প্রশ্বাসের ওঠাপড়া দেখেই বুঝে নিতেন রোগীর জীবনধারণের প্রণালী এবং কোন্ ওষুধ এর কাজ করবে। ফলে অনেক সময় বিধান ডাক্তার প্রচলিত ডাক্তারি শাস্ত্রের বাইরে গিয়েও রোগীর দৈহিক কাঠামোর ভিত্তিতে চিকিৎসা করতেন। ডাক্তার হিসাবে তিনি যখন ভারতজোড়া খ্যাতির আসনে প্রতিষ্ঠিত, তখন প্রতিদিন সকালে তিনি রোগীদের একটি তালিকা তৈরি করতেন। তাঁর এই তালিকায় যেমন মহাত্মা গান্ধী ও মতিলাল নেহরুর স্থান থাকত তেমনি স্থান ছিল কালিঘাট বা শ্যামবাজারের কোন অখ্যাত ব্যক্তিরও। সেখানে তাঁর কোন বাছবিচার ছিল না। ডাঃ রায় তাঁর জীবনীকার কে পি টমাসকে* একজন ডাক্তারের মন ও চিন্তা কী হওয়া উচিত তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "একজন চিকিৎসকের জীবিকা ও ব্যবসায়ীর জীবিকা কিন্তু কখনই এক নয়। একজন ডাক্তারকে সব সময়েই আর্ত মানুষের সেবা করতে হচ্ছে। সেই আর্ত লোকটি খুব ধনী হতে পারে, আবার নিঃস্ব হতদরিদ্রও হতে পারে। সব রোগীর ক্ষেত্রেই ডাক্তারকে রোগ নির্ণয়ের সঙ্গে মমতা, সমবেদনা ও সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। একজন চিকিৎসকের মনের জগত ও জীবিকার জগত যদি এইভাবে আবর্তিত হয় তাহলে সবটাই ঠিক পথে চলতে পারে।" চিকিৎসক হিসাবে বিধানচন্দ্র রায়ের খ্যাতি আমাদের দেশের ধনাঢ্য লোকদের মানসিকতায় এক বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। ১৯২৮-৩০ সাল পর্যন্ত দেশের দেশীয় রাজন্যবর্গ রাজা মহারাজা, জমিদার, নবাব এবং বড় ব্যবসায়ীরা অসুখ বিসুখ হলেই সাহেব ডাক্তারদের কাছে যেতেন এবং পরিবারের লোকদের ওঁদের বাড়িতে 'কল' দিতেন। এই লোকেরা দেশের ডাক্তারদের পাত্তা দিতেন না কিন্তু বিধান রায় ওঁদের এই মানসিকতাকে ধাক্কা দিলেন। এক্ষেত্রে বিধান ও তাঁর সমসাময়িক চিকিৎসক স্যার ডাঃ নীলরতন সরকার ও ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত ওই চিন্তাধারাকে বদলে দিয়ে প্রমাণ করে দেন যে রোগ নির্ণয়ের ও রোগীকে নিরাময় করতে ভারতীয় ডাক্তাররা কারো চেয়ে কম নন।

ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে মেডিসিন বিভাগে শিক্ষকের পদ খালি হলে বিধান ওই পদে যোগ দেন। (ক্যাম্পবেল পরে মেডিকেল কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং বিধান মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এর নামকরণ করলেন 'নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল') ১৯১৯ সালে বিধান কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে (বর্তমান নাম আর জি কর মেডিকেল কলেজ) মেডিসিনের অধ্যাপক হয়ে আসেন। ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে বিধানকে অবিরাম ওই স্কুলের বর্ণ-বৈষম্যবাদী

ডাঃ বি সি রায় (৭৬ পৃষ্ঠা)-কে পি টমাস।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট মেজর রিটের (Major Reit) সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত থাকতে হয়েছে। বিধান এই পদে যোগ দেওয়ার পর মেজর রিট তাঁকে একদিন বললেন, বিধানের কাজের তুলনায় তাঁর মাসিক ৩৩০ টাকা বেতনের পরিমাণ অনেকটাই বেশি। বিধানও এই অপমানকর উক্তি মেনে নেওয়ার পাত্র নন। বিধান সঙ্গে সঙ্গে শ্লেষ করে বলল, 'আমিও তো ভেবে পাচ্ছি না যে বিলাতের একজন এম আর সি পি ও এফ আর সি এফ এবং কলকাতার এম ডি ডিগ্রি পাওয়া একজন লোক মাসে মাত্র ৩৩০ টাকা বেতন পাচ্ছেন, ও আর একজন এডিনবরায় পরীক্ষায় ফেল করে মাসে কী করে দেড় হাজার টাকা বেতন নিচ্ছেন।' (মেজর রিট এডিনবরায় পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন)। বিধান কিন্তু এটুকু বলেই থামেননি। তিনি আবার বলতে লাগলেন, "মনে হয় গায়ের রঙের পার্থক্যই এই বৈষম্যের কারণ।" কিন্তু মেজর রিট আদৌ ক্ষান্ত হননি। তিনি বিধানকে খোঁচা মারার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি এক ফরমান জারি করে জানিয়ে দিলেন যে ডাঃ রায়কে তাঁর ক্লাসে পড়ানোর কাজের মধ্যেও প্রতিদিন বেলা বারোটা থেকে তিনটা অ্যানাটমি বিভাগে হাজির থাকতে হবে। বিধান মেজর রিটকে জবাব দিলেন, "একটা মানুষের কাজের দক্ষতাই বড় কথা। তিনি কত ঘণ্টা অফিসে থাকেন সেটা নয়।" এর কিছুদিন পরে মেজর রিট বিধানকে লিখিতভাবে জানালেন যে, তাঁকে বেলা চারটে থেকে পাঁচটা সার্জারির ছাত্রদের টিউটোরিয়াল ক্লাস নিতে হবে। বিধান এই চিঠির কোন জবাব দিলেন না। কয়েকদিন বাদে মেজর রিট জানতে চাইলেন যে, তাঁর চিঠির জবাব তিনি কেন পাননি। বিধান জবাব দিলেন, "ওই চিঠির যেখানে যাওয়া উচিত আমি তাকে সেখানেই পাঠিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট, বাজে কাগজ যেখানে ফেলা হয়।" মেজর রিট তাঁর বিরুদ্ধে শৃংখলাভঙ্গের ব্যবস্থা নেবেন বলে শাসালেন। বিধান জবাব দিলেন, "যদি তাই হয় তাহলে আমি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে আমার বক্তব্য পেশ করতে প্রস্তুত।" কিন্তু মেজর রিট শেষ পর্যন্ত এই হুমকি নিয়ে আর কিছু করলেন না। কিন্তু অন্যদিকে তিনি ক্যাম্পবেল স্কুলের ভারতীয় কর্মচারীদের এই নির্দেশ দিলেন যে, যখনই ভারতীয়েরা কোন ইংরেজ অধ্যাপকের সামনে দিয়ে যাতায়াত করবেন, তখন ভারতীয়দের টুপি খুলে ইংরেজদের সম্মান দেখাতে হবে। বিধান রায় এই নির্দেশ মানলেন না। তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন যে, ইংলন্ডে এমন কোন রীতি প্রচলিত নেই। এভাবে মেজর রিটের সঙ্গে তাঁর সংঘাত লেগেই চলল। তাঁর ক্যাম্পবেল-জীবনের শেষদিকে রিট সাহেব একদিন বিধানকে ডেকে বললেন, "ডাঃ রায়, আপনি কি ভাবেন যে আমি একটা নির্বোধ?" ডাঃ রায় গম্ভীরভাবে বললেন, "এর উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়; আমি যদি বলি যে আপনি সত্যিই নির্বোধ, তাহলে আপনি তা মানবেন না। আর আমি যদি উল্টোটা বলি, তাহলে তা হবে আমার বিবেকের বিরুদ্ধে"। এর কিছুদিন পরে কতকটা আকস্মিকভাবে মেজর রিটকে ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদ থেকে বদলি করা হল। রিট সাহেব নিজেই জানতেন যে ক্যাম্পবেল স্কুলের সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদে থাকার

যোগ্যতা তাঁর নেই, অথচ ওই শিক্ষায়তনে মেজর রিটের চেয়ে অনেক বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন অধ্যাপক রয়েছেন। মেজর রিট ক্যাম্পবেল থেকে চলে যাওয়ার আগে বিধানকে ডেকে তাঁর নিজ আচরণের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন।

ক্যাম্পবেলে থাকার সময় একদিকে চিকিৎসক হিসাবে তাঁর খ্যাতি যেমন ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি অধ্যাপক হিসাবেও তাঁর জনপ্রিযতা মেডিকেল ছাত্রদেব মুখে মুখে ঘুরতে থাকে। একদিন তিনি ক্যাম্পবেল থেকে ফিরছিলেন বউবাজার স্ট্রিট ধরে। কলেজ স্ট্রিট ও বউবাজার স্ট্রিটের মোড়ে তাঁর গাড়ি থামিয়ে তাঁকে ডাকলেন সে সময়কার কলকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্র। তিনি বিধানকে গাড়ি থেকে নামিয়ে বললেন, "তুমি কারমাইকেল মেডিকেল স্কুলে এখনই মেডিসিনের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দাও।" বিধান ডাঃ মিত্রের কাছে ব্যাপারটা বুঝতে চাইলেন। ডাঃ মিত্র তাঁকে জানালেন যে, কারমাইকেল মেডিকেল স্কুল কর্তৃপক্ষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে এই বিদ্যায়তনকে কলেজে উন্নীত করতে চেয়ে অনুমোদনের জন্য আবেদন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট আবেদনটি বিবেচনা করবে বলে ঝুলিয়ে রেখেছে এই যুক্তিতে যে, ওই শিক্ষায়তনে মেডিসিন বিভাগে ভাল অধ্যাপক নেই। স্যার আশুতোষ তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার। শোনা গেল স্যার আশুতোষ কারমাইকেলের পরিচালন সমিতিকে বলেছেন যে, যদি তাঁরা ডাঃ বিধান রায়কে ক্যাম্পবেল থেকে এনে কারমাইকেলে মেডিসিনের অধ্যাপক করতে চান, তাহলে তৎক্ষণাত সিন্ডিকেট কারমাইকেলকে কলেজের অনুমোদন দেবে। ডাঃ মিত্রের সঙ্গে কথা বলার পর বিধান গাড়ি ঘুরিয়ে ক্যাম্পবেলে ফিরে এলেন। তিনি পদত্যাগপত্র হাতে লিখে নতুন সুপারিন্টেন্ডেন্ট কর্নেল লেভিনটন-এর (Col. Levinton) হাতে দিলেন। কর্নেল সাহেব তাঁকে এত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে বারণ করলেন। কিন্তু ততক্ষণে বিধান মনস্থির করে ফেলেছেন। তিনি কারমাইকেলে যোগ দিলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কারমাইকেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পেল। এই কারমাইকেল কলেজ ডাঃ বিধানচন্দ্র রাযকে চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপনার শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছিল। কারমাইকেল যখন আর জি কর নাম পেল, তখনও বিধান ওই কলেজের মেডিসিনের প্রধান অধ্যাপক রইলেন। স্যার নীলরতন সরকার, ডাঃ ললিত ব্যানার্জি, ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্র, ডাঃ সর্বাধিকারী, ডাঃ এম এন ব্যানার্জি প্রভৃতি প্রথিতযশা চিকিৎসকের সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে বিধানচন্দ্র আর জি কর কলেজকে দেশের অন্যতম বৃহৎ মেডিকেল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। ১৯৪৮ সালে এই কলেজের অধ্যাপক পদ থেকে ছুটি নিয়েই তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন।*

ডাঃ বিধান রায়ের ছাত্র ডাঃ নারায়ণকুমাব রায়ের স্মৃতিচারণ থেকে।

চিকিৎসা জগতে বিধানের পরিচিতির ব্যাপ্তি ও তার সম্প্রসারণের জন্য দেশের দু'জন প্রথিতযশা চিকিৎসকের অসামান্য অবদান রয়েছে। ওই দু'জন হলেন ডাঃ নীলরতন সরকার ও বিখ্যাত সার্জেন ডাঃ সুরেশ সর্বাধিকারী। নীলরতন সরকারই বিধানকে হ্যারিসন রোডে বাড়ি ভাড়া নিয়ে প্র্যাকটিস আরম্ভ করতে বলেন। বিধান তাঁর পরামর্শ মেনে নিয়ে হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলে প্রথম প্র্যাকটিস আরম্ভ করেন। নীলরতন সরকার বিধানকে প্রথম পান তাঁর এম ডি থিসিসের একজন পরীক্ষক হিসাবে। বিধান যে পৃথিবীর একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকে পরিণত হবেন, একথা তিনি ১৯১২ সালেই ধরে নিয়েছিলেন। মাত্র দু'বছরের মধ্যে একসঙ্গে এম আর সি পি ও এফ আর সি এস পরীক্ষায় শীর্ষস্থানে থেকেও দেশে ফেরার পর কেবলমাত্র বর্ণবৈষম্যের জন্য তৎকালীন প্রাদেশিক সরকার তাঁকে কোন যোগ্য পদ না দেওয়ায় নীলরতন সরকার মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি ১৯২২ সালে রয়্যাল পাবলিক সার্ভিস কমিশনে (Royal Public Service Commossion) তাঁর সাক্ষ্যদান কালে ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন যে, "যে সকল ইংরেজ আই-এম-এস ডাক্তাররা ইংলন্ডের এম আর সি পি, এফ আর সি এস-এর উচ্চতর পরীক্ষাগুলির তালিকায় বিধানের চেয়ে অনেক নীচে স্থান পেয়েছিল, তাঁদের বিধানের চেয়ে উচ্চপদে বসানো হয়েছে, অথচ বিধানকে তাঁদের সমকক্ষ পদ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। এমনকী, বিধানদের চেয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্ন ইংরেজ ডাক্তারদের অধীনে তাঁকে কাজ করতে হয়েছে।" বাংলার মেডিকেল শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের জন্য ডাঃ নীলরতন সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সদস্য হিসাবে বিধানের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছেন। বিধান হ্যারিসন রোডে বাড়ি ভাড়া নেওয়ার পর নীলরতন সরকার একদিন পরিহাসচ্ছলে বিধানকে বলেছিলেন, 'হ্যারিসন রোডের নাম বদলে কলকাতার হার্লে (Herleigh) স্ট্রিট রাখলে কেমন হয়?' (লন্ডনের হার্লে স্ট্রিটে সেখানকার সবচেযে বড় ডাক্তারদের প্র্যাকটিসের জায়গা। সে আমলে হ্যারিসন রোড-কলেজ স্ট্রিট এলাকায় অনেক বড় ডাক্তাররা থাকতেন)। সে আমলের খ্যাতনামা সার্জেন ডাঃ সুরেশ সর্বাধিকারীও বিধানের মেডিকেল প্র্যাকটিসে প্রভূত সাহায্য করেছেন। ক্যাম্পবেল থেকে বিধানের কারমাইকেলে চলে আসা এবং কারমাইকেলকে এরপর বড় মেডিকেল কলেজে রূপান্তরিত করার উদ্যোগে ডাঃ সর্বাধিকারী সবসময় তাঁর পাশে ছিলেন। ডাঃ সর্বাধিকারীও সেনেট সদস্য ছিলেন। তিনিও ডাঃ নীলরতন সরকারের মতো বাংলার মেডিকেল সম্প্রসারণে বিধানের সকল প্রচেষ্টায় সাহায্য করেছেন। এটা হয়তো অনেক বাঙালি ডাক্তারের কাছে অজানা যে তখন এই বাংলায় 'বেঙ্গল মেডিকেল এডুকেশন সোসাইটি' (Bengal Medical Education Society) নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন নীলরতন সরকার, বিধান রায় ও সুরেশ সর্বাধিকারী। এই সংগঠনের একটি প্রধান কাজ ছিল ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের ইংরেজ

ডাক্তারদের বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। বিধান বহুদিন এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন। বেঙ্গল মেডিকেল এডুকেশন সোসাইটির ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন নিয়ে একবার ডাঃ সর্বাধিকারীর সঙ্গে বিধানের ভয়ানক মতান্তর ঘটেছিল। বিধান তখন ডাঃ সর্বাধিকারীকে কড়া ভাষায় একটি চিঠি দেন। ডাঃ সর্বাধিকারী তাঁর ত্রুটি স্বীকার করে নিলে দু'জনের মধ্যে আর কখনই মতান্তর ঘটেনি। ডাঃ সর্বাধিকারী যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন তিনি বিধানকে সব কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করে গিয়েছেন। সমাজ সংস্কার, শিক্ষাবিস্তার ও নারী জাগরণের ক্ষেত্রে যেমন ছিলেন বিদ্যাসাগর এবং ভারতের শাশ্বত ধর্মের বাণী বহন করে বেদান্ত সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ দেশবাসীকে যেমন উদ্দীপ্ত করেছিলেন, তেমনই ভারতে মেডিকেল শিক্ষার প্রসারে এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ভূমিকা ততখানি উজ্জ্বল। তাঁর উপলব্ধি, তাঁর শিক্ষার মৌলিক আদর্শ এবং তাঁর চেতনার ভিত্তি খুবই সুদৃঢ় ছিল বলেই তিনি চিকিৎসক হিসাবে এক বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। এটা ঘটনা যে, চিকিৎসক হিসাবেই তিনি জাতীয় রাজনীতির নক্ষত্রসুলভ ব্যক্তিদের খুব কাছে এসে গিয়েছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক দীক্ষা ও শিক্ষা প্রধানতঃ এভাবেই হয়েছে। মেডিসিন ও সার্জারিতে তাঁর প্রবাদসুলভ পারদর্শিতা একদিকে যেমন রোগীদের বুঝে নেওয়া সহজসাধ্য হয়েছিল, ঠিক তেমনই ওই পারদর্শিতা তাকে পরবর্তীকালে দেশ গঠনে, জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও শ্রীবৃদ্ধিতে সঠিক দিশা দিতে পেরেছিল। তাঁর মেডিকেল শিক্ষা তাঁকে একটা মানুষকে চিনে নেওয়া ও বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছিল সবচেয়ে বেশি। ফলে দেশের এক প্রবাদপ্রতিম প্রশাসক হিসাবে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বুঝতে পারতেন, কোন অফিসারকে দিয়ে কোন কাজ সফল হবে। সেক্ষেত্রে তিনি অফিসারদের পদ ও মর্যাদার আমল দিতেন না। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল কাজের সাফল্য।

৪

রাজনীতিতে শিক্ষানবিশী : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলার আইন পরিষদ

ব্যাপকতর অর্থে রাজনৈতিক আসরে অবতীর্ণ হওয়ার আগে বিধানচন্দ্র রায়ের রাজনৈতিক শিক্ষানবিশীর সূচনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার আশুতোষের (ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পিতা) নেতৃত্বে। ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে শিক্ষকতা এবং কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক হিসাবে বিধান সাধারণভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হন। বস্তুতপক্ষে তাঁর আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু মেডিকেল

শিক্ষা হলেও ধীরে ধীরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিচালনার ব্যাপারের প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মে। ভাইস চ্যান্সেলার স্যার আশুতোষ প্রথমে বিধানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' (Fellow) হতে বলেন। কিন্তু বিধান তাতে রাজি হন না। তখনকার সময়ে সেনেটের নির্বাচনে যাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন, তাঁদের এই রেওয়াজ ছিল যে, তাঁরা নিজেরা পয়সা খরচ করে একশো জন গ্র্যাজুয়েটের নাম রেজিস্ট্রি করাতেন। এর ফলে তাঁরা রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট হয়ে সেনেট নির্বাচনে ভোট দিতে পারতেন। বেশির ভাগ সেনেট সদস্যই এভাবে নির্বাচনে জিততেন। কিন্তু বিধান সেপথে গেলেন না। তিনি নিজের যোগ্যতাকে মানদণ্ড করে সেনেট নির্বাচনে দাঁড়ালেন এবং যথেষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জিতলেন ১৯১৬ সালের সেনেট নির্বাচনে। তিনি যাঁদের হারিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মন্মথনাথ রায়চৌধুরী ও চারুচন্দ্র বিশ্বাস। ওই সময়ে স্যার আশুতোষের দোর্দণ্ডপ্রতাপ কেবল বাংলার সমাজ ও শিক্ষাধীনেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা ছিল সারা ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত। বিধান সেনেট সদস্য হিসাবে স্যার আশুতোষের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। সেনেট সদস্য হিসাবে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অত্যন্ত মর্যাদার আসনে দেখতে চাইতেন। ওইরকম একসময়ে স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র বঙ্গীয় আইন পরিষদে সেনেটের কাজকর্ম সম্পর্কে কিছু অবাঞ্ছিত মন্তব্য করেন। বিধান তখন সেনেটে একটি প্রস্তাব এনে আইন পরিষদের সদস্যের অবাঞ্ছিত মন্তব্যের প্রতিবাদ জানান এই বলে যে, সেহেতু সেনেটের কোন সদস্য আইন পরিষদে নেই, যেহেতু ওই ধরনের মন্তব্য অশোভন ও নিম্নরুচির পরিষদের। সেনেট এই প্রস্তাবটি অনুমোদন করে বঙ্গীয় আইন পরিষদের প্রিজাইডিং অফিসারকে পাঠিয়ে দেয়। ১৯২২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার হিসাবে স্যার আশুতোষের দ্বিতীয়বারের মেয়াদ শেষ হলে গভর্নর লর্ড লিটন (Lord Lyton) স্যার আশুতোষকে একটি চিঠি দেন। চিঠিতে লাটসাহেব স্যার আশুতোষকে বলেন যে, কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে তিনি স্যার আশুতোষকে তৃতীয়বারের জন্য বিশ্ববিদ্যালযের ভাইস চ্যান্সেলার করতে আগ্রহী। শর্তগুলি চিঠিতে উল্লেখ ছিল। স্যার আশুতোষ ওই চিঠিখানি বিধানকে দেখান এবং শর্তগুলি সম্পর্কে বিধানের মতামত জানতে চান। বিধান স্যার আশুতোষকে বলেন যে ওই শর্তগুলি অপমানজনক। স্যার আশুতোষ লাটসাহেবের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এই বিখ্যাত জবাবটি দিয়েছিলেন 'Freedom first Freedom second and Freedom always.' অর্থাৎ 'স্বাধীনতাই প্রথম, স্বাধীনতাই দ্বিতীয়, এবং স্বাধীনতা সবসময়েই।' জাতীয়বাদের এই পরিবেশ বিধানকে ধীরে ধীরে এক নির্ভীক জাতীয়তাবাদীতে রূপান্তরিত করল। তিনি যখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র তখনই বাংলায় জাতীয়তাবাদের বান এসেছিল বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। বিলেত থেকে ফিরে তিনি যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন, তখন ভারতীয়

রাজনীতিতে গান্ধীজির আবির্ভাব হয়েছে এবং দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এক নতুন গতি ও মাত্রা পেয়েছে। বিধান নিজেকে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত করতে লাগলেন। তিনি অবশ্য ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ না করলেও বাংলায় অসহযোগ আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছের অন্যতম মানুষহিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন। কেবল তাই নয়, কংগ্রেসের মধ্যে থেকেও দেশবন্ধু যে 'স্বরাজ্য দল' গঠন করলেন, বিধানকে তিনি বেছেছিলেন তার একজন কর্মকর্তা হিসাবে। এদিকে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরণ এবং শেষপর্যন্ত ভারতবর্ষ থেকে লর্ড কার্জনের বিদায় সামগ্রিকভাবে ভারতীয় রাজনীতিকে এক নতুন মাত্রায় প্রভাবিত করেছে। ১৯০৫-এর তেজস্বী নেতা সুরেন্দ্রনাথ ইংরেজদের কাছে 'Surender not' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৯১১ সালের পর 'নরমপন্থী' ও শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষপাতী হয়ে পড়লেন। ১৯১৯ সালের মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার সুপারিশকে স্বাগত জানিয়ে বাংলা সরকারের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রীব পদগ্রহণ করলেন। সারা দেশ যাঁকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক বলে চিহ্নিত করেছে। তাঁর এই ইংরেজ তোষণের ভূমিকাকে বাংলার জনগণ মেনে নিতে পারেনি। মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার সুপারিশকে কংগ্রেস বর্জন করল ঠিকই। কিন্তু কংগ্রেস নির্বাচনী ব্যবস্থায় 'কাউন্সিল এন্ট্রি' প্রস্তাবকে গ্রহণ করল। দেশবন্ধুর ভাষায় ছিল 'To wreck it from within' অর্থাৎ শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের সুযোগ নিয়ে ওই সংস্কার পদ্ধতিকে চূর্ণ করে দেওয়া। ১৯২২ সালে নির্বাচনের সময় যখন দ্রুত এগিয়ে আসছিল, তখন স্যার আশুতোষই প্রথম বিধানকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে উৎসাহিত করেন এবং তিনিই বিধানকে উত্তর কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কেন্দ্র বেছে নিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই কেন্দ্রটি বাবাকপুর কেন্দ্র নামে জনগণের কাছে বেশি পরিচিত। এই কেন্দ্র থেকে মনোনীত সদস্য রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ও সেইসঙ্গে 'স্যার' উপাধি পাওয়াতে জাতীয় জীবনে তাঁর জনপ্রিয়তা খুবই কমে গিয়েছিল। বিধান স্যার আশুতোষের অনুপ্রেরণায় নির্দল প্রার্থী হিসাবে এই কেন্দ্রে তাঁর মনোনয়ন দাখিল করেন এবং তাঁর নির্বাচনী ইস্তাহার ঘোষণা করেন যে, তিনি কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী নন। তিনি নির্বাচনী প্রচার আরম্ভ করেন এই বলে যে, ভোটে জেতাই তাঁর আসল লক্ষ্য নয়। সুরেন্দ্রনাথ যদি ইংরেজদের দেওয়া মন্ত্রীপদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে আসেন, তাহলে তিনি এই নির্বাচন থেকে তাঁর প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নিতে প্রস্তুত। এদিকে বিধান যখন নির্দলপ্রার্থী হিসাবে নির্বাচনী আসরে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছেন, তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁকে একদিন ডেকে পাঠালেন। দেশবন্ধু বিধানকে বললেন যে, তাঁরা অর্থাৎ কংগ্রেস স্বরাজ্য দল উত্তর কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কেন্দ্রে সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তাঁকে অর্থাৎ বিধানকেই দলীয় প্রার্থী করতে চান। এই বলে দেশবন্ধু

কংগ্রেসের প্রতিজ্ঞাপত্রে বিধানকে সই করতে বলেন। বিধান তাঁকে বললেন কংগ্রেসের আদর্শের সঙ্গে তাঁর আদৌ কোন বিরোধ নেই। কিন্তু এখন তিনি ওই প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করতে পারবেন না। কারণ তিনি ইতিমধ্যেই নির্দলপ্রার্থী বলে মনোনয়ন দিয়েছেন। এখন তিনি কংগ্রেস স্বরাজ্যদলের প্রার্থী হলে ভোটারদের কাছে তাঁর মুখ থাকবে না। দেশবন্ধু একটু অসন্তুষ্টই হয়েছিলেন বিধানের উপর। তিনি বললেন, তাহলে কংগ্রেস যদি ওই কেন্দ্রে নিজের আলাদা প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে, তাহলে বিধানের নির্বাচনী ভাগ্য কী দাঁড়াবে? বিধান জবাব দিলেন, সেটা হলে তা খুবই দুর্ভাগ্যজনক হবে। সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধের ভোট ভাগ হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর কংগ্রেসে প্রার্থীপদ গ্রহণের কোন পথ নেই। এর কয়েকদিন পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ঘোষণা করলেন যে, উত্তর কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কেন্দ্রে কংগ্রেস স্বরাজ্য দল কোন আলাদা প্রার্থী দেবে না। তারা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রার্থীপদ সমর্থন করবে। বিধান স্বরাজ্যদল সমর্থিত প্রার্থী হলেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর দলের অন্যান্য প্রার্থীদের মতোই বিধানের নির্বাচনকেন্দ্রে ব্যাপক প্রচার কার্য চালিয়েছিলেন। কারণ, উত্তর কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কেন্দ্রের এই নির্বাচনকে দেশবন্ধু নিজেও মর্যাদার লড়াই বলে ধরে নিয়েছিলেন। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯২২ সালের এই নির্বাচন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে সারা দেশ এই নির্বাচনের ফলাফলের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে ছিল। ১৯২২ সালের ৩০ নভেম্বর তারিখে উত্তর কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কেন্দ্রের ভোটের ফল ঘোষণা করা হলে বাঙালির রাজনৈতিক জীবনে এক তড়িত প্রবাহ খেলে গেল। অপেক্ষাকৃত অপরিচিত এবং পরিষদীয় রাজনীতিতে একেবারেই নবাগত বিধান বিপুল ভোটে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে পরাজিত করলেন। বিধান পেলেন ৫৬৮৮ (5688) এবং সুরেন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন ২২৮৩ (2283) ভোট। বিধানের বয়স তখন ৪২ বছর। এই নির্বাচনের কয়েক বছর পর স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র বঙ্গীয় আইন পরিষদে বিধানের এই জয়লাভ সম্পর্কে অভিযোগ করেছিলেন যে, বিধান "সুরেন্দ্রনাথের মতো একজন মানুষকে দেশের জনজীবন থেকে একেবারে তাড়িয়ে দিলেন।" বিধান কিন্তু বিনীতভাবে জবাব দিয়ে ছিলেন যে, "দেশের রাজনৈতিক জীবনে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ সে অবদান রেখে গিয়েছেন, দেশবাসী তা কখনই ভুলবে না। আমি সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিলাম, ব্যক্তি হিসাবে তাঁর বিরোধিতার জন্য নয়। সুরেন্দ্রনাথ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে নিজেকে বৃটিশ আমলাতন্ত্রের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলেছিলেন। এরই প্রতিবাদে আমি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি।"

বিধান দীর্ঘ আট বছর এই নির্বাচন কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসাবে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করলে কংগ্রেসের নির্দেশে অন্যান্যদের মতো বিধানও আইন পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। বঙ্গীয় আইন পরিষদে কংগ্রেস ও স্বরাজ্যদলের সদস্যরা একসঙ্গে বসতেন।

দেশবন্ধু ছিলেন ওই সদস্যদের সর্বসম্মত নেতা। দেশবন্ধু পরিষদীয় বক্তা হিসাবে বিধানকে খুব তারিফ করতেন। দেশবন্ধু আইন পরিষদে বাংলার উন্নয়নের জন্য যে ঐতিহ্য গঠনমূলক পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন, তার খসড়া রচনায় বিধানের পরিশ্রম ছিল অনেকখানি। এভাবে বিধান দেশবন্ধুর সান্নিধ্যে এসে গেলেন। ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার যে ভারতীয়দের কোন কাজে আসবে না এবং ওই সংস্কার দলিলে যে কোন সারবস্তু নেই তা দেশবাসীর কাছে তুলে ধরাই ছিল স্বরাজ্যদলের পরিষদীয় কৌশল। ওই লক্ষ্যে উপনীত হওয়াই ছিল কেন্দ্রীয় আইনসভায় মতিলাল নেহরুর এবং বঙ্গীয় আইন পরিষদে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কৌশল। বঙ্গীয় আইন পরিষদে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে সদস্যরা সরকারের মন্ত্রিদের কাজকর্মে প্রতিপদে বাধা দিতেন এবং পরিষদীয় অচলাবস্থার সৃষ্টি করতেন। বিধান তাঁর পরিষদীয় জীবনের প্রথম দিকে জাতীয় প্রশ্ন নিয়ে বিতর্কের ব্যাপারে খুব একটা অংশগ্রহণ করতেন না। তাঁর আগ্রহ ছিল প্রধানত তাঁর নির্বাচনী এলাকার অধিবাসীদের সমস্যা ও অসুবিধাগুলির প্রতি। তিনি তখন প্রতিবাদ করতেন মন্দির বানিয়ে ঘোড়-দৌড়ের মাঠের চৌহদ্দি বৃদ্ধিতে। বালি রেলব্রিজে পথচারীদের জন্য ফুটপাথ না রাখার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাটতি পূরণের জন্য তিনি সেই আমলে প্রাদেশিক সরকারের কাছে দাবি রেখেছিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে বছরে তিন লাখ টাকা করে অনুদান দেওয়া হোক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈষম্য সৃষ্টি এবং অধ্যাপকদের মধ্যে দলবাজি আমদানি করার জন্য তিনি সরকারি চক্রান্তকে দায়ী করেন। আইন পরিষদে ১৯২৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল নিয়ে বিতর্কের সময় বিধান ওই বিলকে পূর্ণ সমর্থন জানান। ১৯২৮ সালে এই বিলের একটি সংশোধনী নিয়ে বিতর্কের সময় সবকাব মনোনীত সদস্য স্যার আবদুর রহিম কয়েকটি সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করলে বিধান তাঁর উক্তির প্রতিবাদ করে বলেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বৈরিতার বা প্রতিহিংসার কোন কারণ নেই। তিনি চাইবেন বঙ্গ প্রদেশের পাঁচটি করে জেলা নিয়ে গঠিত প্রতিটি ডিভিশনে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় হোক। আইন পরিষদে বিতর্ককালে তিনি মেডিকেল শিক্ষা সহ সকল বিষয়েব উচ্চ শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য বারংবার দাবি জানাতেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসনের (Autonomy) অন্যতম প্রবক্তা হিসাবে আইন পরিষদে বলেছিলেন যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল'কে যেন কখনই সরকারি কার্যনির্বাহীদের অধস্তন বিভাগ বলে গণ্য না করা হয়।

সে আমলে কলকাতার হাসপাতালগুলিতে মেয়ে নার্সদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিলেন ইউরোপিয়ান বা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। এই জীবিকায় ভারতীয় মেয়েদের দেখাই যেত না। বঙ্গীয় আইন পরিষদে বিধান সম্ভবত প্রথম ব্যক্তি, যিনি ভারতীয় বিশেষ করে বাঙালি মেয়েদের নার্সিং জীবিকা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি

মেডিকেল শিক্ষার এবং হাসপাতালগুলিতে রোগীদের সেবার স্বার্থে ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের ডাক্তারদের সঙ্গে ভারতীয় ডাক্তারদের বৈষম্য না করতে প্রাদেশিক সরকারের কাছে বারংবার আবেদন রেখেছিলেন। চিকিৎসার স্বার্থে সরকারি মেডিকেল স্কুল ও বেসরকারি মেডিকেল স্কুলগুলিকে সমান চোখে দেখতে সরকারের কাছে অনেকবার দাবি জানিয়েছিল। ১৯২৫ সালে বিধান রায় বঙ্গীয় আইন পরিষদে হুগলি নদীর দূষণ প্রতিরোধের জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করেন। ওই প্রস্তাবে তিনি সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করে হুগলি নদীর দূষণের মাত্রা যাচাই করতে এবং তিনি ওই কমিটিকে সাহায্য করার আশ্বাস দেন। আইন পরিষদের সদস্য হিসাবে তিনি আর একটি বিষয়ে খুব আগ্রহ দেখাতেন। সেটি হল বাজেট। সে সময়ে ভারতীয় প্রশাসনে ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিকল্পনা ও উন্নয়নের কোনরূপ ধারণার উদ্ভব হয়নি। ১৯২৪ সালের সে আমলেই বিধানের মনে ওইসব চিন্তাগুলি এসে গিয়েছিল। ১৯২৪ সালে প্রাদেশিক সরকারের আর্থিক ব্যয়বরাদ্দের আলোচনার সময় তিনি সরকারের অর্থমন্ত্রীকে বলেছিলেন যে, ব্যয়বরাদ্দ বাদ দিয়ে রাজস্ব খাতে যে, উদ্বৃত্ত অর্থ থাকবে, তা একটি বিশেষ তহবিলে রূপান্তরিত করা দরকার এবং ওই বিশেষ তহবিলের অর্থ প্রদেশের উন্নয়নে এবং জনকল্যাণে ব্যবহার করা উচিত। তিনি সরকারি আয়-ব্যয়ের হিসাবের গরমিল এবং অসামঞ্জস্যগুলি খুঁজে বের করতেন। তাঁর প্রশ্নবাণে অর্থমন্ত্রীকে সর্বদাই জর্জরিত হতে হলো। বিধান তার এই দক্ষতাপূর্ণ ভূমিকার জন্য বঙ্গীয় আইন পরিষদে প্রকারান্তরে স্বরাজ্যদলের প্রধান মুখপাত্রে পরিণত হয়েছিলেন। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর প্রয়াণের পর দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত আইন পরিষদে স্বরাজ্যদলের নেতা নির্বাচিত হলেন। বিধান হলেন স্বরাজ্য পরিষদীয় দলের সহকারী নেতা। স্বরাজ্য দলের মুখপাত্র হিসাবে বিধান আইন পরিষদে নতুন হাওড়া ব্রিজ ও বালি রেল ব্রিজে পথচারীদের সুবিধার জন্য ফুটপাথ নির্মাণের দাবি জানান। তাঁর দাবির মধ্যে এ বক্তব্য ছিল যে, যেহেতু সরকার ওই ব্যবস্থা গ্রহণ করলে নদীর উভয় পাড়ের লোকদের যাতায়াতের সুবিধা বাড়বে, সেহেতু দুই পাড়ে বসবাসকারী লোকদের কাছ থেকে এক ধরনের ট্যাক্স আদায় করা হোক। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁর মধ্যে উন্নয়নের ও শিল্পায়নের যে মানসিক দৃঢ়তা দেখা গিয়েছে, তার অঙ্কুর সেদিন থেকেই বিধানের চিন্তায় প্রোথিত ছিল। ১৯২৯ সালে প্রদেশের তৎকালীন মন্ত্রী স্যার নলিনীরঞ্জন সরকার প্রদেশের শিল্পায়নের জন্য আইন পরিষদে একটি বিল পেশ করেছিলেন, বিধান সর্বান্তকরণে ও বিল সমর্থন করে বলেছিলেন যে, বাংলা প্রদেশের লোকদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্য নতুন নতুন শিল্প পরিষদ গড়ে ওঠা উচিত।

এখন দেশের আইন সভাগুলির পরিচালকদের 'স্পিকার' (Speaker) বলা হয়ে থাকে, কিন্তু তখনকার ব্যবস্থায় ওই একই ধরনের লোকদের বলা হতো 'সভাপতি'

(President)। সেই সময় বঙ্গীয় আইন পরিষদের সভাপতি ছিলেন দিনাজপুরের জমিদার কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়। কংগ্রেস স্বরাজ্যদলের সদস্য বীরেন্দ্রনাথ শাসমল সভাপতির কয়েকটি অন্যায় আচরণের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেন আইন পরিষদে। ১৯২৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারিতে এই প্রস্তাবের আলোচনাকালে বিধান তাঁর প্রথম রাজনৈতিক বক্তৃতা দেন আইন পরিষদে। এই অনাস্থা প্রস্তাবের বয়ান ছিল এই যে, আইন পরিষদের সভাপতি শিবশেখরেশ্বর রায় শৃংখলাভঙ্গের অভিযোগে পরিষদের কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধে "বেআইনি ব্যবস্থা" নিয়েছেন। বিধান এই বক্তৃতায় 'মাদার অব পার্লামেন্ট' (Mother of Parliament) অর্থাৎ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট থেকে নজির তুলে তুলে পরিষদের সভাপতিকে আক্রমণ করেছিলেন। তিনি বক্তৃতার উপসংহারে আবেগের সঙ্গে একথা বলেন, "এই অনাস্থা প্রস্তাবটি ভোটাভুটিতে হেরে গেলে তা হারবে কেবল এই কারণে যে, সরকারের হাতে রয়েছে অনুগত এবং দাস মনোবৃত্তিসম্পন্ন সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। সেক্ষেত্রে আমি এই আইন পরিষদের দরজা জনগণের কাছে খুলে দিয়ে তাদের পরিষদের সভাপতির চেহারাটা দেখিয়ে দিতে পারব যে, সরকারি সুবিধাভোগীর পোশাকে কীভাবে নিজেকে আবৃত করে তিনি ট্রেজারি বেঞ্চের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে আছেন।" এই অনাস্থা প্রস্তাবটি অনিবার্যভাবেই হেরে গিয়েছিল। ১৯২৭ সালের আগস্ট মাসে বিধান নিজেই সরকারের দুই মন্ত্রী ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ও আবুল কাশেম গজনভির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। সে সময় আইন পরিষদের সদস্য কাঠামো এমন ছিল যে, মুসলিম সদস্যদের ভোটের উপর অনাস্থা প্রস্তাবের জয় পরাজয় নির্ভর করত। বিধানের পেশ করা এই অনাস্থা প্রস্তাবটি মুসলিম সদস্যেরা সমর্থন করায় পরিষদে তা পাস হওয়ার ফলে ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ও গজনভি সাহেবকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। এভাবেই তিনি প্রমাণ করতে পেরেছিলেন যে, মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনতন্ত্র ভারতবাসীর কাছে কতটা অগ্রহণযোগ্য ও কতটা হতাশাপূর্ণ এবং যত তাড়াতাড়ি এই শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটে ততই মঙ্গল। এভাবে পরিষদে জাতীয় রাজনৈতিক বক্তব্য পেশের মধ্য দিয়ে বিধান স্বরাজ্য দলের অন্যতম নেতৃত্বের আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। ১৯২৭ সালে খড়গপুরে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কর্মীদের ধর্মঘট ও তাঁদের উপর পুলিশের গুলি চালানোর ব্যাপারে তিনি পরিষদে একটি মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে আগাগোড়া ইংরেজদের নিয়ে গড়া 'সাইমন কমিশন' ভারতে আসে। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে 'সাইমন কমিশনের' বিরুদ্ধে হরতাল ও বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। ওই সময় দেশের সর্বত্র কংগ্রেস কর্মীদের উপর পুলিশের অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা চলে। ওই সময়ে বঙ্গীয় আইন পরিষদে প্রাদেশিক সরকারের পুলিশ বাজেটের আলোচনা চলছে। স্বরাজ্য পার্টি ওই বাজেটের উপর একটি প্রস্তাব

আনে এবং বিধানকে পার্টির তরফে বক্তব্য পেশ করতে নির্দেশ দেয়। এই বিষয়টির উপর বিধানের বক্তৃতা এত তীক্ষ্ণ, তথ্যপূর্ণ, শ্লেষাত্মক ও হৃদয়গ্রাহী হয় যে, একজন ইউরোপীয় সদস্য বলে উঠেন যে, তিনি এই আশা রাখবেন যে, আগামী দশ পনেরো বছর পরে বিধান যেন একসময় ট্রেজারি বেঞ্চে বসে পুলিশের ভূমিকাকে সমর্থন করে। এটাকে একরকম ভবিষ্যদ্বাণী বলা যেতে পারে। খড়গপুরে রেলকর্মীদের উপর গুলিচালনার ব্যাপারে তিনি বিশেষভাবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি আইন পরিষদে একথা বলেছিলেন যে, খড়গপুরে রেল কোম্পানির উচ্চপদস্থ অফিসারদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অতিরিক্ত সহায়ক সশস্ত্র বাহিনীর টুপি পরতে বাধ্য করেন এবং তাঁদের দিয়ে ধর্মঘটী রেলকর্মীদের উপর গুলি চালান। ১৯২৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় 'সাইমন কমিশন' বিরোধী বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের উপর পুলিশের নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতাকে ধিক্কার জানিয়ে বিধান আইন পরিষদে বলেন, বলপ্রয়োগ পরিস্থিতি অনুযায়ী সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি ভারতীয় পুলিশ কর্মচারীদের সরিয়ে রেখে পুলিশের ইউরোপিয়ান সার্জেন্টদের দিয়ে ওই অত্যাচার চালানো হয়েছে। ওই পুলিশ সার্জেন্টরা রমাপ্রসাদ মুখার্জির (স্যার আশুতোষের পুত্র) মতো গণ্যমান্য ব্যক্তিদের গ্রেফতার ও হেনস্তা করেছে। পুলিশ লোকজনের বাড়িতে ঢুকে নাগরিকদের পারিবারিক শালীনতাকে আঘাত করেছে। ওই বছরেরই আগস্ট মাসে তিনি আর একটি স্মরণীয় বক্তৃতা দিয়েছিলেন আইন পরিষদে। কারণটা ছিল স্যার আবদুর রহিমের একটি প্রস্তাবের উপর আনা আবুল কাশেম ফজলুল হক সাহেবের একটি সংশোধনী সম্পর্কিত। স্যার আবদুর রহিমের প্রস্তাবের বয়ান ছিল এরকম, ভারতের ভবিষ্যৎ সাংবিধানিক অবস্থা নির্ধারণের সময় যেন ভোটাধিকারের ব্যবস্থা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে হয়। ফজলুক হক সাহেব এই মূল প্রস্তাবের উপর একটি সংশোধনী পেশ করলে বিধান মূল প্রস্তাব ও সংশোধনী উভয়েরই বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, বঙ্গীয় আইন পরিষদ এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার উপযুক্ত জায়গা নয়। কারণ, এটি সামগ্রিকভাবে জাতির রাজনৈতিক ভবিষ্যতের প্রশ্ন। এটা এমনই এক বিষয়, যার মীমাংসা এই পরিষদে হতে পারে না। এটা হতে পারে দেশের রাজনৈতিক নেতাদের গোল টেবিল বৈঠকের মধ্য দিয়ে, যে বৈঠকে তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ ইংরেজ শাসকদের উপস্থিতি থাকবে না।

তখনকার দিনের বাংলার বৃহত্তম শিল্পাঞ্চল ছিল বারাকপুর বিধানের নির্বাচনকেন্দ্রের মধ্যে। জাতীয় প্রশ্নের মতো তিনি তাঁর নির্বাচনকেন্দ্রের ঘটনাকেও গুরুত্ব দিতেন। ১৯২৯ সালে বারাকপুর শিল্পাঞ্চলে চটকল শ্রমিকদের এক অভূতপূর্ব ধর্মঘট আরম্ভ হয়। ওই সময় (৮ আগস্ট, ১৯২৯) তিনি পরিষদে একটি মুলতুবি প্রস্তাব পেশ করে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার দাবি জানান। ৮ আগস্ট তারিখে তাঁর

পেশ করা প্রস্তাব নিয়ে পরের দিনই আলোচনা আরম্ভ হয়। বিধান আলোচনাব সূত্রপাত করে বলেন, "আমি মেকি বা খাঁটি কোন শ্রেণীরই ট্রেড ইউনিয়ন নেতা নই। কিন্তু ও চটকল শ্রমিকের৷ আমার নির্বাচনকেন্দ্রের লোক। তারা আমাকে ভোট দিয়ে তিন তিন বার এই আইন পরিষদে পাঠিয়েছে। সুতরাং ওই শ্রমিকদের কথা বলার হক্ দাবি আমার আছে।" তিনি একজন কংগ্রেসকর্মী হিসাবে শ্রমিক ও পুঁজিপতি মালিকদের মধ্যে একটা আপস রফার কথা বলেন। তিনি সরকারের সমালোচনা করে বলেন যে, এক্ষেত্রে সবকারের মনোভাব একেবারেই মালিক পক্ষ ঘেঁষা। তিনি মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে এক অংশীদারিত্বের আহ্বান জানান এবং সরকারকে উদ্যোগী হতে বলেন। তাঁর মুলতুবি প্রস্তাবটি বিনা বাধায় পরিযদে গৃহীত হয।

পরিষদীয় রীতিতে তাৎক্ষণিক প্রত্যুত্তর ও শ্লেষ ছুড়ে মারতেও বিধান অদ্বিতীয় ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে সুভাষচন্দ্র বিতর্কে বিতর্কিত ওটেন সাহেব তখন শিক্ষাবিভাগের ডি-পি-আই এবং পদাধিকার বলে তিনি আইন পরিযদের সদস্যও। ১৯২৭ সালের মার্চে পরিযদে শিক্ষা বিভাগের বাজেট বিতর্ক চলছে। বিতর্কের সময় ওটেন সাহেব হঠাৎ বলে উঠলেন "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিচালন ব্যবস্থায় মুসলমানদের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব নেই।" সঙ্গে সঙ্গে বিধান ওটেন সাহেবের মুখের উপর ছুড়ে দিলেন "আপনি আরও কয়েকজন মুসলমানকে সেনেটে মনোনয়ন দিলেই তো পারেন!" শিক্ষাখাতে এই বাজেট বিতর্কের সময় একজন সদস্য শিক্ষামন্ত্রীর বেতন কমিযে দেওয়ার জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করেন। বিধান ওই প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করেন।*

৫

কলকাতার মেয়রের ভূমিকায়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বঙ্গীয় আইন পরিষদে বিধান যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁরই স্বীকৃতি হিসাবে ১৯৩০ সালে তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত হলেন। এদিকে সারা দেশ উত্তাল হয়ে উঠল গান্ধীজির আইন অমান্যের ডাকে (Civil Disobedience Movement)। ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাদেশিক আইনসভাগুলি থেকে কংগ্রেসে সদস্যেরা পদত্যাগ করলেন। এভাবে সকল কংগ্রেস সদস্যদের আইনসভা ছেড়ে বেরিয়ে আসা বিধানের পছন্দ

* ডাঃ বি সি রায (কে পি টমাস, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি)।

ছিল না। কিন্তু শৃংখলাপরায়ণ কংগ্রেসকর্মী হিসাবে তিনি পার্টির সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন। সারা দেশ জুড়ে কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের ধরপাকড় আরম্ভ হল। গান্ধীজির ঐতিহাসিক ডান্ডি অভিযানের আগেই কলকাতায় গ্রেফতার হলেন সুভাষচন্দ্র। কিছুদিন পরে কারারুদ্ধ হলেন কলকাতার মেয়র দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন। বাংলার কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে বিধান ছাড়া বলতে গেলে আর সকলেই জেলে। ইংরেজ সরকার কংগ্রেসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। দেশপ্রিয় গ্রেফতার হওয়ার পর কর্পোরেশনে কংগ্রেস কাউন্সিলাররা নেতৃহীন হয়ে পড়লেন। নেতাদের মধ্যে কারান্তরালের বাইরে একমাত্র বিধান এবং নিষিদ্ধ কংগ্রেস পার্টি তাঁকেই কাউন্সিলারদের নেতৃত্বদানের নির্দেশ দিল। ১৯৩০ সালে বিধানচন্দ্র রায় কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হলেন। যেহেতু তিনি কাউন্সিলার ছিলেন না, সেহেতু কংগ্রেস কাউন্সিলাররা তাঁকে অল্ডারম্যান হিসাবে নির্বাচিত করে পরে মেয়রের পদে নির্বাচিত করলেন (১৯৩২)। ১৯৩৯ সালে তিনি আবার কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হলেন এবং সেবার তিনি মেয়র পদের পাঁচ বছর মেয়াদ পূর্ণ করলেন ১৯৪৩-৪৪ সাল পর্যন্ত। ১৯৩২ সালে তিনি যখন দ্বিতীয় বারের জন্য মেয়র হলেন তখন সুভাষচন্দ্র বসু নিতান্ত আকস্মিকভাবেই জেলের বাইরে ছিলেন। সুভাষচন্দ্র অল্ডারম্যান হিসাবে কর্পোরেশনের সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিই মেয়র পদের জন্য বিধানের নাম প্রস্তাব করলে সর্বসম্মতিক্রমে বিধান মেয়র পদে নির্বাচিত হন। ওই সময়ে সুভাষচন্দ্র মেয়র হিসাবে বিধানকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন, "ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্পোরেশনে নবাগত হলেও জনসেবার ক্ষেত্রে তিনি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন।" কিন্তু পরের বছর বিধানকে দুজন প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হতে হয়। তাদের একজন আবুল কাশেম ফজলুল হক ও অন্যজন হলেন জে এন মৈত্র। হক সাহেব পান ৮, ও জে. এন মৈত্র ২২ ভোট পান। কিন্তু বিধান পান ৪২টি ভোট। এর কিছুদিন পরে মেয়র বিধানচন্দ্র রায়কে ইংরেজ সরকার গ্রেফতার করে। ওই সময় বিধান সহ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। ছ'মাসের কারাবাসে থেকেও তিনি শহরের করদাতাদের সুখ-সুবিধার খোঁজ নিতেন প্রায় দৈনন্দিন। বিধান কলকাতা শহরকে ভালবাসতেন। কেবল মেয়র হিসাবেই নয়, একজন ডাক্তার হিসাবে তিনি কলকাতার সব অলিগলি চিনতেন ও সমস্যাগুলিও বুঝতেন। তাঁর সমসাময়িক কাউন্সিলাররা অনেকেই স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, ১৯৩০ সালে মেয়র হওয়ার পর তিনি দুপুরের মধ্যে কর্পোরেশনে আসতেন এবং বেলা তিনটে পর্যন্ত অফিস করতেন। একটানা কাজে তিনি ছিলেন প্রথম মেয়র। মেয়র হয়েও তিনি কর্পোরেশনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্ট্যান্ডিং কমিটি যেমন, অর্থ, জলনিকাশি, আবর্জনা ও ময়লা সাফাই কমিটিগুলির চেয়ারম্যান হিসাবেও কাজ করেছেন। শহরের খেলার মাঠ ও ভিখারি সমস্যা সংক্রান্ত কমিটিগুলিও তিনি পরিচালনা করেছেন। মেয়র হিসাবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর

মৃত্যুর আগে কলকাতার গরিব মানুষদের সেবা ও তাঁদের অবস্থার উন্নতির জন্য একটি খসড়া প্রস্তাব রচনা করে গিয়েছিলেন। বিধান প্রথম মেয়র হয়েই দেশবন্ধুর প্রস্তাবটির পুনর্বিন্যাস করে শহরের গরিব মানুষের এলাকাগুলিতে কিছু অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কর্পোরেশনে কংগ্রেস দলের নেতা হিসাবে মেয়র বিধান ১৯৩০ সালের ১৪মে তারিখে কর্পোরেশনের সভায় এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ওই প্রস্তাবে 'অহিংসার প্রতীক' মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। ওই বছরেই আরও কয়েকদিন পরে রাইটার্স বিল্ডিংসে সশস্ত্র অভিযানের অন্যতম নায়ক দীনেশ গুপ্তকে ফাঁসি দেওয়া হয়। এই ফাঁসির প্রতিবাদে বিধান মেয়র হিসাবে এক প্রস্তাব উত্থাপন করে দীনেশ গুপ্তকে ফাঁসি দেওয়ায় 'কলকাতার নগরবাসীদের গভীর দুঃখ ও শোক' জ্ঞাপন করেন। ওই বছর এপ্রিল মাসে বিনয় বাদল দীনেশ এই তিন সশস্ত্র বিপ্লবী রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ঢুকে কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্নেল সিম্পসনকে গুলি করেছিলেন। কর্পোরেশনের সভায় দীনেশের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মেয়র বিধান যে প্রস্তাব পাঠ করেছিলেন সেটি ছিল এই—"বিশ্বাসের দিক থেকে এবং কংগ্রেসের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী আমরা দীনেশ অনুসৃত পদ্ধতির সঙ্গে একমত নই। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানাতেই হবে। তাঁর সাহস ও বীরত্বের জন্য, তা যতই ভুলপথে পরিচালিত হোক না কেন। দীনেশ জীবনের শেষমুহূর্ত সাহস ও বীরত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে ফাঁসুড়ের হাত থেকে ফাঁসির দড়ি গলায় পরে নিয়ে শেষবারের মতো বন্দেমাতরম উচ্চারণ করে গিয়েছেন।" কিন্তু কলকাতা কর্পোরেশনের এই প্রস্তাবে গান্ধীজি ক্ষুণ্ণ হলেন। তিনি ওই প্রস্তাবকে 'হিংসার প্রতি সমর্থক ও উৎসাহ দান' বলে মনে করলেন এবং প্রস্তাবটি প্রত্যাহারের জন্য প্রকাশ্যে দাবি জানালেন। বিধান উভয় সংকটে পড়লেন। একদিকে বাংলার জনমত ও অন্যদিকে গান্ধীজির ঘোষিত নির্দেশ। অন্য অনেক সমস্যা অহিংসা নিরসনের মতো এই সংকট নিরসনেও বিধান এক অভাবিত সূত্র বের করলেন। ওই সূত্র হল, কর্পোরেশনের কার্য পদ্ধতিতে এক সভার গৃহীত প্রস্তাব পরবর্তী সভায় প্রত্যাহারের কোন বিধান নেই। কর্পোরেশনের পরবর্তী বৈঠকে দীনেশ গুপ্ত সম্পর্কিত আগেকার বৈঠকের প্রস্তাব এবং তৎসহ গান্ধীজির আপত্তির বিষয়টি উত্থাপিত হল। কিন্তু যেহেতু প্রস্তাব প্রত্যাহারের কোন বিধান কর্পোরেশনের কার্যপদ্ধতিতে নেই, সেহেতু দীনেশ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রত্যাহার করা গেল না। কর্পোরেশনের ঐ সভার কার্যবিবরণীতে বিধান নিজের হাতে এই কথা লিখলেন।

কলকাতার পুলিশ কমিশনার হিসাবে যিনি ইতিহাসে খুব বড় এক জায়গা করে নিয়েছিলেন, সেই স্যার চার্লস টেগার্ট অবসরের পর ইংলন্ডে ফিরে গিয়ে ১৯৩২ সালে কলকাতা কর্পোরেশন সম্পর্কে কিছু কটূক্তি করেন। টেগার্ট সাহেব ইংলন্ডের কোন স্থানে বক্তৃতায় বলেন যে, কলকাতা কর্পোরেশনে "সন্ত্রাসবাদীদের আড্ডাখানা এবং সন্ত্রাসবাদীদেরই সেখানে চাকুরি দেওয়া হয়ে থাকে প্রধানত শিক্ষক হিসাবে।"

কলকাতার ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশন টেগার্টের ওই বক্তৃতার পুরোটা ছাপিয়ে কলকাতায় বিলি করে। বিধান টেগার্ট সাহেবের ওই সব কথা ও উক্ত অ্যাসোসিয়েশনের প্রচারের প্রতিবাদে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মেয়রের পদ থেকে তিনি প্রতিবাদে বলেন : "আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি যে ওসব কথা (টেগার্টের) আগাগোড়া অসত্য ও উদ্দেশ্যমূলক কুৎসা। দেশের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ওইসব অসঙ্গত ও ভ্রান্ত কথাবার্তা বলে কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য। যাঁরা দেশের জন্য দুঃখ বরণ করেছেন তাঁদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করার অব্যবহিত পরে ওইসব কথা বলা হয়েছে। ওই কথাগুলিতে এমন একটা ধারণা জন্মাবে যেন এই পুর প্রতিষ্ঠান বছরের পর বছর সন্ত্রাসবাদী ও তাঁদের পরিবারের লোকদের আশ্রয় দিয়ে এসেছে বিশেষ করে শিক্ষকের চাকুরি দিয়ে।' দেশের স্বার্থে দুঃখবরণ করাকে উপেক্ষা করে টেগার্ট সাহেব অদ্ভুতভাবে সন্ত্রাসবাদীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন! 'নাইডহুড' খেতাব পাওয়া এই মস্তবড় লোকটার এত দ্রুত এই বিষয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার কী প্রয়োজন ছিল? কী প্রয়োজন ছিল ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ওসব কথা ছাপিয়ে বিলি করার? আমি বলতে পারি যে স্যার চার্লস টেগার্টের পুরো বক্তৃতাটাই এক রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার, যা তিনি মহান প্রতিষ্ঠান কলকাতা কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। আমি যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেই যে, কর্পোরেশনে চাকরি করছে এমন কোন ব্যক্তি বিশেষ কখনও সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম করেছিল, কিন্তু চাকরিপ্রার্থী হিসাবে যোগ্যতার পরীক্ষায় সেই ব্যক্তিবিশেষ যদি উত্তীর্ণ হয়, তাহলে কি সে চাকুরি পাবে না এই যুক্তিতে যে সে একসময়ে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে ছিল?"

চিকিৎসক হিসাবে, পরিষদীয় বক্তা হিসাবে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার হিসাবে, পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মূল্যায়ন হয়েছে। কিন্তু কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হিসাবে তাঁর মূল্যায়ন সম্ভবত একেবারেই হয়নি। তাঁর এই মূল্যায়ন হলে তিনি এই মহান প্রতিষ্ঠান কলকাতা কর্পোরেশনের সুদীর্ঘ ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মেয়র হিসাবে প্রতিপন্ন হবেন। সে আমলে জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশীয়ানার প্রধান কেন্দ্রবিন্দু এই কর্পোরেশন থেকেই বিধান দেশের গরিব, নিঃস্ব মানুষকে জানতে পেরেছেন। এখান থেকেই তিনি ওই লোকদের প্রয়োজন চাহিদা, বুঝে নিয়েছেন। তাদের জন্য বিনা খরচে চিকিৎসা, ওষুধ, রোগ নির্ণয়, পরিশ্রুত জল সরবরাহ, শিক্ষাব্যবস্থা বিস্তারের জন্য বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কর্পোরেশনের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ ও তার সম্প্রসারণের জন্য রাজস্ব বৃদ্ধির ব্যবস্থাদিও করেছেন। তিনি বুঝে নিয়েছিলেন যে, আর্থিক দিক থেকে কর্পোরেশন যত বেশি স্বাবলম্বী হবে, তত বেশি ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে অসি চালনা ক্ষিপ্র হবে। ১৯৩৩ সালের ২৩ মার্চ কর্পোরেশনের সভায় লিখিত বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি লিখিত বয়ান থেকে সরে আসেন এবং এমন কিছু

কথা বলেন, যা কর্পোরেশন বনাম সরকারের পরবর্তী অর্ধশতাব্দীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে বিদ্যমান। তিনি বলেছিলেন, "আমি যদি একজন ভবিষ্যৎ বক্তা হই, আমার যদি কোন দূরদৃষ্টি থেকে থাকে, তাহলে আমি আগে থেকে একথা বলে রাখছি যে, যখন দেশে একটি গণতান্ত্রিক সরকাব আসবে বা এমন একটা সরকার আসবে যাকে আইনসভার কাছে জবাবদিহি করতে হবে, তখন এই কর্পোরেশনের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক কী আকার নিতে পারে সে কথা আমি বলে রাখছি। কারণ, তখন আইনসভা ও কর্পোরেশন এই দুটি সংস্থাই নিজেদেব জনগণের প্রতিনিধি বলে দাবি করবে। সেক্ষেত্রে আইনসভার সদস্যদেব হাতে চাবুক থাকবে যা-দিয়ে তাঁরা কর্পোরেশনকে দাবিয়ে রাখতে চাইবেন। তখন কর্পোরেশন কাউন্সিলাবদের ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে, রুখে দাঁড়াতে হবে এজন্য যাতে কর্পোরেশনকে দেওয়া আইনের ক্ষমতা ও অধিকার সরকার কেড়ে নিতে না পারে।" তাঁর মেয়র থাকাকালীন সময়ের মধ্যে কর্পোরেশনের কাজকর্মে কী কী উন্নতি হয়েছে, যেগুলি তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে বাইরের লোকদের কাছে তুলে ধবতে বিধানের যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। তিনি জোরের সঙ্গে বলতেন, কলকাতা কর্পোরেশন কংগ্রেসের একটা গর্বের জায়গা। ১৯৩২ সালের ৩১ মার্চ তিনি কর্পোরেশনের কংগ্রেস কাউন্সিলারদের বলেছিলেন "১৯২৩-২৪ সালে যখন আপনারা কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে এই কর্পোরেশনে প্রথম প্রবেশ কবেছিলেন, সেদিন থেকে আজ কর্পোবেশন কীভাবে তার পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছে।" তিনি বলেছেন "আমরা নির্মল, আমরা সঠিক একথা আমি বলছি না। কারণ, আমরা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিখছি ও সমৃদ্ধ হচ্ছি। আমার মধ্যে একটা দুর্বলতা আছে, তা হল কাজ করার উন্মাদনা। আমরা অনেক ভাল কাজ করেছি, কিন্তু অনেক কিছু করার বাকি আছে। আমার কার্যকালের বর্তমান বছরটিতে আমাদের ওইসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। আমার এই কথাগুলি আপনাদের পছন্দ হোক না হোক অথবা এটা আমার একটা দিক কিনা জানি না যে আমি কাজ করতে পেরেছি। তা যদি না পারতাম তাহলে মেয়রের চেয়ারে বসে আমি নিজেকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে বাখতাম না।" আসলে তাঁর এই কাজের নেশা ও লক্ষ্য সাধনের প্রতি আন্তরিকতা ছিল তাঁর একটা বড় সম্পদ। অনেক সময় দেখা যেত নির্দিষ্ট সংখ্যক কাউন্সিলারদের উপস্থিতি না থাকায় কোরামের অভাবে কর্পোরেশনের বৈঠক হতে পারল না। অথচ পৌরপিতারা ছেলে মানুষের মতো পৌরভবনের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! তাঁব আমলে এমন কাজ হলে তিনি ওই পৌরপিতাদের জবাবদিহি করাতেন। তাঁর মেয়র পদের মেয়াদ যখন শেষ হয়ে আসছে, তখন ইউরোপিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ক্যাম্পবেল ফরস্টার বিধানের উদ্দেশে বলেছিলেন, "তিনি যতদিন মেয়র পদে আসীন ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত কোন ব্যক্তি তাঁর কোন ত্রুটি ধরতে পারেননি।" মেয়র পদ থেকে সরে আসার পরও বহুদিন পর্যন্ত বিধান কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল

অ্যাসোসিয়েশনের কাজকর্মে সক্রিয় অংশ নিতেন। বলতে গেলে বিধানচন্দ্র রায় বহুদিন ধরে কর্পোরেশনে ক্ষমতার রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন। ফজলুল হক সাহেবের একটি চিঠি ওই উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করবে। ফজলুল হক ১৯৩৫ সালের ৫ মার্চ তারিখে কেন্দ্রীয় আইন সভা ভবন, নয়াদিল্লি থেকে বিধানকে এই চিঠিটি লেখেন—

প্রিয় ডাঃ রায়,

আমি বেশ কিছুদিন ধরেই ভাবছি আসন্ন মেয়র নির্বাচন নিয়ে আপনাকে একটা চিঠি লিখি। কিন্তু একটা ইতস্তত মনোভাব এই চিঠি লিখতে আমাকে দেরি করাল। আমার মনে হয় যে আমি দেরি করে বোকার মতো কাজ করেছি। যাহোক, আজ আপনাকে এই চিঠি লিখছি। প্রথমেই আমি নিজের কথা বলছি। আমি মনে করি যে আমার প্রতি আপনার কোন বিরূপ মনোভাব নেই। আমরা অন্তত কুড়ি বছর ধরে একে অপরের বন্ধু এবং এই সময়ের মধ্যে আমাদের এক সহমর্মিতা গড়ে উঠেছে। আমি জানি আমার প্রতি আপনার এক ভ্রাতৃপ্রতিম ভালোবাসা ও স্নেহ আছে। আপনারা একজন মুসলমানকে মেয়র করার কথা ভাবছেন ও তিনি সম্ভবত মোমেন। যদিও মোমেন আমার ব্যক্তিগত বন্ধু, তাহলেও মোমেনের প্রার্থী পদ কী কংগ্রেসের সকলে মেনে নেবেন? এমনকী, মুসলমানেরাও কী সবাই তাঁকে সমর্থন করবেন? একমাত্র আপনি যদি মোমেনকে চান, তাহলে ওকে জেতাতে পারেন। সেক্ষেত্রে আমি সানন্দে প্রার্থীপদ থেকে সরে দাঁড়াব। এরপরে রাজ্জাকের প্রশ্ন। রাজ্জাক আমার ছোট ভাইয়ের মতো। কিন্তু রাজ্জাক কী সব মুসলমানের ভোট পাবে? অবশেষে একজন হিন্দু প্রার্থীর প্রশ্ন আসছে। সেক্ষেত্রে থাকছে সন্তোষের মনোনয়ন। সন্তোষ নিশ্চিতই শক্তিশালী প্রার্থী ও তাঁর জেতার সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু সন্তোষ যাঁকে তাঁর রাজনৈতিক গুরু হিসাবে মেনে নিয়েছে তাঁর জন্য অর্থাৎ আমার জন্য কী সন্তোষ প্রার্থীপদ ছেড়ে দেবেন? গতবারের ভোটে আপনি নিশ্চিতই আমার প্রতি নির্দয় মনোভাব দেখিয়েছেন। আমার মনে হয় যে রাজনৈতিক মন কষাকষি ওটার জন্য দায়ী। এবং সেজন্যই আপনি আমার প্রার্থীপদ সমর্থন করতে পারেননি। কিন্তু এবার আমি আশা করি তার পুনরাবৃত্তি হবে না। আপনার দল যদি আমাকে সমর্থন দেয়, তাহলে মেয়র পদে আমার নির্বাচন নিশ্চিত। আমি আশা করব যে এই বিষয়টি আপনি গভীরভাবে বিবেচনা করবেন এবং আমার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেবেন। গত নির্বাচনে আমার হেনস্তা আমাকে নিদারুণ আঘাত দিয়েছে এবং এবারও আপনার কাছ থেকে আঘাত পেলে আমার শরীর ভেঙ্গে পড়বে।

গভীর শ্রদ্ধাসহ প্রীতর্থে

এ কে ফজলুল হক।

(ফজলুল হক সাহেব বেশ কয়েক বছর কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য ছিলেন)। হক সাহেবের চিঠি পেয়ে বিধান ১৩ মার্চ (১৯৩৫) তারিখে জবাব দেন হক

সাহেবকে দিল্লির ঠিকানায়। বিধানের জবাব হল এই :

প্রিয় ফজলুল হক

আপনার ৫ মার্চের চিঠি যখন আমার কাছে পৌঁছায় তখন আমি শহরের বাইরে ছিলাম। আমি আপনাকে একথা জানাচ্ছি যে, আপনার বা আপনার বন্ধুদের কারও প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নেই। এটা ঠিকই যে আমরা দুজনেই বন্ধু এবং আপনি একবার মনে করে দেখুন যে অতীতে যখনই অনুরোধ এসেছে তা আমি বন্ধুর মতোই পালন করার চেষ্টা করেছি। মেয়র নির্বাচনের ব্যাপারে এখনও কিছু ঠিক হয়নি। তবে এবছর কংগ্রেসের দুটি গোষ্ঠীর কর্পোরেশনে ও বাইরে অন্যত্র ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। যদি সেটা সম্ভব হয়, তাহলে মেয়র মনোনয়নের বিষয়টি সম্পর্কে উভয়গোষ্ঠী সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নেবে। আমি আগামী সপ্তাহে দিল্লি যাচ্ছি, তখন আপনার সঙ্গে দেখা করে এবিষয়ে আরও কথা বলব। আমি এটা বুঝতে পারছি না যে, আপনি এটা কী করে ভাবলেন যে, গত বছরে বা তার আগের বারে মেয়র নির্বাচন করার প্রশ্নে আমাব একটা 'অহমিকা' ছিল। আমি সদস্যদের কাছে কেবল আমার মতামত জানিয়েছিলাম, যদিও এটা আমি পুরোপুবি জানতাম যে, সদস্যরা নিজেরা যেটা ভাল মনে কববেন, সেটাই তাঁরা করবেন। এটা ঠিক নয় যে ওদেব উপর আমাব কোন হাত ছিল। আমি আমার সাধ্যমতো দুই গোষ্ঠীর লোকদের কাছেই আপনার কথা বলেছিলাম। আপনাকেই প্রার্থী হিসাবে মেনে নেওয়াটাই যে বাঞ্ছনীয এটা আমি আন্তরিকভাবে ওদের বুঝিয়ে বলেছি। ভেবেছিলাম ওঁবা অদূর ভবিষ্যতে একটা সিদ্ধান্ত নেবেন।

প্রীতর্থে

বি সি রায়

এ কে ফজলুক হক

অ্যাসেম্বলি চেম্বার নযাদিল্লি

৬

শিল্পস্রষ্টা বিধানচন্দ্র

বিধান ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাঁর প্রতিভা কেবল চিকিৎসাবিজ্ঞান, পুর প্রশাসন, শিক্ষায়তন পরিচালনা ও পবিষদীয় নেতৃত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এমন এমন বিষয়ে তিনি আগ্রহ দেখাতেন নিজেকে যুক্ত করতেন যেগুলি সম্পর্কে তাঁর কোন পূর্ব শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা ছিল না। এমন একটি বিষয় হল বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ। তাঁর বড় ভাই সাধন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বিলাত থেকে ফেরার পর স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার সংকল্প করেন। কিন্তু কীভাবে এগোবেন স্থির

করতে পারছিলেন না। ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে বিধান তাঁর দাদা সাধন ও পরিবারের অন্যান্যদেব সঙ্গে শিলং বেড়াতে গেলেন। শিলঙের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী তাঁর মন কেড়ে নিল। সেখানকার 'বিডন ফলস' (**Beadon Falls**) তাঁর খুব ভাল লাগল। কিন্তু শিলঙের খুব অস্বস্তিকর অবস্থা ছিল সেখানে কোন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা না থাকায়। বিধান দাদা সাধনের সঙ্গে পরামর্শ করলেন 'বিডন ফলস' এর জলস্রোত থেকে জলবিদ্যুৎ তৈরি করার বিষয়ে। তারপর জমি ইজারা নেওয়াব জন্য শিলঙের ডেপুটি কমিশনারের কাছে দরখাস্ত করলেন। ইতিমধ্যে বিধান জানতে পারলেন যে, আর দত্ত নামে এক ভদ্রলোক ওখানে জলবিদ্যুৎ কারখানা তৈরি করবেন বলে অনেক জমি ইজারা নিয়ে বসে আসেন। কিন্তু তিনি আর কিছু করতে পারছেন না। বিধান দত্ত মশাইর সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। এদিকে শিলঙের ইংরেজ ডেপুটি কমিশনার ক্যাপ্টেন মোরো নামে একজন ইংরেজকে ওখানকার জমি নতুন করে ইজারা দেওয়ার তোড়জোড় আরম্ভ করলেন। ফলে ব্যাপারটা জটিল হয়ে পডল এবং শেষপর্যন্ত পুরো বিষয়টি ভারত সরকারের কাছ চলে গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিধান ও সাধনের প্রোজেক্ট রিপোর্টই ভারত সরকারের অনুমোদন পেল। বিধান তাঁর নিজের কথায় বলছেন "জমি ইজারা এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের লাইসেন্স পাওয়ায় আমার মধ্যে এমন একটা দৃঢ় সংকল্প জন্মাল যে, একটি ভারতীয় বলতে গেলে একটি বাঙ্গালি কোম্পানি নিজেদের শক্তিতে এসব কাজ করতে পারে, তা ইংরেজদের দেখিয়ে দিতে হবে। কারখানা তৈরির সময় যখন তখন নানারকম অসুবিধা দেখা দিতে লাগল। আমি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার নই. বিদ্যুৎ বিশেষজ্ঞ নই, তবু আমাকেই বেশির ভাগ সময় শিলং ছুটে যেতে হতো। নির্মাণকার্যের কাছে হাজির থেকে অসুবিধাগুলির ফয়সালা আমাকেই করতে হতো।" অবশেষে ১৯২২ সালে ওখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন আরম্ভ হল। লাইসেন্স পাওয়ার সময় ধরে ১৮ মাসের রেকর্ড সময়ের মধ্যে শিলংবাসীরা বিদ্যুতের আলোর মুখ দেখতে পেল। ১৯২২ সাল থেকে দীর্ঘ ৩২ বছর ধরে এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কাজ করেছে। স্বাধীনতার পর রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা পর্যন্ত ওই বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাই চালু ছিল। সাধন ও বিধান রায়ের এই কোম্পানি শিলং ও গৌহাটির লোকদের কাছে পরিচিত ছিল শিলং গৌহাটি ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি নামে। পরবর্তীকালে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি যখন নতুন নতুন শিল্পকারখানা ও বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেন, তখন অনেকেই বিস্মিত হয়েছিল শিল্পকারখানা স্থাপনে ও সেগুলির পরিচালনায় তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধি থেকে। শিলং জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ও তার পরিচালনায় তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, তা তাঁর পরবর্তী শিল্পভাবনার দিশারী হিসাবে কাজ করেছে। তাঁর নিজের কথায় "ওই শিল্প পরিচালনার মধ্য দিয়ে আমি বুঝতে পেয়েছি যে, কোন

শিল্প মালিকের কারখানা খুব লাভজনক হলেও শিল্প মালিক কেন তাঁর অংশীদারদের বেশি লভ্যাংশ না দেন। লভ্যাংশ দেওয়ার অনুপাত যেন ৬ থেকে ৭ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে অংশীদারদের ক্ষেত্রে ওই নীতি অনুসরণ করে অংশীদারদের লভ্যাংশ দেওয়ার সীমা ৬/৭ শতাংশের মধ্যে রেখেছি। লভ্যাংশের বাকি অর্থ খরচ করেছি শিল্পের উন্নয়নে, সম্প্রসারণে, কর্মীদের মজুরিবৃদ্ধিতে ও ভোক্তাগ্রহীতাদের মাশুল কমিয়ে। আমাদের কোম্পানিতে যে কর্মী ১৯২২ সালে মাসে ৩০ টাকা মাইনে পেয়েছে। পরবর্তী বছরগুলিতে তার মাইনে বেড়েছে তিনগুণ। একেবারে নীচের দিকের কর্মীও ৬০ টাকার নীচে মাইনে পায় না। এছাড়া বিদ্যুতের মাশুল কমিয়ে দেওযা হয়েছে। একটি শিল্প চালাতে গেলে জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কী কী করা উচিত, সে বিষয়ে আমার আত্মবিশ্বাস জন্মেছে এভাবেই। আমি তখন থেকেই ভাবতে আরম্ভ করেছি যে, সারা বিশ্বই একটা বড় শিল্পকাবখানা যেখানে আমরা সবাই পরিশ্রম করি ও জীবনযুদ্ধ চালাই। এভাবেই আমরা একদিকে আমাদের কাজের দক্ষতা বাড়াই এবং আর একদিকে শ্রমের বিনিময়ে বেশি লাভ পেতে চাই।" কোম্পানি পরিচালনার ক্ষেত্রে কত যুগ আগে তিনি ওই কথাগুলি বলেছিলেন যা কত যুগ পরে বহু মালিকানার শিল্পসংস্থা পরিচালনার ব্যাপাবে সমান প্রযোজ্য।

'এয়ারওয়েজ ইন্ডিয়া' নামে এক বিমান পরিবহন সংস্থা স্থাপন করে, বিধান তাঁর ব্যবসায়িক বৈচিত্র্য ও ক্ষিপ্র সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মুসলিম লিগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে' সশস্ত্র মুসলিম লীগ গুণ্ডারা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে তাঁর বাড়ি আক্রমণ কবল। বিধান তখন শিলঙে। খবর পেয়ে তাঁর গৌহাটি হয়ে কলকাতা পৌঁছতে তিনদিন সময় লাগল। প্রথম, তিনি গৌহাটি থেকে মিটার গেজ লাইনের ট্রেনে পার্বতীপুরে এসে নামলেন। সেখানে গাড়ি বদল করে ব্রডগেজ লাইনের ট্রেনে করে শিয়ালদা আসতে হবে। কিন্তু পার্বতীপুর থেকে শিয়ালদার গাড়িতে বার্থ পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ল। পুরো ট্রেনটাই মিলিটারি লোকেরা দখল করে ফেলেছে। এই ঘটনাটি তাঁকে গৌহাটি ও কলকাতার মধ্যে একটি বিমান সার্ভিস চালু করার প্রেরণা দিল। কলকাতা পৌঁছেই তিনি এক কোম্পানি গড়তে উদ্যোগী হলেন। এই ঘটনার এক বছর পরে দেশবিভাগ ও আসামের সঙ্গে কলকাতার সরাসরি রেল সংযোগ ছিন্ন হওয়ায় তাঁর ওই উদ্যোগ দ্রুত বাস্তবায়িত হল। এই কাজের জন্য তিনি তাঁর এক সম্পর্কিত ভাইপো কে কে রায়কে বেছে নিলেন। ১৯৪৫ সালের শেষদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভারতীয় বিমান বাহিনী ডাকোটা বিমানগুলি বেচতে আরম্ভ করল। এয়ারওয়েজ ইন্ডিয়া বেশ কয়েকটি ডাকোটা বিমান কিনে নিল। আরম্ভ হল কলকাতা ও গৌহাটির মধ্যে বিমান সার্ভিস। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় হলেন এয়ারওয়েজ ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম চেয়ারম্যান এবং কে কে রায় ম্যানেজিং ডিরেক্টর। বিধান মুখ্যমন্ত্রী হিসাবেও

আমৃত্যু এই কোম্পানির অবৈতনিক চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৫৩ সালে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স গঠনের মধ্য দিয়ে বিমান চলাচল ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করা হলেও এয়ারওয়েজ ইন্ডিয়া ৬০ এর যুগের শেষ অবধি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা শহর এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বহু অঞ্চলের সঙ্গে অল্প ভাড়ায় বিমান সার্ভিস চালু রেখেছিল। এই এয়ারওয়েজ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে দমদমে এয়ারটেকনিক্যাল স্কুল স্থাপিত হয়েছিল, যেখান থেকে বহু বাঙ্গালি যুবক বিমান মেরামতির কাজ শিখতে পেরেছে। তিনি আরও কয়েকটি বেসরকারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যেমন হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানির চেয়ারম্যান ছিলেন। দীর্ঘদিন তাঁর বন্ধু ও পরবর্তীকালে তাঁর সহকর্মী নলিনীরঞ্জন সরকার ওই ইন্সিওরেন্স কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। তাঁরই প্রেরণায় গড়ে ওঠে বাঙ্গালির আর একটি বড় ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা 'দে'জ মেডিকেল'। তিনি এই প্রতিষ্ঠানেরও চেয়ারম্যান ছিলেন। এটা অনেকেরই অজানা যে তিনি একদা সংবাদ জগতেও প্রবেশ করেছিলেন। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ভারতে সংবাদ সরবরাহ ব্যবস্থা (নিউজ এজেন্সি) পুরো ইংরেজদের দখলে ছিল 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস' (এ পি) ও 'রয়টার' নামে। জাতীয় আন্দোলন, বিশেষ করে বিপ্লবীদের সংবাদ ওই দুটি সংস্থা খুব কমই পরিবেশন করতো। ফলে ১৯৩৩ সালে জাতীয় স্বার্থে একটি সংবাদ সরবরাহ সংস্থা গড়ে তুললেন বিধুভূষণ সেনগুপ্ত। এই সংবাদ সংস্থা বা নিউজ এজেন্সির নাম ছিল 'ইউনাইটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া' (ইউ পি আই)। বিধান এই সংবাদ সংস্থার প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৪৮ সালে বাঙালির এই প্রতিষ্ঠানটি আর্থিক কারণে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থার কাছে দেনার দায়ে বন্ধ হয়ে গেল। বহু সাংবাদিক ও টেকনিক্যাল কর্মী বেকার হয়ে পড়লেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বিধান সরকারি প্রচার বিভাগে ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অনেক সাংবাদিককে চাকুরির ব্যবস্থা করে দিলেন। অবশেষে তাঁরই চেষ্টায় ভারত সরকার ইউ পি আই-র সকল দেনা মকুব করলেন। গোড়ায় বিধান রায় 'ইউনাইটেড নিউজ অব ইন্ডিয়া' (ইউ এন আই) নাম দিয়ে পুরানো প্রতিষ্ঠানকে পুনরুজ্জীবিত করে দিলেন। কিন্তু পুরানো মালিককে বিধান নতুন সংস্থায় ফিরে আসতে দেননি।

মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবাংলার জন্য যে শিল্প স্বপ্ন দেখতেন তার ভিত তৈরি হয়েছিল শিলং জল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি প্রায়শই বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমাকে 'বাংলার রূঢ়' অঞ্চল বলতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ও যুদ্ধের সময় ইউরোপের সবচেয়ে শিল্পসমৃদ্ধ এলাকা ছিল জার্মানির রূঢ় অঞ্চল। বিধান পশ্চিমবাংলার জন্য সেই স্বপ্ন দেখতেন। চিত্তরঞ্জনে রেল ইঞ্জিন নির্মাণ কারখানা, রূপনারায়ণপুরে হিন্দুস্থান কেবলস, দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট, দুর্গাপুর কেমিকেলস, দুর্গাপুর প্রোজেক্টস, দুর্গাপুর অ্যালয় স্টিল, মাইনিং এন্ড অ্যালায়েড ম্যানুফ্যাকচারিং কর্পোরেশন এবং বহু বেসরকারি সহায়ক

শিল্প গড়ে তুলেছিলেন বা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সরকারি সংস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন একজন পথিকৃৎ। তিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড, ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন নর্থ বেঙ্গ ল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন, হরিণঘাটা ডেয়ারি, কল্যাণী স্পিনিং মিল গড়ে তুলেছিলেন। বেসরকারি ক্ষেত্রে হিন্দুস্থান মোটরস, ইম্পিরিয়াল কেমিকেল ইন্ড্রাস্ট্রিজ, অ্যালবার্ট ডেভিড, বেঙ্গল কেমিকেল, গ্লুকোনেট, বেঙ্গল ইমিউনিটির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। দে'জ মেডিকেলের প্রতিষ্ঠাতা দে ভ্রাতৃদ্বয় কলকাতা শহরে একটি কেমিস্ট ও ড্রাগিস্ট ব্যবসা গড়ে তোলার জন্য ১৯৪১ সালে বিধান রায়ের কাছে যান। সে সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তুঙ্গে এবং জাপানি বোমার ভয়ে কলকাতা থেকে লোকেরা পালিয়ে যাচ্ছে। তিনি ওই দুই ভাইকে বললেন, 'কলকাতা শহর থেকে লোকজন পালাচ্ছে। তোমরা কাদের জন্য ওষুধ পত্র তৈরি করবে?' ভূপেন দে জবাব দিলেছিলেন, 'স্যার বোমা পড়লে তো আরও বেশি করে ওষুধ পত্র লাগবে।' তাঁর কাছে কোন বাঙালি শিল্পোদ্যোগী কোন প্রকার সাহায্য চাইলে তিনি তাঁকে সাহায্য করার চেষ্টা করতেন আপ্রাণভাবে। আর একজন মহাপুরুষ বাঙালি যিনি বাঙালিকে ব্যবসার স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিলেন, সেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিকেল যখন রুগ্ণ হতে আরম্ভ করল ১৯৫৯-৬০ সালে, মুখ্যমন্ত্রী বিধান তাঁর শেষ জীবনে ওই প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিযে রেখেছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রই যে বাংলার রাসায়নিক শিল্পকে ভারতের মানচিত্রে প্রথম সারিতে এলে দিয়েছিলেন, একথা বিধান বারংবার উল্লেখ করতেন। ভারতের সব বড় শিল্পপতিরা বিধানকে তাঁদের বন্ধু ও পরামর্শদাতা বলে গণ্য করতেন। ওই শিল্পপতিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, জি ডি বিড়লা, জে আব ডি টাটা, স্যার জাহাঙ্গির গান্ধী, স্যার বীরেন মুখার্জি, স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা, কে পি গোযেঙ্কা, আনন্দীলাল পোদ্দার, বদ্রি পোদ্দার, সুরেশচন্দ্র রায়, জি এল মেহতা, রামস্বামী মুদালিয়ার, লক্ষ্মণ স্বামী মুদালিয়ার, ও বি এম বিড়লা। আমৃত্যু ওইসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের সঙ্গে তাঁর নিবিড় বন্ধন অটুট ছিল।

৭

সাংবাদিক বিধান

জাতীয় সংবাদ সংগ্রহ ও তার প্রচার ও পরিবেশনে ইউ-পি-আই নামে নিউজ এজেন্সি স্থাপনে বিধানের উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আগে করেছি। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সংবাদপত্র সেবা ও সংবাদপত্র ব্যবসার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ১৯২২ সাল থেকে। ১৯২২ সালে দেশবন্ধু 'ফরোয়ার্ড' (Forward) নামে একটি ইংরাজি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন। ওই একই সময়ে এই পত্রিকার

বাংলা সহায়ক হিসাবে প্রকাশিত হতে থাকে 'বঙ্গবাসী' ও 'আত্মশক্তি'। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই প্রকাশনাগুলির পরিচালনা এবং এগুলির আর্থিক দায়-দায়িত্বের তদারকি করতে বিধানকে অনুরোধ করেন। বিধান দেশবন্ধুর অনুরোধে রাজি হলে তিনি বিধানকে 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার জেনারেল ম্যানেজারের দায়িত্ব দেন। কিন্তু ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর অকালমৃত্যু এই পত্রিকাগুলির উপর সুকঠিন আঘাত হানে। কংগ্রেসের দুটি গোষ্ঠী ও সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব এদের উপর পড়তে আরম্ভ করে। ইতিমধ্যে বঙ্গ রাজনীতিতে 'পঞ্চপ্রধান' (Big Five) গোষ্ঠী জন্ম নিয়েছে। অন্যান্যরা যে যার প্রভাবের জায়গা খুঁজতে ব্যস্ত। কিন্তু পত্রিকাগুলির পরিচালনার ব্যয়ভার ও আয়ের মধ্যে যে ফাবাক তা পূরণ করার পুরো দায়িত্ব বর্তাল বিধানেব উপর। এদিকে আইনঘটিত কারণে 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার খোল নলচে নিয়েই নতুন পত্রিকা 'লিবার্টি' (Liberty) ওই শূন্যস্থান পূরণ করল শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে। কিন্তু শরৎ বসুর আকস্মিক গ্রেফতার ও অন্তবীণ অবস্থা এই নতুন পত্রিকাকে এক প্রচণ্ড ধাক্কা দিল। শেষ পর্যন্ত হাল ধরতে হল বিধানচন্দ্র রায়কে। আর্থিক দায় ও সম্পাদনার পুরো দায়িত্ব নিযে বিধান 'লিবার্টি' পত্রিকার চেয়ারম্যান হলেন ১৯৩৪ সালে। তিনি 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার নাম (Good will) কিনে নিলেন এবং 'নিউ ফরোয়ার্ড' পত্রিকা বের কবলেন। এই পত্রিকার সাংবাদিকেবা ভাবতীয় সাংবাদিকতার মূল আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রেখে একদিকে কংগ্রেসের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী ও অন্যদিকে সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে লাগলেন। মধ্য ত্রিশের যুগে বাংলায় কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা একটা বড ধাক্কা খেল। এর দুটি প্রধান কারণ হল, র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতি কংগ্রেসের দোদুল্যমান সমর্থন এবং আম্বেদকরের সঙ্গে গান্ধীজিব পুণা চুক্তি। ওই সময় কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃত্বের নির্দেশে 'লিবার্টি' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দিতে হল। বিধান সাধারণত 'নিউ ফরোয়ার্ড' পত্রিকার সম্পাদকের স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করতেন না। কিন্তু ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একটি প্রস্তাবকে সমর্থন করার প্রশ্নে বিধানচন্দ্র রায়কে সুভাষচন্দ্র বসুর একটি অভিযোগের জবাব দিতে হয়েছিল। ১৯৩৪ সালের ২১ মার্চ সুভাষচন্দ্র বসু বিধানকে একটি চিঠিতে এই অভিযোগ করলেন যে, 'লিবার্টি' ও 'নিউ ফরোযার্ড' তার সম্বন্ধে কয়েকটি সংবাদ না ছাপিয়ে চেপে দিয়েছে। ৩০ মার্চ (১৯৩৪) বিধান সুভাষচন্দ্রকে জবাবে একথা লিখলেন "ফরোয়ার্ড এর বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছি। কারণ এই পত্রিকাটির সঙ্গে আপনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন সুতরাং ফরোয়ার্ড-এর কোন অপমানকর মন্তব্যে আপনি নিশ্চয়ই আঘাত পাবেন।" তিনি সুভাষচন্দ্রকে একথাও জানালেন যে, তিনি নিজে এবং তুলসী গোস্বামী, বিধানের দাদা সহ পত্রিকার অন্যান্য ডিরেক্টরেরা সম্মিলিতভাবে পত্রিকাটির নীতি নির্ধারণ ও দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তিনি

সর্বদাই চাইতেন ভারত সম্বন্ধে যেন প্রকৃত তথ্য বিশ্বে প্রচারিত হয়। এর জন্য তিনি ভারতীয় জাতীয় সংবাদপত্রগুলির এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সংবাদপত্রের মালিকদের নিয়ে একটি 'নিউজপেপারস প্রোপ্রাইটারস অ্যাসোসিয়েশন' গঠনের উদ্যোগ নেন। কারণ তিনি মনে করতেন যে, ওরকম একটি সংগঠনই দেশের মধ্যে ও দেশের বাইরের সংবাদ পরিবেশনের নিযুক্ত নিউজ এজেন্সিগুলির দায়িত্ব নিতে পারে। তাঁর এই চিন্তার পরিণতি হল সংবাদপত্র মালিকদের সংগঠন 'ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজপেপার্স সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা। এই সংগঠনই পরবর্তীকালে ইউ পি আই এবং পি টি আই, এই দুটি জাতীয় নিউজ এজেন্সি পরিচালনার দায়িত্বে ছিল। বিধান যখন সংবাদপত্র ব্যবসা সম্পর্কে এসব চিন্তা-ভাবনা করছিলেন সে সময় ১৯৩৩ সালের ২ অক্টোবর বিধানকে লেখা শিল্পপতি জি ডি বিড়লার চিঠিটি বিশেষ অর্থবহ। চিঠিটি ছিল ইউ-পি-আই প্রতিষ্ঠার বিষয় নিয়ে। জি ডি বিড়লা বিধানকে লিখলেন "এই নিউজ এজেন্সিটি চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে যদি সংস্থাটির ব্যবসা একেবারে আর্থিক বণিকদের উপর গড়ে তোলা যায়। আমি বুঝতে পারছি যে, এই সদ্যোজাত শিশুর প্রতি আপনার আগ্রহ খুবই গভীর এবং আমি এটা সবসময় অনুভব করি যে একটি জাতীয় নিউজ সার্ভিস খুবই দরকার। আমি আশা করব 'ফবোযার্ড'র চেয়ে এই নিউজ এজেন্সির প্রতি আপনাকে অনেক বেশি মনোযোগ দিতে হবে। এটা মনে বাখবেন যে, 'ফরোয়ার্ড' এর চেয়ে একটি নিউজ এজেন্সির গুরুত্ব অনেক বেশি।" একটি জাতীয় নিউজ এজেন্সি স্থাপনের ব্যাপারে সাহায্য ও সহযোগিতা চেয়ে তিনি ভারতীয় সংবাদপত্র জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জ যথা মাদ্রাজের 'হিন্দু' (Hindu) পত্রিকার রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, 'বম্বে ক্রনিকল' (Bombay Chornicle)-এর এস এ ব্রেলভি, এলাহাবাদের 'লিডার' (Leader) পত্রিকাব স্যার কাউসজি জাহাঙ্গির এবং 'হিন্দুস্থান টাইমস' এর (Hindusthan Times) প্রতিষ্ঠাতা জি ডি বিড়লাদের যে সব চিঠি লিখেছিলেন সেই পত্রাবলী তাঁর চিন্তার এক নতুন দিগন্তকে উদঘাটিত করে। ১৯৩৪ সালের ১ মার্চ তিনি তাঁর বাড়িতে কয়েকজন সংবাদপত্র সম্পাদকের এক সভার আয়োজন করেন। এই সভায় উপস্থিত সম্পাদক ও পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র তুষারকান্তি ঘোষ, 'মাদ্রাজ মেল' এর হিউজেস, 'স্টার অব ইন্ডিয়া'র স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন। তিনি সংবাদপত্র মালিকদের একটি সমিতি গঠন করার বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি খববেব কাগজ চালাতে গিয়ে নিজের তহবিল থেকে মাসের পর মাস কাগজ চালাবার খরচ বহন করেছেন। সাংবাদিক ও অসাংবাদিক কর্মচারীদের মাইনে দিয়েছেন ঐভাবে। 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার পরিচালক হিসাবে তিনি কাগজের জন্য বিদগ্ধ লোকদের কাছে লেখা চাইতেন। কখনও বা ওসব লেখা সংগ্রহ করে আনতেন। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে বিধান সাংবাদিক হিসাবে বালগঙ্গাধর তিলক, মতিলাল নেহরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও অরবিন্দ ঘোষদের সমগোত্রীয় ছিলেন। সাংবাদিকতার ইতিহাসে তাঁর

শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব ইউনাইটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া'র (ইউ পি আই) প্রতিষ্ঠা। ১৯৩৩ সালের আগস্ট মাসে বিধুভূষণ সেনগুপ্ত বোম্বাই'র 'ফ্রি প্রেস জার্নাল' (Free Press Journal)-এর এস সদানন্দের সঙ্গে মতবিরোধের দরুন ওই প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিধানের সঙ্গে দেখা করে একটি জাতীয় নিউজ এজেন্সি গঠন করার প্রস্তাব দেন। জাতীয় সংবাদপত্রগুলোর জন্য তখন জাতীয় নিউজ এজেন্সির প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। বিধুবাবুর প্রস্তাবে বিধান তৎক্ষণাৎ রাজি হলেন। অর্থ ও অন্যান্য সহযোগিতার জন্য তিনি কলকাতার বাংলা ও ইংরাজি ভাষার জাতীয় সংবাদপত্রগুলির মালিক ও সম্পাদকদের এক বৈঠকে মিলিত হলেন। উপস্থিত সকলেই বিধান রায়ের উদ্যোগকে সমর্থন জানালেন। ইউ-পি-আই'র জন্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রাযের সভাপতিত্বে ডিরেক্টর বোর্ড গঠিত হল। বিধুভূষণ সেনগুপ্ত হলেন ইউ-পি-আই'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও ম্যানেজিং এডিটর। বিধান কিন্তু নিজেকে ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যানের মধ্যে আবদ্ধ রেখেই ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি ডিরেক্টর বোর্ডের প্রতি সভায় যোগ দিতেন। তহবিল যোগানে সাহায্য করতেন। নিউজ এজেন্সির সার্ভিস সম্প্রসারণ। খববের কাগজগুলি থেকে ঠিক ঠিক সার্ভিস চার্জ আদায় ও তার হিসাব নিকাশ তিনি তদারকি করতেন। সাংবাদিক ও অসাংবাদিক কর্মীদের জন্য সার্ভিস রুলসের খসড়া পর্যন্ত তিনি তৈরি করে দেন। দেশের পরবর্তী প্রজন্মগুলিতে সাংবাদিকতা যাতে একটি জীবিকা হিসাবে গড়ে উঠে তার জন্য এই বাংলায় তিনি প্রথম পথিকৃৎ। ওই সময় কলকাতায় ভারতীয় সংবাদপত্র সেবী সংঘ (Indian Journalists Association) একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার অনুরোধ জানায়। বিধান সেনেট সদস্য হিসাবে ওই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। এর পরপরই বিধান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার হলেন। ভাইস চ্যান্সেলার হিসাবে তাঁর প্রথম কাজগুলির একটি ছিল সাংবাদিকতা বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তনের প্রস্তাব সেনেট ও সিন্ডিকেটকে দিয়ে অনুমোদন করানো। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং সর্বশেষে দেশবিভাগের জন্য ওই প্রস্তাব কার্যকর হতে প্রায় পনেরো বছর সময় লেগেছিল। তিনি যখন মুখ্যমন্ত্রী, তখন ১৯৫১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকতা বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স চালু করল। খুব সঙ্গত কারণেই বিধান ওই কোর্সের উদ্বোধন করেছিলেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "মনে রাখবেন যে আমাদের দেশ এক দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আমার প্রধানমন্ত্রী মাঝে মাঝে একথা বলে থাকেন যে, এসব পরিবর্তনের গতি বেশ তীব্র। আজ যা ঘটছে, আগামীকাল তার কোন মূল্য থাকছে না। এমনকী, আজ যা যথার্থ বলে মনে হচ্ছে, কাল তা একেবারেই সেকেলে হয়ে যাচ্ছে। যখনই কোন সংবাদ বা সমস্যা আপনাদের কাছে আসবে, তখন সাংবাদিকদের ওই সংবাদ ও সমস্যা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা

ভাবতে হবে এবং এভাবেই জনসাধারণের সেবা করা সাংবাদিকদের অপরিহার্য কর্তব্য হওয়া উচিত। এটাই হল সাংবাদিকদের স্বাধীনতা। সাংবাদিকদের চিন্তার স্বাধীনতা অবশ্যই থাকতে হবে, সেখানে যেন রাজনৈতিক বিবেচনা ও মতাদর্শ বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। যদি কোন ঘটনার বিষয়বস্তু কোন সাংবাদিককে নিসংশয় করে, তাহলে তার মধ্য দিয়ে সাংবাদিকেরা নিজেদের মতাদর্শ ও অনুভূতি প্রচার করতে পারেন। কিন্তু ঘটনা লেখার সময় সাংবাদিক যদি রাজনৈতিক বিবেচনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন, কিংবা গড্ডলিকা স্রোতে ভেসে যান অথবা কাগজের বিক্রি বাড়ানোর জন্য লেখেন, তাহলে তাঁর স্বাধীনতা কিন্তু সেখানেই অপহৃত হয়ে যায়। সুতরাং ওরকম অবস্থা যাতে না আসে, সেজন্য প্রতিটি সাংবাদিককে মুক্ত মনে লেখার লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার লড়াই চালাতে হবে।" তিন তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সাংবাদিক ও সাংবাদিকতা জীবিকার প্রতি তাঁর আগ্রহ অম্লান রেখেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি বহু সাংবাদিকদের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি সংবাদিকদের জন্য রাইটার্স বিল্ডিং-এ 'প্রেস কর্নার' (Press Corner) স্থাপন করে দিয়েছিলেন তাঁরই ঘরের কাছে ও তাঁর যাতায়াতের পথে। ভারতের রাজ্যগুলির সেক্রেটরিয়েটে তিনিই প্রথম সাংবাদিকদের জন্য এই সুবিধার প্রবর্তন করেন। তাঁর মৃত্যুর তেরো বছর পর মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সুযোগে কলকাতার সাং ; ওই স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছিলেন প্রায় দেড় বছর। তারপব ১৯৯৩ সালে তখনকার সরকার পুলিশ দিযে ওই 'প্রেস কর্নারে' সাংবাদিকদের উপর হামলা চালান। পরিণতিতে "মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার" স্বার্থে ওই 'প্রেস কর্নার' বন্ধ করে দেওযা হয়।

৮

অবিভক্ত ভারতে কংগ্রেসের অনিচ্ছুক নেতা : সংশয়ের দোলায় বিধান (১৯৩০-৪০)

বিধান-উত্তর বাঙালি প্রজন্মগুলির বিশেষ করে গবেষকদের কাছে এটা চিরদিনের রহস্য হয়ে থাকবে যে কখন ও কোন্ সালে বিধান কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন এবং তিনি আদৌ কংগ্রেসের সদস্যপদ নিয়েছিলেন কি না। কলকাতায় ছাত্রাবস্থায় ও পরবর্তীকালে ডাক্তার হিসাবে বিধান আগাগোড়া জাতীয়তাবাদী ছিলেন। আমরা আগেই বলেছি তিনি কীভাবে বঙ্গীয় আইন পরিষদের নির্বাচনে বারাকপুর কেন্দ্রে স্বরাজ্যদলের সমর্থিত নির্দল প্রার্থী মনোনীত হয়েছিলেন (১৯২২) এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর আইন পরিষদে স্বরাজ্য কংগ্রেস দলের সহকারী নেতা

হয়েছিলেন। দেশবন্ধু বিধানকে সামাজিকভাবেও ডাক্তার হিসাবেই চিনতেন এবং এটা বলাই যেতে পারে যে দেশবন্ধুই সক্রিয়ভাবে এবং কতকটা পার্ট টাইম রাজনীতিতে টেনে এনেছিলেন। ১৯২০ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে বিধান একজন দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ওই অধিবেশনেই মহাত্মা গান্ধী যখন তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব পেশ করলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তার বিরোধিতা করে যে বক্তৃতা করেছিলেন, তা শুনে বিধান চমৎকৃত হন। এরপর ১৯২২ সালে দেশবন্ধু নাগপুর কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে গান্ধী আদর্শের ও গান্ধীজির ব্যক্তিত্বের কাছে আত্মনিবেদন করে কলকাতায় ফিরে এসে যেভাবে তাঁব বিপুল অর্থের যোগানদারি আইন ব্যবসা ত্যাগ করলেন, তাতে বিধান আরও চমৎকৃত হলেন। একদা কলকাতার বিলাস ব্যসনের ও বিলিতি মদ্য পানেব কিংবদন্তি পুরুষ চিত্তরঞ্জন দাশ এক নিমেষে সবকিছু বর্জন করে 'দীনের হতে দীনের' কাছে যেভাবে চলে এলেন, তাতে বিধানের বিস্ময়ের সীমা রইল না। দেশবন্ধুর চরিত্রের এই দৃঢ়তাই বিধানকে দেশবন্ধুর খুবই কাছে টেনে আনল। কিন্তু তাই বলে তিনি বিবেকবোধের প্রয়োজনে দেশবন্ধুর কোন কোন প্রস্তাবকে খারিজ করতে দ্বিধা কবেননি। বঙ্গীয় আইন পরিষদেব নির্বাচনে (কাউন্সিল এন্ট্রি) স্বরাজ্য কংগ্রেস দলের সমর্থনের শর্ত হিসাবে দেশবন্ধু যখন বিধানকে কংগ্রেসের শপথপত্রে সই করতে বললেন তখন বিধান তা দৃঢতার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বহু বছর পরে তিনি তার ওই প্রত্যাখ্যানের কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, "আমি এই কথা মেনে নিতে রাজি নই যে, কংগ্রেসে কোন পদ না পেলে তাঁর পক্ষে দেশসেবা করা সম্ভব নয়।" দেশবন্ধু তাঁর মৃত্যুর বছর দুয়েক আগে থেকে বহু ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক ব্যাপারে বিধানের উপব বিশেষ নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিলেন। দেশবন্ধুর আমলে কংগ্রেসের 'গ্রাম পুনর্গঠন পর্ষদ' নামে একটি শাখা ছিল। এ কাজের জন্য দেশবন্ধু কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি গ্রাম বাংলার কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য পর্ষদের সমুদয় অর্থ বিধানের হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে ওই পর্ষদের ট্রাস্টি করে দেন। এছাড়া পারিবারিক জীবনে বিধান ছিলেন দেশবন্ধুর একমাত্র চিকিৎসক পরামর্শদাতা। দেশবন্ধুর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বিধানের প্রতি তাঁর নির্ভরশীলতা আরও বেড়ে গেল। ১৯২৫ সালের জানুয়ারিতে তাঁর স্বাস্থ্য এত খারাপ হয়ে পডল যে তিনি বাড়ির বাইরে গেলেই যে কোন সময়ে এক নিদারুণ ঘটনাব আশঙ্কা ঘুরতে লাগল সকলের মনে। অথচ ওই সময় তাঁর আইন পরিষদে যাওয়া একান্ত দরকার। তখন বঙ্গীয় আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশন চলছিল। বাজেটে মন্ত্রিদের বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ ছিল। তিনি চাইলেন পরিষদকক্ষে বিধান সর্বক্ষণ তাঁর পাশে থাকবেন। নির্দিষ্ট দিনে বিধান হুইল চেয়ার ঠেলে দেশবন্ধুকে পরিষদে নিয়ে এলেন। দেশবন্ধু বিরোধী দলের নেতা হিসাবে মন্ত্রিদের বেতন বৃদ্ধির বিরোধিতায় এক আবেগময় ও জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে পরিষদকে এমনভাবে প্রভাবিত করলেন যে, মন্ত্রিদের বেতন বৃদ্ধির বাজেট প্রস্তাব

ভোটাভুটিতে খারিজ হয়ে গেল। বঙ্গীয় আইন পরিষদে বিরোধী দলের বিজয় পতাকা উড্ডীন করে দেশবন্ধুকে আবার হুইল চেয়ারে করে বাড়ি ফিরিয়ে আনলেন বিধান। বিধান তাঁর এতখানি বিশ্বাসের জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন যে, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সাংবিধানিক কাঠামো কী হবে, তা নিয়ে লর্ড বার্কেনহেডেব (বৃটিশ মন্ত্রিসভার ভারতসচিব) সঙ্গে দেশবন্ধু তাঁর গোপন পত্রালাপেব বিষয় বিধানকে জানিয়ে রেখেছিলেন। দেশবন্ধু ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধানের সে খসড়া লর্ড বার্কেনহেডকে পাঠিয়েছিলেন তা অনুমোদিত হলে ভারত সরকারেব মন্ত্রী হিসাবে তিনি বিধানের নাম সুপারিশ করেছিলেন বার্কেনহেডের কাছে। দেশের ভবিষ্যৎ সংবিধান নিয়ে যে রূপরেখা দেশবন্ধু এঁকেছিলেন, তা তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনেব ফরিদপুর অধিবেশনে ব্যাখ্যা করেছিলেন মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতিতে—গান্ধীজি ওই অধিবেশনের উদ্বোধন কবেছিলেন। লর্ড বার্কেনহেডের সঙ্গে দেশবন্ধুর পত্রালাপের মূল ভিত্তি ছিল কিন্তু তাঁর ১৯২৩ সালের সেই ঐতিহাসিক বঙ্গীয় চুক্তি বা Bengal Pact। ১৯২৫ সালের ১৬ জুন দার্জিলিঙে তাঁর অকালমৃত্যু না ঘটলে দেশবন্ধুব Bengal Pact হিন্দু মুসলিম অনৈক্যকে সমূলে উৎপাটিত কবে ইতিহাসের গতিকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করত। দেশবন্ধুর মৃত্যুব ৩২ বছর পব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর স্মৃতিকথা Indian wins Freedom গ্রন্থে দেশবন্ধুর Bengal Pactকে হিন্দু মুসলিম মিলনেব সেতুবন্ধ বলে উল্লেখ কবেছেন। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে ১৯২২ সালে গযা কংগ্রেসে দেশবন্ধু পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে মৌলানা আজাদের নাম প্রস্তাব করে গিযেছিলেন।

১৯২৫ সালেব ১৬ জুন দেশবন্ধু যখন দার্জিলিঙে মাবা গেলেন, বিধান ওই দিনটিতে শিলং ছিলেন। বিধান খবর পেয়েই কলকাতা ফিবে এলেন। তখন পর্যন্ত দেশবন্ধুর দেহ কলকাতায় পৌঁছায়নি। ওই সময় মহাত্মা গান্ধী তাঁব পূর্ববঙ্গ সফরের শেষ পর্যাযে খুলনা শহবে এসেছেন। স্থানীয় মিউনিসিপাল পার্কে বিকালে গান্ধীজি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য মঞ্চে এসে বসেছেন। এমন সময়ে ডাক বিভাগের একজন কর্মচারী সেখানে এসে গান্ধীজির হাতে তুলে দিলেন একটি টেলিগ্রাম—দেশবন্ধুব চির বিদায়ের সংবাদ। খুলনা শহরের ওই সভা দেশবন্ধুর শোকসভায় পরিণত হল। গান্ধাজি তাঁর সফর সূচি বাতিল করে কলকাতায় ফিবে এলেন। সুভাষচন্দ্র তখন সুদূর মান্দালয়ে কাবারুদ্ধ। দেশবন্ধুর দেহ তখনও শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছায়নি। বিধান বাসন্তীদেবীর কাছে গেলেন সেই ঘরে যেখানে দেশবন্ধুর সাথে তাঁর প্রথম আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎ হযেছিল। এর আগে বিধান দেশবন্ধুকে প্রথম দেখেন কাশিমবাজার মহারাজার বাড়িতে। তবে ওই দেখা তাঁদের কারো মনেই কোন প্রভাব ফেলেনি। কিন্তু এই সেই ঘর, যেখানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে বিধানের প্রথম কথাবার্তা বিধানের সারা জীবনের সঞ্চয় হয়ে রয়েছে। ঘরে অশ্রুমুখী বাসন্তী দেবী। কাছেই বসে বিষণ্ণ বিহ্বল মহাত্মা গান্ধী। বিধানকে দেখেই বাসন্তী দেবী অশ্রুর প্লাবনে

ভেসে বললেন, "বিধান, তুমি কাছে থাকলে উনি এভাবে চলে যেতে পারতেন না!" এরপরেই বাসন্তী দেবী গান্ধীজির সঙ্গে বিধানের পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরবর্তীকালে বিধান স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেছেন, "গান্ধীজিকে দেখেই কেন জানি না এক স্বতস্ফূর্ত আত্মীয়তার সুর আমার মনে বেজে উঠল এবং যা পরবর্তী ২৩ বছর ধরে সমানভাবে বেজেছে।" দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার জন্য যখন 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন' গঠনের সিদ্ধান্ত হল, তখন গান্ধীজির প্রস্তাব অনুযায়ী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে ওই প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি করা হয়েছিল। ত্রিশ বছর পর বিধান তার জীবনীকার কে পি টমাসকে বলেছেন, "নিজহাতে দেশবন্ধুর মরদেহের ছবি তুলেছিলাম। কয়েকদিন পর শান্তিনিকেতনে গেলাম রবীন্দ্রনাথের কাছে। গুরুদেবকে বললাম ছবির উপর আপনাকে কিছু একটা লিখে দিতে হবে। গুরুদেব আমাকে ঠাট্টা করে বললেন, "ডাক্তার এটা কী প্রেসক্রিপশন লেখা"। তারপর তিনি দেশবন্ধুর মরদেহের ছবির উপর লিখে দিলেন

"এনেছিলে সাথে করে
মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি
করে গেলে দান।'

বিধানেব তোলা এই ছবি ও সেইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথেব ওই অবিস্মরণীয় শ্রদ্ধাঞ্জলি পরবর্তী প্রজন্মে বাঙালির ঘরে ঘরে বাঁধানো ছবি হয়ে শোভা পেয়েছে। চিত্তরঞ্জন সেবাসদন প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থসাহায্যের আবেদন জানালো মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ। লক্ষ লক্ষ টাকা আসতে লাগল ওই তহবিলে। গান্ধীজি ওই তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের সব দাযিত্ব দিলেন বিধান। দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিযেই বলতে গেলে বিধানচন্দ্র রায় জাতীয় কংগ্রেসের একজন সর্বভারতীয় নেতার পদে অধিষ্ঠিত হলেন।

কংগ্রেস বলতে গেলে সর্বদাই জাতীয় ও প্রাদেশিক স্তরে বিভিন্ন গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বিদীর্ণ ছিল। কখনও বা ওই দ্বন্দ্ব ব্যক্তিগত স্বৈরিতার রূপ নিয়েছে। বাংলা কংগ্রেসে এটা খুব প্রকট ছিল সুভাষচন্দ্র ও দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মধ্যে। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ছিলেন কংগ্রেসের সংস্কারপন্থীরা এবং গান্ধীজির প্রচলিতপন্থীদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন যতীন্দ্রমোহন। বিধান বাংলা কংগ্রেসের এই যুযুধান গোষ্ঠী থেকে নিজেকে সবসময়েই দূরে রেখেছেন। এর ফলে সংকটমুহূর্তে বিধান কাজ করেছেন দুই গোষ্ঠীর সেতুবন্ধন হিসাবে। একদিকে সুভাষচন্দ্র ও অন্যদিকে যতীন্দ্রমোহন উভয়ের সঙ্গেই ছিল বিধানের অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত সম্পর্ক। ওই সময় সুভাষচন্দ্রের দীর্ঘ কারাবাস সুভাষপন্থীদের নেতৃত্বের জন্য বিধানের খুব কাছে নিয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে বাংলা কংগ্রেসে গান্ধী অনুগতদের অন্যতম দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গেও ছিল সুসম্পর্ক। উল্লেখযোগ্য যে যতীন্দ্রমোহন

সেনগুপ্ত ছিলেন তখন বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি। এই অবস্থায় ১৯২৮ সালে কলকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হল। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে মতিলাল নেহ্রু হলেন কংগ্রেস সভাপতি। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে যতীন্দ্রমোহন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে অভ্যর্থনা সর্মিতিব সাধারণ সম্পাদকের পদে মনোনীত করলেন। জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের পরিকাঠামোতে অভ্যর্থনা সমিতির সাধারণ সম্পাদকের পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পদের অধিকারীকে কেবল অর্থ সংগ্রহ তহবিলের হিসাব রাখতেই হত না। ওয়ার্কিং কমিটির নেতারা ও এ আই সি সি-র সদস্যদের থাকা, খাওয়া, স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা বিধানের সকল দায়িত্ব বর্তায এই সাধাবণ সম্পাদকের উপর। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কংগ্রেস অধিবেশনকে রাজসূয় যজ্ঞ ও জাতীয় উৎসব বলা হত। এই কর্মযজ্ঞে পরিচালনায় বিধান তাঁর অসাধারণ কর্মকুশলতা ও প্রশাসনিক দক্ষতার পরিচয় রাখলেন। এই অধিবেশনেই সুভাষ খদ্দরের সামরিক পোশাকে সজ্জিত ও অশ্বারোহী হয়ে কংগ্রেস সেবাদলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তখন তাঁকে বলা হয়েছিল কংগ্রেস সেবাদল বাহিনীর 'জেনারেল অফিসার কমান্ডিং' বা G.O.C. এই অধিবেশনের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনী। বিধান এই প্রদর্শনী আয়োজনের দায়িত্ব দিযেছিলেন তাঁর শিল্পপতি বন্ধু নলিনীরঞ্জন সরকারের উপর। ১৯২৮ এর কলকাতা কংগ্রেসে বিধানের সাংগঠনিক কুশলতাই তাঁকে পর পর দুবছরের জন্য এনে দিল এ আ-ই সি সি সদস্য পদ (১৯২৮ ও ১৯২৯)। বিধান নিজেকে কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বাইরে রাখার ফলে তাঁকে প্রায়শই মধ্যস্থতার ও শান্তিরক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে। অবশ্য কংগ্রেসের প্রকাশ্য মঞ্চে তাঁর অবস্থান ছিল বাংলা কংগ্রেসের পঞ্চপ্রধানের একজনরূপে। ওই বহুবিদিত পঞ্চপ্রধানদের বাকি চারজন হলেন শরৎচন্দ্র বসু, নলিনীরঞ্জন সরকার, তুলসীচরণ গোস্বামী ও নির্মলচন্দ্র চন্দ্র। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বাংলা কংগ্রেসে স্বরাজ্য গোষ্ঠীর আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখাই ছিল পঞ্চপ্রধানের প্রধান ভূমিকা।

পরের বছরে অর্থাৎ ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হল ঐতিহাসিক লাহোর কংগ্রেসে। এই অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হলেন জওহরলাল নেহ্রু। প্রস্তাব গ্রহণ করা হল 'পূর্ণ স্বরাজের'। এবং এই অধিবেশনেই দেশের শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে কংগ্রেসের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার প্রস্তাব গৃহীত হয়। 'পূর্ণ স্বরাজ' প্রস্তাবের খসড়া রচনা কবলেন সুভাষচন্দ্র ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রস্তাবের রচয়িতা ছিলেন জয় প্রকাশ নারায়ণ। এই অধিবেশনেও নরমপন্থীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে চরমপন্থীদের সংঘাত প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করল। চরমপন্থীদের দাবিতে অনুমোদিত হল আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক এবং আন্দোলনকে পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্ব দেওয়া হল গান্ধীজিকে। সিদ্ধান্ত হল কংগ্রেস সদস্যদের আইনসভা

ও সরকারি কমিটির সদস্যপদ বর্জন করার। লাহোর কংগ্রেসে জওহরলালকে সভাপতি করার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। সেটি হল বিদায়ী সভাপতি মতিলাল নেহরু পরবর্তী সভাপতি হিসাবে পুত্র জওহরলালের নাম প্রস্তাব করে ওয়ার্কিং কমিটিকে দিয়ে তা অনুমোদন করানো। এর প্রতিবাদে তীব্র কশাঘাত করে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মতিলাল নেহরুকে একটি অবিস্মরণীয় চিঠি লেখেন। পরবর্তীকালে জওহরলাল প্রধানমন্ত্রী হিসাবে যতীন্দ্রমোহনের ওই চিঠিটি আদ্যোপান্ত প্রকাশ করেন তাঁর সম্পাদিত A bunch of old letters গ্রন্থে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস থেকে তখন এ আই সি সির সদস্য ৩৪ জনের মধ্যে বিধান ছিলেন। এদিকে ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশে বিধান বঙ্গীয় আইন পরিষদ থেকে পদত্যাগ করলেন। ওযার্কিং কমিটি ২৬ জানুয়ারি দিনটিকে 'পূর্ণ স্বরাজের' দিন হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিল এবং ১৯৩০ সালের ওই দিনটিতে বিধান বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির দফতরে কংগ্রেস পতাকা তুলে ওই দিনটির উদ্বোধন করলেন। ওই বছরের ২১ মার্চ এলাহাবাদে এ আই সি সি অধিবেশনে আইন অমান্য আন্দোলনের রূপরেখা চূড়ান্ত হল। স্থির হল গান্ধীজি ৭৫ জন সত্যাগ্রহী নিয়ে গুজরাটের ডান্ডি সমুদ্রসৈকতে গিয়ে সমুদ্রের জল থেকে লবণ বানিয়ে সরকারের লবণ আইন অমান্য কববেন। নতুন করে নির্যাতন ও অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেল সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। দেশের সর্বত্র কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের ধরপাকড় চলল। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ও সুভাষচন্দ্র-সহ সকলে একের পর এক কারারুদ্ধ হলে বিধানকে প্রকারান্তরে বাংলা কংগ্রেসের সর্বময় দায়িত্ব দেওয়া হল। এছাড়া ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসাবে বিধানকে এ আই সি সি-র কাজকর্ম ও দেখতে হয়েছে, কারণ ইংরাজ সরকাব জাতীয় কংগ্রেসকে 'অবৈধ প্রতিষ্ঠান' বলে ঘোষণা করে দেয়। প্রায় ৬ মাস বিধান বাংলা প্রদেশ আইন অমান্য আন্দোলনকে পরিচালনা করেছেন। একের পর এক বিকল্প কংগ্রেস সভাপতিরা মতিলাল নেহরু বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ডাঃ এম এ আনসারি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। এই অবস্থায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কাবান্তরালের বাইরে থাকা ওয়ার্কিং কমিটির বাকি সদস্যদের সঙ্গে প্রতিদিন বৈঠক করতেন এবং সত্যাগ্রহীদের নির্দেশ দিতেন। বিধান প্রতিদিন খবরের কাগজে 'প্রেস সেন্সরশিপের' বিরুদ্ধে এবং নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের আক্রমণ না করতে ভারতীয় পুলিশ ও অফিসারদের কাছে আবেদন জানাতেন। ১৯৩০-এর এপ্রিলে পেশোয়ারে নিরস্ত্র ও অহিংস সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশি আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে বিধান এক বিবৃতি দিলেন।

অবশেষে বিধান ১৯৩০ সালের ২০ আগস্ট দিল্লিতে গ্রেফতার হলেন। ওইদিন 'বে আইনি' ঘোষিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা হওয়ার কথা। তাতে যোগ দিতে তিনি দিল্লি পৌঁছলেন। সভা বসার আগেই ডাঃ রায়, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ আনসারি, বল্লভভাই প্যাটেল ও আরও কয়েকজনকে পুলিশ

গ্রেফতার করে দিল্লির এক আদালতে নিয়ে গেল। আদালত তাঁদের ৬ মাসের কারাদণ্ড দিলেন। দিল্লিতে দশ দিন কারাজীবন যাপনের পর একদিন দিল্লির পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট বিধানকে জেল থেকে গাড়ি চালিয়ে রেল স্টেশনে নিয়ে এলেন ও কলকাতামুখী একটি ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরায় পুলিশ হেফাজতে তুলে দিলেন। গাড়ি হাওড়া স্টেশনে পৌঁছল কংগ্রেস সমর্থকেরা তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা জানালেন। পুলিশ তাঁকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে এল। জেলে ঢুকেই তিনি দেখতে পেলেন তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছেন শরৎচন্দ্র বসু, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, কিরণশঙ্কর রায়, ও অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদেরই পাশের একটি সেলে বিধানের থাকার জায়গা হল। একদিন জেল সুপার মেজর প্যান্টি (Major Panty) ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে এসে তাঁকে জেলের ১২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের দায়িত্ব নিতে বলেন। সে সময় আলিপুর জেলের আড়াই হাজার কয়েদির মধ্যে প্রায় আর্ধেকই ছিলেন রাজনৈতিক বন্দী। এর ফলে তিনি তাঁর রুটিনমাফিক জীবনে আবার ফিরে এলেন। প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় উঠে বিধান তাঁর রাজবন্দী বন্ধুদের সঙ্গে কারাপ্রাচীরের মধ্যেই মর্নিং ওয়াক করতেন। তারপর চলে যেতেন হাসপাতালে ও সেখানে তাঁর সারাটা দিন কাটত রোগীদের দেখাশুনো করে। জেলে ডাক্তারি করে কয়েদি রোগিদের সঙ্গে মেলামেশা করে বিধান বুঝতে পেরেছিলেন যে, শতকরা ৮০ ভাগ কয়েদিই অপরাধপ্রবণ নয়। উপযুক্ত সামাজিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা নিলে তাদের অপরাধ জগৎ থেকে উদ্ধার করা যায়। তিনি অসুস্থ কয়েদিদের সুস্থ করার জন্য নিজের পয়সা দিয়ে ওষুধ কিনে আনতেন বাইরে থেকে এবং ওই ওষুধ ব্যবহার করার জন্য জেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি আদায় করতেন। তাঁর চিকিৎসার ফলে ৬ মাসে কয়েদি মৃত্যুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেল। চিকিৎসার ব্যাপারে তিনি জেলের মেডিসিন রুলসের পরিবর্তনের দাবি জানাতেন প্রতিনিয়ত। জেল কর্তৃপক্ষ বিধান ডাক্তারকে তাঁর নিজের বিছানা ও নিজের জামাকাপড় ব্যবহার করতে দিতে রাজি হলেন। সন্ধ্যার পর ওয়ার্ডে গিয়ে নাম ডেকে হাজির করানোর ব্যবস্থা থেকে বিধানকে বাদ দেওয়া হল। তাঁর চিকিৎসার ফলে বহু কয়েদির জীবন রক্ষা পাওয়ায় জেল সুপারিন্টেডেন্ট তাঁর ৬ মাসের কারাদণ্ডের মেয়াদ ৬ সপ্তাহ কমিয়ে দিলেন। জেল নিয়মাবলীতে বলা রয়েছে যে, কোন বন্দী অপর বন্দীর জীবন রক্ষা করলে জেল সুপারিন্টেডেন্ট বন্দীর ৬ মাসের দণ্ড মকুব করতে পারেন। বিধানের ৬ সপ্তাহের দণ্ড মকুব করে জেল সুপারিন্টেডেন্ট নোট দিয়েছিলেন যে, ডাঃ রায় একজনের নয়, বহু কয়েদিরই জীবন রক্ষা করেছেন। শেষপর্যন্ত ১৯৩১ সালের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে বিধান আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে মুক্তি পেলেন।

ইতিমধ্যে এলাহাবাদে মতিলাল নেহরু গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন ও তিনি বিধানকে চাইলেন তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকতে। বিধান ছুটলেন এলাহাবাদ।

সেখান থেকে পণ্ডিত মতিলালকে লখনউতে স্থানান্তরিত করা হল। বিধানও তাঁর সঙ্গে সেখানে। অবশেষে ২৯ জানুয়ারি (১৯৩১) লখনউতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। বিধান তখনও তাঁর শয্যাপার্শ্বে বসে। মতিলালের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী বাঁশের কফিন তৈরির কাজে নেমে পড়লেন বিধান। বাঁশের কফিনে মতিলালের দেহ রেখে কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ পতাকা শোভিত ওই কফিন লখনউ থেকে এলাহাবাদে নিয়ে আসা হল। সেখানে গান্ধীজি উপস্থিত। তিনি বাঁশের কফিনের নির্মাণ কুশলতা দেখে টিপ্পনি কেটে বললেন, "বিধান, তুমি আর্কিটেক্ট না হয়ে ডাক্তার হলে কেন?" মতিলালের শেষকৃত্যের পরেও বিশ কিছুদিন বিধান ও গান্ধীজি একসঙ্গে এলাহাবাদে 'আনন্দভবনে' থেকে গেলেন। এভাবে একসঙ্গে এক বাড়িতে থাকার ফলে গান্ধীজির সঙ্গে বিধানের মানসিক নৈকট্য ঘনিষ্ঠতর হল। এদিকে ১৯৩০ সাল থেকেই হিন্দু সমাজের দলিত ও অবহেলিত অংশের জটিল সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। হিন্দু সমাজের এই অংশকে তথাকথিত 'তপশিলি সম্প্রদায়' আখ্যা দিয়ে তাদের নেতা ডাঃ বি আর আম্বেদকর দাবি জানালেন যে, দেশের যে কোন শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ওই সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য পৃথক সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিধান এ ধরনের সংরক্ষণের বিরোধিতায় সুস্পষ্ট তীক্ষ্ণ ও দৃঢ় ছিলেন। এই বিষয়ে বিধান সরাসরি গান্ধীজিকে প্রশ্ন করেছিলেন কেন তিনি গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে সই করলেন। গান্ধীজি বিধানকে বলেছিলেন "আমি লর্ড আরউইনের কাছে নতিস্বীকার করিনি। আমি নতিস্বীকার করেছি তাঁর সততার কাছে। আমি ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশ অমান্য করে একাজ করেছি।" ইতিমধ্যে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড তপশিলি সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা ঘোষণা করলেন। সারা দেশ জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। গান্ধীজি আর একবার আমরণ অনশন আরম্ভ করলেন পুনাতে। বিধানের কারামুক্তি ও পুনাতে গান্ধীজির অনশনের মধ্যবর্তী একটা সময়ে গান্ধীজি বিধানকে নিখিলভারত অস্পৃশ্যতা বিরোধী পরিষদের বঙ্গীয় শাখার সভাপতি মনোনীত করলেন। কিন্তু বাংলার দুই প্রবীণ গান্ধীবাদী নেতা ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত গান্ধীজির ওই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলেন। এই নিয়ে বাংলা কংগ্রেসে সেই পুরানো রেষারেষি আরম্ভ হয়ে গেল। বিধান ওই পদে ইস্তফা দিলেন। অবশ্য পরে তিনি গান্ধীজির অনুরোধে ও তাঁর সমর্থনের আশ্বাসে ইস্তফা প্রত্যাহার করে নিলেন। এই বিষয়ে গান্ধীজি বিধান ও বিড়লার মধ্যে যে পত্রালাপ হয়েছে, সেগুলি ওই সময়কার রাজনীতিকে চিত্তাকর্ষক করে তোলে। ইতিমধ্যে গান্ধীজি পুনাতে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আমরণ অনশন আরম্ভ করলেন। তখন অন্যসব বাদ বিসম্বাদের চেয়ে গান্ধীজির জীবনরক্ষাই জাতির কাছে সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়াল। অনশনের তৃতীয় দিনে বিধান পুনাতে গান্ধীজির পাশে গিয়ে হাজির হলেন। এই অনশন অবস্থার মধ্যেই গান্ধীজি আম্বেদকারের সঙ্গে 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা'

নিয়ে চুক্তি করলেন, যা ইতিহাসে 'পুনা চুক্তি' নামে খ্যাত। 'পুনা চুক্তি' সম্পর্কে কংগ্রেসের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড তাঁর 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা'য় আম্বেদকরকে যা দিতে চেয়েছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁকে দিয়েছেন গান্ধীজি 'পুনা চুক্তির' মধ্য দিয়ে। যাহোক ১৯৩৩ সালে পুনাতে গান্ধীজির ২১ দিনের অনশন শেষ হওয়া পর্যন্ত বিধান সর্বক্ষণ গান্ধীজির পাশে ছিলেন। এ সম্পর্কে বিধান তাঁর স্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন, "আমাদের চারপাশে আমরা এমন একজন মানুষকে দেখতে পাচ্ছি যিনি উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কিংবা কর্তব্যবোধকে সবার উপরে রেখে খাদ্য ও বিশ্রাম না নিয়ে দিনের পর দিন অতিবাহিত করে চলেছেন। এরকম ক্ষেত্রে এক চরম আবেগধারাই সেই মানুষটির দৈহিক ক্রিয়াকলাপকে অটুট রাখে। গান্ধীজির ক্ষেত্রে সেটা হল এক স্বেচ্ছা অনুশাসন। তার চিত্তের উদ্দেশ্যই তাঁকে অনশনে যেতে প্রলুব্ধ করেছে এবং সেটাই গান্ধীজির দৈহিক চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।" এক প্রচণ্ড হতাশা নিয়ে বিধান কলকাতায় ফিরে এলেন। যেভাবে দেশে আইন অমান্য আন্দোলন চলছিল, তাতে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। তবু শৃংখলাপরায়ণ সৈনিকের মতোই তিনি প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যপদে ইস্তফা দিলেন। কিন্তু এতে তাঁর মনের সায় ছিল না। তবে পুনাতে গান্ধীজির কাছে থেকে তিনি একটা শিক্ষালাভ করেছেন। তা হল, কিছু মানুষ আছেন, যাদের মনই দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে। যাহোক, হতাশাগ্রস্ত বিধান ১৯৩৪ সালের মার্চ মাসে দিল্লিতে কংগ্রেস নেতাদের এক সম্মেলন ডাকার তোড়জোড় করছিলেন। এই সময় এক মোটরগাড়ি দুর্ঘটনায় তাঁর বাঁ পা ভেঙে গেল। ফলে কয়েকমাসের জন্য তিনি চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়লেন। অবশেষে ১৯৩৪ সালের ১৭ ডিসেম্বরে পাটনায় বিধান গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করলেন এবং তাঁকে তাঁর হতাশা ও অসন্তোষের কথা জানালেন। তিনি গান্ধীজিকে বললেন, রোগীর দেহ থেকে ক্যান্সার রোগের উৎস নির্মূল করতে একজন সার্জেনের দরকার খুব ধারালো একটি ছুরির। কিন্তু অপারেশন করতে গিয়ে সার্জেন যদি দেখেন তার হাতের ছুরিটির ধার নেই ও সেটি ভোঁতা, তাহলে ওই ছুরি রোগীর ক্যান্সার নির্মূল করার চেয়ে তাকে দেহে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করবে। আইন অমান্য আন্দোলনের অবস্থা হয়েছে ঠিক তাই। কিন্তু গান্ধীজি বিধানের যুক্তিতে নিশ্চিত হলেন না। কিন্তু বিধান তাতে ক্ষান্ত না হয়ে বলে চললেন, যুদ্ধের সময় একজন ভাল সেনাপতি যেমন তাঁর বাহিনীর অগ্রগমনকে মাঝপথে থামিয়ে সৈন্যদের আবার নতুন করে সাজিয়ে নেন ও অস্ত্রের ধার পরীক্ষা করে থাকেন, ঠিক তেমনভাবে কংগ্রেস জেনারেলের উচিত তাঁর সৈন্যদের সাজিয়ে নেওয়া। বিধানের এই যুক্তি গান্ধীজির মনে দাগ কেটেছে বলে মনে হল। তিনি সম্মেলন ডাকার প্রস্তাব অনুমোদন করলেন এবং তার ফলাফল তাঁকে জানাতে বিধানকে নির্দেশ দিলেন।

অবশেষে দিল্লিতে ডাঃ আনসারির বাড়িতে ১৯৩৪ সালের ৩০ মার্চ থেকে ৩

এপ্রিল এই চারদিন ধরে নিখিলভারত স্বরাজ্যপন্থী কংগ্রেস নেতাদের বৈঠক বসল। বৈঠকের সভাপতি ছিলেন ভুলাভাই দেশাই। সম্মেলনে এই সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হল .

১। স্বরাজ্য পার্টিকে সাসপেন্ড করার বিষয়টির পুনর্বিবেচনা।

২। যে সকল কংগ্রেসকর্মী আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিযভাবে অংশ নিতে পারেননি, অথচ তাঁরা তাঁদেব সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর, তাঁদের আইনসভাব ভিতরে ওই কাজ করার জন্য কেন্দ্রীয় আইন সভার আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া।

৩। স্বরাজ্যপার্টিব পুনরুজ্জীবনে রাজি হতে কংগ্রেসকে অনুরোধ এভাবে করা যাতে কংগ্রেসের আইন অমান্য কর্মসূচির কোন ব্যাঘাত না ঘটে।* দেশের শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা দূর করার জন্য লর্ড উইলিংডন যে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার কথা ভাবছিলেন তাতে এই স্বরাজ্য সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি অনেকটা প্রভাবিত করেছিল। এদিকে ১৯৩৪ সালের ২ ও ৩ মার্চ রাঁচিতে স্বরাজ্য পার্টির এক সম্মেলন বসল। এই বৈঠকে উপস্থিতদের মধ্যে যাঁবা স্ববাজ্য পাটিব পুনরুজ্জীবনকে সমর্থন করলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন উত্তবপ্রদেশের চৌধুরি খালিকুজ্জামান ও মাদ্রাজের টি প্রকাশম্। স্ববাজ্য পার্টির পুনরুজ্জীবনে বিধানেব ভূমিকা ও তাঁর প্রযাসকে ভাবতেব বিভিন্ন প্রদেশের নেতাবা অভিনন্দন জানাতে লাগলেন। কলকাতায় বিধানের ৩৬ ওয়েলিংটন স্কোয়ারেব বাড়িতে নিখিল ভাবত স্বরাজ্য পার্টির অফিস খোলা হল। রচিত হল পার্টির খসড়া গঠনতন্ত্র এবং এই গঠনতন্ত্রে বলা হল : "ভারতের জনগণ ন্যাযসঙ্গত পক্ষে ও শান্তিপূর্ণ উপাযে দেশে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করুক, এটাই হল স্বরাজ্য পার্টির মূল লক্ষ্য।" এই সময়ে ১৯৩৪-৩৫ সালে বিধান জাতীয় কংগ্রেসেব পার্লামেন্টারি বোর্ডেরও সদস্য ছিলেন। এই সূবাদে তিনি দেশের বিভিন্ন প্রদেশে যেতে লাগলেন এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেসেব নেতাদের সঙ্গে মত বিনিময় আরম্ভ করলেন। প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতাদের অনেকেই আইন অমান্য আন্দোলনের অচলাবস্থাকে স্বীকার করলেন ও আইন সভায় প্রবেশের জন্য স্বরাজ্যপন্থীদের উদ্যোগ সমর্থন কবলেন। ইতিমধ্যে ১৯৩৪ সালের জুলাইতে এ আই সি সি-ব বৈঠকে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ডাঃ আনসারি ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আইনসভার নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য (Council Entry) যে রিপোর্ট এ আই সি সিতে পেশ করেছিলেন, তা অনুমোদিত হল। এই বৈঠকে গান্ধীজি আশ্চর্যজনকভাবে ডাঃ আনসারি ও বিধানের রিপোর্টকে সমর্থন করে বললেন, "আমি স্বীকার করছি যে, ডাঃ আনসারি ও ডাঃ বিধান তাঁদের

ক কে পি টমাসেব গ্রন্থ। খ নেহরু মিউজিযমেব রেকর্ড। ডাঃ বি সি বায পেপাবস।

স্বচ্ছ বিশ্বাস নিয়েই আমাদের আন্দোলনের কর্মসূচির পরিবর্তন চাইছেন। সুতরাং আমি আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়ে আইন সভায় প্রবেশের প্রস্তাব সমর্থন করতে চাই।" ১৯২২ সালের দেশবন্ধু মতিলালের আমলের 'কাউন্সিল এন্ট্রি'র সঙ্গে ১৯৩৫ সালের 'কাউন্সিল এন্ট্রি'র তফাৎ কেবল এটুকু যে ১৯৩৫ সালে স্বরাজ্যপন্থীদেরও কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হল। এ আই সি সি-র এই বৈঠকে এক নির্বাচন কমিটি গঠিত হল। ডাঃ আনসারি হলেন ওই কমিটির সভাপতি এবং ভুলাভাই দেশাই ও বিধানচন্দ্র রায় মনোনীত হলেন কমিটির সম্পাদক। নির্বাচনের জন্য কংগ্রেসের প্রার্থী বাছাই ও মনোনয়ন পেশের কাজ যখন প্রায় শেষ, তখন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এক তীর নিক্ষেপ করলেন নির্বাচনী প্রক্রিয়ার উপর। তিনি নিজেকে সভাপতি করে কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী পার্টি নামে একটি দল গঠন করলেন। পণ্ডিত মালব্য তপশিলি সম্প্রদায়ের আসন সংরক্ষণের প্রশ্নে আম্বেদকরের সঙ্গে গান্ধীজির পুনা চুক্তির তীব্র বিরোধী ছিলেন। বিধান মালব্যজির এই মনোভাব জানতেন। তাই পণ্ডিত মালব্যকে যখন কংগ্রেসের নির্বাচন কমিটির সহ-সভাপতি করা হল, তখন বিধান আপত্তি জানিয়েছিলেন। মালব্যের এই নতুন দল গঠনের সিদ্ধান্ত কংগ্রেসকে একটা ভাঙনের মুখে ঠেলে দিল। বিধান গান্ধীজির সঙ্গে আলোচনার জন্য বোম্বাই গেলেন। সেই দিনটি ছিল গান্ধীজির মৌনতা পালনের দিন। গান্ধীজি সব শুনে লিখিতভাবে তাঁর এই মত দিলেন "কংগ্রেস এত বড়ই একটা সংগঠন যে, কোন ব্যক্তি বিশেষ, তা তিনি যতই বড় হোন না কেন, কংগ্রেস তার ক্রীড়নক হাতে পারে না। সুতরাং প্রতিকূলতা যাই হোক না, নির্বাচন কমিটির কাজ পুরোদমে চালিয়ে যেতে হবে।" গান্ধীজির কাছ থেকে এই জবাব পেয়ে বিধান বিষয়টি নিয়ে উঠে পড়ে লাগলেন। এটা বিধানের স্বভাবের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল যে, তাঁকে কোন দায়িত্ব দিলে তিনি তা আন্তরিকভাবে পালনের চেষ্টা করতেন। এক্ষেত্রেও তাই হল। কংগ্রেসের এই নির্বাচনী কমিটি নিয়ে বিধান ও ভুলাভাই দেশাই'র মধ্যে যে সব পত্রালাপ হয়েছে, তা থেকে জানা যাচ্ছে যে, কংগ্রেসের নির্বাচনী তহবিলে টাটা কোম্পানি যাতে মোটা অঙ্কের চাঁদা দেয়, সেজন্য পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডনের মতো প্রবীণ নেতাদের উদ্যোগ করতে তিনি ভুলাভাইকে পরামর্শ দেন। তিনি ভুলাভাইর কাছে এই সুপারিশ করেন যে, টাটার কাছ থেকে বড় আর্থিক সাহায্য পাওয়া গেলে ইস্পাত মাশুল ধার্যের ব্যাপারে সরকারের মাশুল পর্ষদকে কংগ্রেস এমনভাবে প্রভাবিত করবে যাতে টাটা স্টিলের ব্যবসা বেশ সুবিধা পায়। বিধান তাঁর এই সুপারিশের সমর্থনে দৃষ্টান্ত দিয়ে উল্লেখ করেন যে, ১৯২২ থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে দেশবন্ধু ও মতিলাল নেহরু স্বরাজ্য পার্টির জন্য টাটা কোম্পানির কাছ থেকে মোটা অঙ্কের চাঁদা নিয়েছিলেন এবং দেশবন্ধু ও মতিলাল ভারতীয় ইস্পাত শিল্পকে রক্ষা করার জন্য আমদানি কৃত ইস্পাতের মাশুল বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকারের উপর অবিরাম চাপ রেখে টাটাকে সাহায্য করেছিলেন। এ

প্রসঙ্গে বিধান ভুলাভাইকে লিখেছেন, "দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষে এ ধরনের সাহায্য নেওয়ায় বাধা কোথায় তা আমি বুঝতে পারি না।"

১৯৩৪ সালে বিহারের ভয়াবহ ভূমিকম্পে বিধান বিহারের দুর্গত মানুষদের সেবাকার্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বিধান খবর পেলেন যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা তাঁদের অন্তহীন দুর্দশার মধ্যেও ত্রাণকেন্দ্রে হাজির হয়ে ত্রাণ নিতে দ্বিধাগ্রস্ত। বিধান তখন কংগ্রেসের সেবাকার্যের প্রধান ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে লিখলেন, "আপনার ত্রাণ কর্মীদের আপনি ক্ষতিগ্রস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের বাড়ি বাড়ি পাঠান ও সেখানে তাঁদের ঘরে সাহায্য পৌঁছে দিন। ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার সময় ত্রাণ কর্মীরা যেন জেনে নেয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের ত্রাণ সাহায্যের প্রয়োজন কতখানি ও কী ধরনের।" ইতিমধ্যে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য পুনা চুক্তির বিরোধিতা করে কংগ্রেসের পার্লামেন্টারি বোর্ড থেকে পদত্যাগ করলেন। তাঁর দল কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী পার্টি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রশ্নে আলাদাভাবে কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। বাংলা কংগ্রেসের অনেক বিশিষ্ট নেতা পণ্ডিত মালব্যের কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী হয়ে কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচনে দাঁড়ালেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন শরৎচন্দ্র বসু। তিনি কারারুদ্ধ অবস্থায় নির্বাচনে জয়লাভ করলেন। এই ঘটনা বাংলা কংগ্রেসের 'পঞ্চপ্রধানের' (Big Five) মধ্যেও ফাটল ধরাল। বসু পরিবারের শরৎ ও সুভাষের সঙ্গে বিধানের বরাবরই ভাল সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এই ঘটনা এবং ১৯৩৪ সালের অক্টোবরে সুভাষচন্দ্রকে বাদ দিয়ে তাঁকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত করার ব্যাপারে বিধানের সঙ্গে এই দুই ভাইয়ের সম্পর্ক এক বড় ধাক্কা খেল। কিন্তু নির্বাচিত হওয়ার পর বিধান বুঝতে পারলেন যে, ডাক্তার হিসাবে সমাজের প্রতি তাঁর যে দায়বদ্ধতা ও এবং রোগী দেখতে তাঁকে যখন তখন দেশের বিভিন্ন জায়গায় চলে যাওয়ার জন্য তাঁর পক্ষে কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা কঠিন হয়ে পড়ছে। ফলে দু মাস পরেই ডিসেম্বরে (১৯৩৪) তিনি কংগ্রেস সভাপতির পদে ইস্তফা দিলেন। ইস্তফা দিয়ে তিনি এক প্রকাশ্য বিবৃতিতে একথা বললেন যে, ডাক্তারির সঙ্গে জননেতার কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, একই সঙ্গে উভয়েই তাদের নিজ নিজ দাবি সবটুকু আদায় করে নিতে চায়। এই সময় ১৯৩৪-৩৫ সালে বিধান নিজেকে কংগ্রেস রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু থেকে দূরে সরিয়ে নিলেন। ১৯৩৫ সালের গোড়ার দিকে শরৎচন্দ্র বসু জেল থেকে ছাড়া পেলেন ও তার পরপরই তাঁদের জীবনে শেষবারের মতো নিজেদের মত পার্থক্য সরিয়ে ফেলার জন্য চেষ্টা করলেন এই পঞ্চপ্রধানেরা। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে এক ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা চলল। কিন্তু পঞ্চপ্রধানের মধ্যে শরৎচন্দ্র বসু একদিকে ও অন্য চারজন বিধান রায়, নলিনী সরকার, নির্মলচন্দ্র ও তুলসী গোস্বামী ভিন্নদিকে রইলেন। ফলে কোন সমঝোতা হল না। অপসৃত হল বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে পঞ্চপ্রধানের

অধ্যায়। কিন্তু বিধান চেষ্টা রাখলেন প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখতে। ওই সময় বিধান ১৯৩৫ সালের ৮ এপ্রিল দিল্লিতে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু ডাঃ এম এ আনসারিকে এক চিঠি লিখলেন। চিঠিতে তাঁর মানসিক অবস্থা বোঝা যায়। চিঠিটি হল এই : "আমি কিছুদিনের জন্য কংগ্রেসের কাজকর্মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না। আমি নিজেকে কিছুদিন রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে চাই। এজন্যই কংগ্রেসের পার্লামেন্টারি বোর্ডের কাজকর্মের কোন খবর রাখি না।"

ইতিমধ্যে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে সর্পদংশনে বিহারের গিরিডিতে। বাংলা কংগ্রেসে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর থেকে যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চলে আসছে, তার একটি প্রভাবশালী অংশের নেতা ছিলেন দেশপ্রিয় ও তাঁর একনিষ্ঠ অনুগামী বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। অন্যগোষ্ঠীর নেতা হিসাবে শরৎ বসু ও সুভাষচন্দ্র কখনই দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বের সঙ্গে আপস রফায় রাজি না হওয়ায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মীমাংসা কখনই সম্ভব হয়নি। দেশপ্রিয়ের মৃত্যুর পরেও তার মীমাংসা হল না। ১৯৩৫-৩৬ সালেও বাংলা কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব একই অবস্থায় রয়ে গেল। এদিকে ১৯৩৫ সালের ভারত সংস্কার আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় ১৯৩৭ সালের নির্বাচন আসন্ন। নির্বাচনে এই প্রদেশের কংগ্রেস প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত করতে বিধানের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হল। বাংলা কংগ্রেসের দুই বিবদমান গোষ্ঠীর দু'জন করে প্রতিনিধি এই কমিটির সদস্য হলেন। কমিটি ২০০ (দুশো) প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করলেন। কিন্তু চারটি আসনের প্রার্থীদের নাম নিয়ে শরৎ বসুর সঙ্গে কমিটির মতৈক্য হল না। শরৎ বসু ওয়ার্কিং কমিটিকে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ করলেন। ওয়ার্কিং কমিটি রায় দিল যে ওই চারটি আসনে বিবদমান গোষ্ঠীর দু'জন করে প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করা হোক। কিন্তু বিধান নির্বাচন কমিটির সভাপতি হিসাবে ওয়ার্কিং কমিটিকে জানালেন যে, ওয়ার্কিং কমিটির সুপারিশ দলের গঠনতন্ত্র বিরোধী। তিনি প্রস্তাব দিলেন যে, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সভায় বিষয়টি পেশ করা হোক এবং সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত উভয় গোষ্ঠীকে মেনে নিতে হবে। কিন্তু শরৎ বাবু এই প্রস্তাব মানতে রাজি হলেন না। ফলে বিধান নির্বাচন কমিটির সভাপতির পদে ইস্তফা দিলেন। তখন ওয়ার্কিং কমিটির অনুরোধে শরৎ বসু প্রাদেশিক নির্বাচন কমিটি পরিচালনার দায়িত্ব নিতে রাজি হলেন। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের অবস্থায় কংগ্রেস বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনের সম্মুখীন হল ১৯৩৭ সালে।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ার বিভেদনীতি, প্রবল প্রতিপক্ষ মুসলিম লীগের দৌরাত্ম ও তাদের সহযোগী আম্বেদকর ও যোগেন মণ্ডলের নিখিলভারত তপশিলি ফেডারেশনের ভেদ পন্থা সত্ত্বেও কংগ্রেস মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা প্রদেশের আইনসভায় ৫৯টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হল। বেশ কিছু আসনে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা করে ফজলুল হক সাহেবের কৃষক প্রজা পার্টি

৪০টি আসন পেল। আর মুসলিম লিগ পেল মাত্র ৩৯টি আসন। আইন সভায় মুসলিম লিগ বিরোধী দ্বিতীয় বৃহত্তম দল কৃষক প্রজা পার্টির নেতা আবুল কাশেম ফজলুল হক সাহেব প্রদেশে সরকার গঠনের জন্য কংগ্রেসের কাছে কোয়ালিশনের প্রস্তাব দেন। একদিকে বিধানচন্দ্র রায় ও অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে হক সাহেবের ব্যক্তিগত মধুর সম্পর্ক ছিল। বিধান ও সুভাষ ব্যক্তিগতভাবে হক সাহেবের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। বিধান এমন কী, নির্বাচনের আগে হক সাহেবের সঙ্গে ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়ের বাড়িতে দেখা করে কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচনী তহবিলে প্রচুর অর্থসাহায্য করেছেন। কিন্তু শরৎ বসু কংগ্রেস হাই কমান্ডের নির্দেশমত হক সাহেবের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনে রাজি হলেন না। কংগ্রেসের যুক্তি ছিল এই যে, কোন প্রদেশে কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রতিশ্রুতি কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে ছিল না সুতরাং নির্বাচনী ইস্তাহার বিরোধী কোন কাজ কংগ্রেসের মর্যাদার পক্ষে হানিকর হবে। ফলে হক সাহেব কোয়ালিশন সরকার গঠনের জন্য মুসলিম লিগের সাহায্য চাইলেন। মুসলিম লিগ সঙ্গে সঙ্গে রাজি হল এবং বাংলা প্রদেশে ফজলুল হক সাহেবের নেতৃত্বে প্রথম জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠিত হল। আজ বাংলা প্রদেশের রাজনৈতিক অতীতের দিকে এক দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে হক সাহেবের সঙ্গে কংগ্রেসের কোয়ালিশন না করার সিদ্ধান্ত একটা রাজনৈতিক ভুল এবং সে ভুলের মাশুল দিতে হয়েছে জাতিকে দেশ বিভাগের মধ্য দিয়ে। এই ভুলের জন্যই কংগ্রেস ফজলুল হক এবং অন্যান্য সমমনোভাবাপন্ন মুসলিম নেতাদের মুসলিম লিগের যূপকাষ্ঠে নিক্ষেপ করেছিল। এই ভুলের জন্যই ১৯৪০ সালে লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লিগ তার ঐতিহাসিক 'পাকিস্তান' প্রস্তাব পাস করার সুযোগ পেল। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের কাজ ১৯৩৭ সালের বঙ্গ রাজনীতি থেকেই উপ্ত হয়েছিল। কংগ্রেস হাইকম্যান্ড কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গড়ার প্রস্তাব খারিজ করে দিলে বিধান হতাশ ও মর্মাহত হয়ে পড়লেন। কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের ফলে তিনি দীর্ঘ কয়েক বছর সম্পূর্ণভাবে নিজেকে কংগ্রেস রাজনীতির বাইরে রেখে দিলেন। ওই সময় প্রভুদয়াল হিম্মতসিংকা তাঁর আইনসভার সদস্যপদটি ছেড়ে দেন। বড়বাজার কেন্দ্রের ওই সদস্যপদটি যাতে ঈশ্বরদাস জালান পান, এটাই ছিল ঘরোয়া বন্দোবস্ত। এই ঘটনাটি ঘটে ১৯৩৮ সালে। বিধানকে আবার দ্রুত কংগ্রেস রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনাব জন্য বড়বাজার থেকে একদল কংগ্রেস কর্মী দিল্লিতে মৌলানা আজাদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে বিধানকে বড়বাজার কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন দিতে অনুরোধ করেন। বিধান ব্যাপারটি জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে ওই উদ্যোগ প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি নিজেকে তাঁর ডাক্তারি প্র্যাকটিশের মধ্যেই বেশিরভাগ সময় ব্যাপৃত রাখেন ও রোগী দেখার জন্য সারাদেশে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। কিন্তু তাঁর ওই মানসিক দূরত্ব সত্ত্বেও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি তাঁকে

সভাপতি নির্বাচিত করল (১৯৩৭) এবং হাইকমান্ড তাঁকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সাক্ষ্যপদেও মনোনয়ন দিল। কাগজপত্রে তিনি কংগ্রেসের নেতৃত্বে থাকলেন বটে কিন্তু তাঁর মন একেবারেই দূরে সরে গিয়েছিল। তাঁর ওই সময়কার মনের অবস্থা সম্পর্কে তিনি তাঁর জীবনীকার কে পি টমাসকে বলেছেন, "আমি এটা সততার সঙ্গে বলতে পারি যে, আমি যখনই ওইসব কমিটিতে বক্তৃতা করেছি, তখন আমি এটা পরিষ্কার করে দিয়েছি যে, পার্টির নেতৃত্বে ও দলে আধিপত্য বিস্তারে আমার কোন লোভ নেই। জনগণের মতামতকে ঠিকপথে পরিচালিত করবার জন্য কোন রাজনৈতিক ক্ষেত্র বা গোষ্ঠী গঠনের প্রয়োজন হয়, আমি আমার রাজনৈতিক জীবনে একথা স্বীকার করি না। আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, রাজনৈতিক কপটতার আশ্রয় নিয়ে কখনই খুব বেশিদূর যাওয়া যায় না ও তা দিয়ে বেশি লোকের উপকারও করা যায় না। তাতে কেবল স্বজনপোষণ ও দুর্নীতিই প্রশ্রয় পায়। জীবনের অন্যসব ক্ষেত্রের মতই রাজনীতিতেও 'সততাই সর্বোত্তম পন্থা' এই অনুশাসনকে মেনে চলতে হবে।" এই অনুভূতিই বিধানচন্দ্র রায়কে ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের রাজনৈতিক আবর্ত থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। এই সময়কালে তিনি নিজেকে শিক্ষা ও পৌরশাসনে বেশিরভাগ সময় নিবদ্ধ রেখেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার হিসাবে তাঁর পুরো পাঁচবছরের মেয়াদ ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯৩৮ সালে হরিপুর অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হলেন সর্বসম্মতপ্রার্থী হিসাবে। কিন্তু ১৯৩৯ সালে গান্ধীজির বিরোধিতা সত্ত্বেও ত্রিপুরিতে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতির পদে পুনর্নির্বাচিত হলেন। গান্ধীজির মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়া বহু ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হলেন। পট্টভির পরাজয়কে গান্ধীজি "আমার পরাজয়" বলে আখ্যা দিলেন। গান্ধীজি নিজে ও ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য ব্যাপারে কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে অসহযোগিতা আরম্ভ করে দিলেন। ফলে জাতীয় কংগ্রেসে ভাঙন অনিবার্য হয়ে দেখা দিল। সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস পুরোপুরি ভাগ হয়ে গেল। সুভাষপন্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠী হওয়ায় কংগ্রেস হাইকমান্ড প্রদেশ কংগ্রেসকে বাতিল করে একটি 'এড হক' কমিটি গঠন করলেন। এই সময় গান্ধীজি সোদপুরে এলেন ও বিধানকে ডেকে পাঠালেন। সোদপুর আশ্রমে গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে অনেকক্ষণ কথা হল। গান্ধীজি তাঁকে অনুরোধ করলেন ওয়ার্কিং কমিটির কাজ পরিচালনার জন্য সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করতে। এই নিয়ে অনেকক্ষণ দুজনের মধ্যে বিতর্ক চলল। কিন্তু শেষপর্যন্ত বিধান গান্ধীজির প্রস্তাবে রাজি হলেন। এতদিন তিনি গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রর কাছ থেকে যে সমদূরত্ব বজায় রেখেছিলেন, তার অবসান হল। গান্ধীজির নেতৃত্বই তিনি স্বীকার করলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তে বাংলাপ্রদেশে সাংঘাতিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল ও তাঁর ওয়েলিংটন

স্ট্রিটের বাড়ি আক্রান্ত হল। সুভাষচন্দ্র বসুর কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের পর বাংলায় কংগ্রেসের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ল। গান্ধীজি বিধানকে প্রাদেশিক কংগ্রেস পুনর্গঠন করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু বিধান 'ধীরে চলো' নীতি গ্রহণ করা শ্রেয় মনে করলেন। ইতিমধ্যে ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। ভাইসরয় ভারতীয় জনগণের মতামতকে গ্রাহ্য না করে ভারতকে যুদ্ধের অংশীদার বলে ঘোষণা করলেন। এর প্রতিবাদে কংগ্রেস সাতটি প্রদেশের মন্ত্রিসভা বর্জন করল এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলি থেকে কংগ্রেস সদস্যদের প্রত্যাহার করে নিন। বিধান কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি হিসাবে ওয়ার্কিং কমিটিতে ওই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। তিনি বললেন, মন্ত্রিসভা বর্জন করা অবিবেচনাপ্রসূত কাজ হবে এবং ফলে দেশে মুসলিম লিগের রাজনৈতিক আধিপত্য বৃদ্ধি পাবে। বিধান কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে ইস্তফা দিতে চাইলেন। প্রথম বিধানের ইচ্ছা অগ্রাহ্য হল। কিন্তু বিধান পীড়াপীড়ি করাতে নবনিযুক্ত সভাপতি মৌলানা আজাদ তার অনুরোধ মেনে নিতে রাজি হলেন। বিধান আবার দূরে চলে গেলেন। এদিকে জাপান যুদ্ধে জার্মানির সহযোগী হওয়ায় যুদ্ধ এশিয়া ভূখণ্ডে বিশেষ করে বঙ্গোপসাগর এলাকায় এগিয়ে এল। ফলে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচুর ডাক্তারের প্রয়োজন দেখা দিল। ভারত সরকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে এ ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করলেন। বিধান গান্ধীজির অনুমতি চাইলেন ও ডাক্তার রিক্রুট করার কাজে সরকারকে সাহায্য করতে তিনি বিধানকে অনুমতি দিলেন। বিধান যখন একাজে হাত দিলেন, তখন গান্ধীজি তাঁর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন আরম্ভ করে দিয়েছেন। ভারত সরকার সব কংগ্রেস নেতাদের গ্রেফতারের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু বিধানকে বাদ দেওয়া হল, কারণ চিকিৎসা সাহায্যে তাঁকে সরকারের দরকার। এই সময় 'দীর্ঘ অনুপস্থিতির' জন্য সুভাষচন্দ্রের কলকাতা পৌরসভার অল্ডারম্যান পদ খারিজ হয়ে যায় ও আইন মোতাবেক নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বিধানকে কংগ্রেস কাউন্সিলাররা অল্ডারম্যান হতে অনুরোধ করলেন। বিধান তাঁদের বললেন, আগে শরৎ বসুকে অনুরোধ করা হোক, যদি তিনি রাজি না হন, তাহলে তাঁর দাঁড়াতে আপত্তি নেই। শরৎ বসু প্রথম রাজি হলেন না। তখন বিধান মনোনয়ন পেশ করলেন। বিধানের মনোনয়ন পেশের পর শরৎ বাবু জানালেন যে তিনি অল্ডারম্যান হতে রাজি। এবার বিধানকে মনোনযন প্রত্যাহার করতে চাপ দেওয়া হলে তিনি তা করতে অস্বীকার করলেন। ফলে একই দলের দুই নেতার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল। বিধান জিতলেন। কিন্তু একথা উল্লেখযোগ্য যে রাজনৈতিক বিরোধ সত্ত্বেও তাঁর সংগে শরৎ বসুর ব্যক্তিগত সম্পর্ক বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল।

৯

ভাইস চ্যান্সেলার বিধানচন্দ্র

ডাক্তার হিসাবে রোগীর সেবা করা যদি বিধানের প্রথম ভালোবাসা হয়ে থাকে, তাহলে শিক্ষার সেবা করা ছিল তাঁর দ্বিতীয় ভালোবাসা। স্যার আশুতোষের বিরাট ব্যক্তিত্বের ছায়ায় বিধান ১৯১৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সদস্য হন। এর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসন ও স্বাধিকার রক্ষার জন্য বিধান স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে এক তিক্ত বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছিলেন। স্যার প্রভাস মিত্র বঙ্গীয় আইন পরিষদে বিশ্ববিদ্যালয় সেনেটের কাজকর্ম সম্পর্কে কিছু অশালীন মন্তব্য করেছিলেন। বিধান তার প্রতিবাদ করে আইন পরিষদের সভাপতিকে এক কড়া চিঠি দেন। এই নিয়ে আইন পরিষদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের তুমুল বিবাদ হয়। ১৯২৪ সালে সেনেট বিধানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব কমিটির সভাপতি নিযুক্ত করে। দীর্ঘ এগারো বছর তিনি এই কাজ করে যান। ১৯৩১ সালে বিধান সিন্ডিকেটের সদস্য হন। এই সময়ে আইন অমান্য আন্দোলনের পদ্ধতি ও আদর্শ নিয়ে বিধানের মনে মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। গান্ধীজির নির্দেশে তিনি আইন পরিষদের সদস্যপদ ছেড়ে দিলেও মন থেকে তিনি তাঁর ইস্তফাকে মেনে নিতে পারেননি। এসব কারণে তিনি কংগ্রেস থেকে কিছুটা দূরে সরে আসেন এবং চিকিৎসা, বিশ্ববিদ্যালয় ও পৌরসভার কাজে নিজেকে বেশি নিয়োজিত করেন। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলে প্রদেশগুলি থেকে কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রেও বিধান ভিন্নমত পোষণ করায় কংগ্রেসের দৈনন্দিন কাজকর্ম থেকে তিনি নিজেকে একেবারে দূরে সরিয়ে নেন। ঠিক এই সময় ১৯৪১ সালে বিধানচন্দ্র রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত হলেন। এই সময়টা ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় দুঃসময়। অন্য কেউ অমন দুঃসময় মাথায় করে ভাইস চ্যান্সেলার হননি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণক্ষেত্রে জাপানের অগ্রগমন ও বঙ্গোপসাগরে জাপানি বিমান ও রণতরীর আধিপত্য কলকাতাকে জাপানি আক্রমণেব লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করল। ১৯৪২ সালে কলকাতা শহরে জাপানি বোমার আক্রমণ আরম্ভ হল। অনেক স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হল। বন্ধ কলেজকে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের জেলা শহরে স্থানান্তরিত করতে হল। বহরমপুরে বাড়ি ভাড়া করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্রংরুম, ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ড-সহ পরীক্ষাসমূহের কন্ট্রোলারের অফিস সরিয়ে নেওয়া হল। কলকাতার কলেজগুলিতে বিমান আক্রমণের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মহড়া প্রভৃতি আরম্ভ হল। পরবর্তী বছরের বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণের নির্ঘণ্ট তৈরি, প্রশ্নপত্র মুদ্রণ, পরীক্ষার খাতা সংগ্রহ ও বণ্টন এই সকল কাজের দায়িত্বে তাঁকে পালন করতে হয়েছে। সেই সঙ্গে ১৯৪৩ এর (বাংলা ১৩৫০) ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের ভরতুকি দিয়ে খাদ্যবস্তু সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ ও

বিভিন্ন রিলিফ কমিটি মারফত আর্ত শিক্ষক ও ছাত্রদের সাহায্য দান প্রভৃতি দায়িত্ব ভাইস চ্যান্সেলারকে বহন করতে হয়েছিল। কিন্তু এইসব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি অনেক নূতন জিনিসের প্রবর্তন করেন ১৯৪২ সালেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রম কল্যাণ বিষয়কে পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করলেন। তখন সেইসঙ্গে চালু করলেন ব্যবসাশিল্প পরিচালনা সংক্রান্ত (Business Management) পাঠক্রম। শ্রম ও শিল্প পরিচালনা ব্যবস্থা যে লেখাপড়ার পাঠ্যক্রম হতে পারে, তা ভারতবর্ষে তখন বিধান রায় ছাড়া আর কারও চিন্তায় আসেনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বল্প পরিসর জায়গায় তিনিই প্রতিষ্ঠা করলেন দেশের প্রথম ব্যবসাশিল্প পরিচালনা বিষয়ক শিক্ষায়তন (Business Management Institute) পরে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ১৯৬০ সালে তিনি ওই ইন্সটিটিউটের নিজস্ব ভবনের উদ্বোধন করেছিলেন। প্যারিচরণ সরকার স্ট্রিটের পশ্চিমে একদিকে হিন্দু হস্টেল ও অন্যদিকে প্রেসিডেন্সি কলেজের চৌহদ্দির কাছে একটি খাটাল অপসারণ করে সেখানে এই ইন্সটিটিউটি গড়ে ওঠে। পাট যে বাংলার শিল্প সমৃদ্ধির এক মস্ত হাতিয়ার, এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার হিসাবে উপলব্ধি করে তিনি বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে 'জুট টেকনোলজি ইন্সটিটিউট'-এর পত্তন করেন। গবেষণার মাধ্যমে চটশিল্পের যে বৈচিত্র্যকরণের প্রয়োজন, এ স্বপ্ন তিনি ছাড়া দেশের আর কেউ তখন ভাবেননি। ভাইস চ্যান্সেলার হিসাবেই তিনি শিক্ষার সঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যের সহাবস্থানের সূচনা কবেন। শিক্ষার পাঠ্যক্রম চালু করার, ব্যাপারে তাঁর মধ্যে কোন গোঁড়ামি বা ছুৎমার্গ ছিল না। ১৯৪২-৪৩ সালে এশিয়াভূখণ্ডে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন তুঙ্গে তখন ভারত সরকাব বিমান বাহিনীর পাইলট ও গ্রাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর এক সংক্ষিপ্ত কোর্স চালু করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। দেশ তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ লড়াই 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে উত্তাল। বিধান রায় 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যোগ না দিলেও তিনি তো সর্বান্তকরণে একজন কংগ্রেস নেতা। কিন্তু তাহলেও তিনি ওই সময়ে তিনি ভারত সরকারের ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এই ট্রেনিং বাঙালির কর্মসংস্থানের একটি বড় সুযোগ। তিনি সার্কুলার রোডে বিজ্ঞান কলেজের মধ্যে এই ট্রেনিংকেন্দ্র খুলে দিলেন। দিল্লি থেকে বিমান বাহিনীর অফিসার ও ইঞ্জিনিয়াররা নিয়মিত বিজ্ঞান কলেজে এসে ট্রেনিং ও রিক্রুটমেন্ট করতে আরম্ভ করলেন। যুদ্ধশেষে দেশের মধ্যে ও দেশের বাইরে এই জীবিকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়েছিল। লাইসেন্সিয়েট মেডিকেল চিকিৎসকদের জন্য সংক্ষিপ্ত এম বি কোর্স প্রবর্তন করলেন। এই শ্রেণীর ডাক্তাররা যুদ্ধে গিয়ে চিকিৎসাক্ষেত্রে বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জন করেও স্বীকৃত এম বি না হতে পারায় অচ্ছুৎ হয়ে ছিলেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রবর্তিত এই সংক্ষিপ্ত মেডিকেল কোর্স সারা দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে অন্তত পরবর্তী অর্ধশতাব্দীর জন্য উপকৃত করেছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল।

১০

বিশ্বযুদ্ধ দুর্ভিক্ষ ও দাঙ্গার বর্ষগুলি (১৯৪০-৪৬) : বিধানের ভূমিকা

আগেই বলেছি যে ১৯৪০ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত বিধানচন্দ্র রায় কংগ্রেসের জাতীয় রাজনীতি থেকে নিজেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন। ওই সময় গান্ধীজির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের ঐতিহাসিক সংঘাতের সময় তিনি নিরপেক্ষতা বজায় রেখে উভয়ের সঙ্গে চিকিৎসক হিসাবে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ধরে রেখেছিলেন। তিনি নিজেকে বেশির ভাগ সময়েই চিকিৎসা, সমাজসেবা ও দাতব্য কাজকর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। এই সঙ্গে ভাইস চ্যান্সেলারের দায়িত্ব তো ছিলই। কর্পোরেশনের কাজকর্মের সঙ্গে অবশ্য তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। ১৯৪২ সালে বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে জাপানের আধিপত্য বিস্তার সিঙ্গাপুর এবং বর্মামুলুক দখলের পর বর্মায় বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক ভারতীয় সড়ক ও জঙ্গলপথে অসমে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে। কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদের অনুরোধে বিধান রায় কংগ্রেসের একটি মেডিকেল মিশন নিয়ে আসামে যান ও ২২ হাজারের বেশি ভারতীয় শরণার্থীকে চিকিৎসা করেন। এই কাজের জন্য ডাঃ রায় কংগ্রেস তহবিলে টাকা তোলেন। যেমন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তেমনি লেডি লিনলিথগো (ভাইসরয় পত্নী) ও কাপুরতলার মহারাজকে তিনি কংগ্রেস তহবিলে চাঁদা দিতে অনুপ্রাণিত করেন। কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ বিধানচন্দ্র রায়ের এই অরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থন জানান*। এর অব্যবহিত পরেই বাংলার বুকে নেমে আসে ১৯৪৩ এর মহাদুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তর, সে বিপর্যয়ে প্রায় ৫০ লাখ বাঙালির নিধন হয়। এই দুর্ভিক্ষত্রাণে বিধান অনেকগুলি সেবা সমিতির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন ও তাঁর নিজের জেলা খুলনা-যশোর সেবা সমিতির, সভাপতির দায়িত্বেও ছিলেন তিনি।

১৯৪২ সালের ৯ আগস্ট বোম্বাইতে গান্ধীজি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সূচনা করেন। কিন্তু ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় নিজেকে এই আন্দোলনের সামিল করেননি, আবার বিরোধিতাও করেননি। ব্রিটিশ রাজ সরকার তাঁকে গ্রেফতার করেননি। ১৯৪৩ সালে পুনাতে আগা খাঁর প্রাসাদে বন্দী অবস্থায় গান্ধীজি অনশন আরম্ভ করলে ওই প্রাসাদের জেল সুপার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে অনুরোধ করেন গান্ধীজির চিকিৎসায় সাহায্য করতে। বিধান সঙ্গে সঙ্গে পুনা যেতে রাজি হলেন। এই সময় ব্রিটিশ সরকার

* নয়াদিল্লির নেহরু মিউজিয়মে রক্ষিত বি সি রায় পেপারস।

ডাঃ রায়কে কয়েকটি শর্ত পালন করতে বললেন। ওই শর্ত দুটি হল (১) তিনি গান্ধীজির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রতিদিন মেডিকেল বুলেটিন সরকারের অনুমতি নিয়ে প্রকাশ করতে পারবেন এবং (২) আগা খাঁ প্রাসাদে গান্ধীজির স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় তিনি কোন তথ্যাদি পেলে তা রাজনৈতিক প্রচারে ব্যবহার করতে পারবেন না। ডাঃ রায় এই শর্ত দুটি মেনে নিয়েছিল। কিন্তু অন্য একটি শর্ত বিধান মানতে রাজি হলেন না। ওই শর্তটি ছিল ডাঃ রায়কে আগা খাঁ প্রাসাদের আবাসিক হয়ে থাকতে হয়। শেষ পর্যন্ত সরকার আবাসিক হয়ে থাকার শর্তটি তুলে নিলেন। আগা খাঁর প্রাসাদে গান্ধীজির ২১ দিনের এই অনশন নিয়ে অনেক নাটকীয় ঘটনা ঘটেছে। অনশনের ১৩ দিনের দিন গান্ধীজি প্রায় মারা যাচ্ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার গান্ধীজি মারা যাবেন ধরে নিয়ে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীকে চূড়ান্ত সতর্কতায় রেখে দিয়েছিলেন।। সবকার ধরে নিয়েছিলেন যে, গান্ধীজির মৃত্যুর সংবাদ যখনই ছড়িয়ে পডবে, তখনই দেশ জুড়ে হিংসার তাণ্ডব আরম্ভ হয়। এই পরিস্থিতি সম্পর্কে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিজের মন্তব্য হল : "গান্ধীজি ব্রিটিশ সরকার ও মৃত্যু উভয়কেই বোকা বানিয়ে দিয়েছিলেন।" গান্ধীজির জন্য চিকিৎসকদের যে প্যানেল গঠিত হয়েছিল, তাতে বিধান ছাড়া আর যাঁরা ছিলেন, তাঁরা হলেন জেনারেল ক্যান্ডি, (Generel Candy), কর্নেল স (Col. Shaw), কর্নেল ভাণ্ডারি, (Col. Bhandari) ও বোম্বাই'র সার্জেন জেনারেল। তাঁরা সকলেই গান্ধীজির জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে শেষ অস্ত্র হিসাবে গান্ধীজিকে জোর করে গ্লুকোজ ইনজেকশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই প্রস্তাবে বিধান তীব্র আপত্তি জানালেন। তিনি কোনমতেই এধরনের সিদ্ধান্তের শামিল হবেন না। কেবল তাই নয় তিনি সরকারকে কার্যত হুমকি দিলেন যে এক্ষেত্রে গান্ধীজির মৃত্যু হলে তিনি ডেথ সার্টিফিকেটে এ কথাই লিখবেন যে, ডাঃ বি সি রায়ের আপত্তি ও হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও জোর করে গ্লুকোজ ইনজেকশন দেওয়ার জন্য প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে গান্ধীজির মৃত্যু হয়েছে। বিধানের কাছ থেকে ওই কথা শোনার পর, ওই ডাক্তাররা আর এগোতে সাহস পেলেন না। বিধান তখন চার আউন্স লেবুর রস ধীরে ধীরে গান্ধীজির মুখে দিতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর গান্ধীজির অবস্থার উন্নতি হল। প্রায় সারাদিন ধস্তাধস্তির পর রাত কাটিয়ে বিধান আগা খাঁর প্রাসাদ থেকে চলে গেলেন।

১৯৪৫-৪৬ সালে কংগ্রেসের মুসলিম লিগ সম্পর্কিত নীতিতে বিধানচন্দ্র রায় একেবারেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লেন। একমাত্র ডাক্তার হিসাবে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে তাঁর যা সম্পর্ক তার বাইরে আর কোন সম্পর্ক তিনি রাখছিলেন না। তবে ওই সময় জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের তরফ থেকে চীন ও মালয়ে ভারতীয় মেডিকেল মিশনে পাঠানোর ব্যাপারে তাঁর সাহায্য চাইলে তিনি একাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শেষে চীনে ও মালয়ে বিভিন্ন রকমের রোগ ছড়িয়ে পড়ে। ও বহুরোগ বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছিল। চীন থেকে সরকারিভাবে কংগ্রেসের কাছে

চিকিৎসা সাহায্য চাওয়া হয়। নেহরুর অনুরোধ পাওয়ার পর ডাঃ রায় ভারতীয় মেডিকেল মিশনের জন্য অর্থ, ওষুধপত্র এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে থাকেন। ডাঃ অটল ভারতীয় মেডিকেল মিশনের নেতা বলে যে কথা প্রচারিত হয়, তা ঠিক নয়। ডাঃ কোটনিশ এবং ডাঃ অটল এই মিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন। এই মিশনের অন্যতম সদস্য ডাঃ দেবেশ মুখার্জির চীনের ৮ নং রুটের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। ডাঃ দেবেশ মুখার্জিকে একাজে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন বঙ্গ রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্রের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী আস্রাফউদ্দিন আমেদ চৌধুরী। ১৯৩৪ সালে সুভাষচন্দ্র যখন বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি তখন আস্রাফউদ্দিন ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে জওহরলাল নেহরু মালয় সফরে গিয়ে সেখানকার মানুযের অবর্ণনীয় দুর্দশা দেখে আসেন ও ডাঃ রায়কে জানান যে, ভারতীয় জনগণের পক্ষ থেকে বেসরকারিভাবে ওইসব যুদ্ধবিধ্বস্ত আর্ত মানুষের সেবা করা দরকার। মালয়ে যে মেডিকেল মিশনে যায়, তার সামগ্রিক দায়িত্বে ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। তিনি কেবল অর্থ, ওষুধপত্রাদি, চিকিৎসা সরঞ্জাম সংগ্রহের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি, কলকাতা থেকে মালয়ের বিভিন্ন ত্রাণকেন্দ্রে মিশনের লোকেরা কীভাবে যাতায়াত করবেন, সেই ব্যবস্থাও তিনি করতেন। কাজের ব্যাপারে তাঁর ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতা যে প্রবাদের মতো হয়ে ছিল, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। মিশনের সদস্যরা কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন ১৫ই আগস্ট ১৯৪৬ সালে অর্থাৎ মুসলিম লিগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' ও কলকাতার সেই ঐতিহাসিক দাঙ্গার মাত্র একদিন আগে। কলকাতা থেকে মিশনের সদস্যদের নিজ নিজ বাড়িতে ফেরার ব্যবস্থাদিও ডাঃ রায়কে করে দিতে হয়েছিল। ভাবতীয় মেডিকেল মিশন মালয়ে সে অসাধারণ সেবার নজির রেখেছে তার জন্য মালয়ের জনগণ নেহরুর সামনে বিধান রায়েব প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা জানায় এবং ডাঃ রায়ের কাছে মিশনের অ্যাম্বুলেন্স গাড়িগুলি ছেড়ে আসতে অনুরোধ জানায়। বিধান এই অনুরোধ রাজি হয়েছিলেন।

আগেই বলা হয়েছে যে বিধান ১৯৪০ সাল থেকেই নিজেকে কংগ্রেস রাজনীতি থেকে অনেকটা দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন। ফলে সার স্টাফোর্ড ক্রিপসের নেতৃত্বে মিশন যখন ১৯৪২ সালে যখন ভারতে আসে, তখন ওই আলোচনায় বিধানের কোন ভূমিকা ছিল না। আবার ১৯৪৬ সালে যখন ক্যাবিনেট মিশন ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে এলেন, তখনও বিধান নিজেকে দূরেই রাখলেন। মুসলিম লিগ নেতাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাঁর সম্পর্ক বেশ ভাল ছিল। মহম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে বিধানের সম্পর্ক সৌহাদ্যপূর্ণ ছিল। জিন্না বিধানকে কেবল একজন প্রাজ্ঞ ডাক্তার বলেই মনে করতেন না, তিনি তাঁকে একজন ধীরস্থির রাজনীতিজ্ঞ বলেও বিবেচনা করতেন। তবে বিধান কখনই হিন্দুদের থেকে মুসলমানরা আলাদা এক জাতি, মুসলিম লিগের এই তত্ত্বে বিশ্বাস

করতেন না। বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলিতে তিনি যেমন রাজনীতির বাইরে ছিলেন, যুদ্ধ শেষের দিনগুলিতেও তিনি সেই অবস্থানই বজায় রাখলেন। ১৯৪৬ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনে বাংলায় মুসলিম লিগের আধিপত্য স্থাপিত হল এবং হুসেন শাহিদ সুরাবর্দি নেতৃত্বে বাংলায় মুসলিম লিগ ক্ষমতাধীন হল। ওই বছরেই ১৬ আগস্ট মুসলিম লিগের ডাকা 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে' কলকাতায় ও দেড় মাস বাদে নোয়াখালিতে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতিকে পরিবর্তিত করে দিল। অভাবিত দেশভাগ ও স্বাধীনতার সম্মুখীন হল ভারতের জনগণ। ভারতীয় মেডিকেল মিশনের সদস্যদের মালয় থেকে ফিরে এলে তাঁদের যার যার বাড়িতে ফেরার ও তাঁর বাড়ির একতলাতে মিশনের জিনিসপত্র ও উপহার সামগ্রী মজুত করার বন্দোবস্ত চূড়ান্ত করে ডাঃ রায় শিলং চলে যান। এদিকে মেডিকেল মিশনের লোকেরা ১৯৪৬ এর ১৫ আগস্ট কলকাতায় ফেরেন এবং পূর্ব বন্দোবস্ত অনুযায়ী ডাঃ রায়ের বাড়িতে জিনিযপত্র রেখে যে যাঁর গন্তব্যস্থানে চলে যান। এদিকে তারপরের দিনই ১৬ আগস্ট মুসলিম লিগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের' দাঙ্গা। মুসলিম লিগের গুণ্ডারা তাঁর বাড়ির একতলায় দরজা ভেঙে ঢুকে গেল ও হাতের কাছে যা পেল ভাঙ্গতে আরম্ভ করল ও রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলল। মেডিকেল মিশনের রাখা সব জিনিসপত্র, উপহার, সামগ্রী লুঠ করল। মালয়ের চীনারা মেডিকেল মিশনের মারফত একটি বৃহৎ তরবারি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে উপহার দিয়েছিল, সেটিও লুণ্ঠনকারীরা নিয়ে নিল। তারপর আসবাবপত্রে আগুন ধরিয়ে দিল। ডাঃ রায় শিলঙে এই খবর পেয়েই কলকাতার পথে রওনা হলেন। তখনকার দিনে গৌহাটি থেকে কলকাতা আসতে তিনদিন লাগত। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে তাঁর এই তিনদিনের ট্রেন যাত্রার মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছিল বিমান কোম্পানি 'এয়ারওয়েজ ইন্ডিয়া' গঠন করার ধারণা। এটা অনেকটাই ঠিক তাঁর শিলঙে বিদ্যুতের আলোর ব্যবস্থা করার জন্য শিলং ইলেকট্রিসিটি কোম্পানি স্থাপন করার মতো। যাহোক, গৌহাটি থেকে পার্বতীপুর পৌঁছানোর পর অনেক কষ্টে তিনি শিয়ালদামুখী ট্রেনে উঠতে পারলেন। কিন্তু পরের দিন ট্রেন বারাকপুরে এসেই থেমে গেল। কারণ, শিয়ালদা স্টেশন নিরাপদ নয়। স্থানীয় এস ডি ও সব যাত্রীদের বারাকপুর স্টেশনে নেমে যেতে বললেন। ঘটনাচক্রে চব্বিশ পরগনা জেলার ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও বাঙালি এস পি বারাকপুরে হাজির ছিলেন। বিধান জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুরোধ করলেন তাঁকে কোনক্রমে কলকাতার তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, যাত্রীদের মধ্যে ইউরোপিয়ান ও সরকারি অফিসার কেউ হলেই তিনি কেবল তাঁদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই মনোভাব নেওয়া সত্ত্বেও বাঙালি এস পি এগিয়ে এসে ডাঃ রায়কে বললেন যে তিনি তাঁকে পৌঁছে দেবেন। দাঙ্গার সবচেয়ে উপদ্রুত এলাকার মধ্যে ডাঃ রায়ের বাড়ি থাকার ফলে পুলিশ সুপার তাঁর গাড়ি নিয়ে সরাসরি ডাঃ

রায়ের বাড়িতে গেলেন না। তিনি প্রথম আলিপুরে তাঁর সরকারি বাড়িতে গেলেন। তারপর সেখান থেকে মেফেয়ার রোডে তাঁর ভাইয়ের বাড়িতে নামিয়ে দিলেন। কিন্তু ডাঃ রায় কিছুতেই তাঁর বাড়ির দিকে যেতে পারছেন না। তাঁর বাড়ির একাংশ তখনও গুণ্ডারা দখল করে আছে। বেশ কয়েকদিন চেষ্টার পর ডাঃ রায়ের ভাই বাংলার লাট সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিধানের বাড়ির কথা তাঁকে জানান। তখন লাট সাহেবের নির্দেশে পুলিশ বাহিনী গিয়ে ডাঃ রায়ের বাড়ি গুণ্ডাদের কবল থেকে মুক্ত করে। নিজের বাড়িতে ঢুকতে না পেয়েও ভাইয়ের বাড়িতে থেকে বিধান দাঙ্গা দুর্গতদের ত্রাণে আত্মনিয়োগ করেন। কলকাতার রাস্তা থেকে মৃতদেহ অপসারণ করাই ছিল তখন সবচেয়ে দুরুহ কাজ। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের লোকদের নিয়ে বিধান এই কাজগুলি করেছেন। তিনি তাঁর জীবনীকার কে পি টমাসকে বলেন, "একদিন আমাকে একহাজার মৃতদেহ অপসারণের কাজ করতে হয়েছে। একসঙ্গে এত মৃত্যু আমি জীবনে দেখি নি।"

১১

স্বাধীনতার অভ্যুদয় : ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবাংলার কর্ণধার বিধানচন্দ্র

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টের কলকাতা ও অক্টোবরের নোয়াখালি জেলার ঘটনাবলী অবিভক্ত বাংলায় এমন কী সারা ভারতবর্ষে এমন এক তিক্ত ও বিষণ্ণ পরিবেশের সৃষ্টি করল যে সাধারণ ধারণা জন্মাল যে হিন্দু ও মুসলমান আর একসঙ্গে পারবে না। সকলেই ধরে নিল যে, পাকিস্তানের জন্ম অনিবার্য। কলকাতার ভয়াবহ দাঙ্গার পর ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল মুসলিম লিগকে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানে বাধ্য করালেন। এর ফলে কেন্দ্রে জাতির প্রতি দায়বদ্ধ একটি সরকার থাকল বটে, কিন্তু তাতে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি কোন সামগ্রিক উন্নতি হল না। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা লর্ড ওয়াভেলকে সরিয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের ভাইসরয় করে পাঠালেন। আরম্ভ হল কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের সঙ্গে ইংরেজদের ক্ষমতা হস্তান্তরের আলোচনা। কিন্তু ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় নিজেকে দ্রুত ঘটে যাওয়া এই সব ঘটনা ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে নিজেকে দূরেই সরিয়ে রাখলেন। কেবল তাই নয় অবিভক্ত বাংলার শেষে বিধানসভায় বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়ে যাওয়ার পরও বিধানচন্দ্র রায় কিরণশঙ্কর রায়কে নিয়ে ১৯৪৭ সালের জুন মাসে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করে বঙ্গ বিভাগের সিদ্ধান্ত পুর্নবিবেচনার আবেদন রেখেছিলেন। (১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট সকালে ডাঃ

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের মুখমন্ত্রী বা 'প্রিমিয়ার' হলেন। তখনকার শাসনতন্ত্রে মুখ্যমন্ত্রীর পদটির নাম ছিল 'প্রিমিয়ার' (Premier)। প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রিসভার তালিকায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নাম ছিল দুই নম্বরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে। বিধান তখন আমেরিকায় ও ভারত সরকার তাঁকে রাষ্ট্রপুঞ্জ ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরূপে মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ কলহ ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পদত্যাগ করতে হল। কংগ্রেস পরিষদীয় দল ডাঃ ঘোষের স্থলে বিধানচন্দ্র রায়কে দলের নেতা নির্বাচিত করল। বিধান তখন দিল্লি ফিরে এসেছেন। এ প্রসঙ্গে পিছনের কথা আর একটু বলা দরকার। ১৯৪৭ সালের জুন মাসের শেষ বিধান চোখের চিকিৎসার জন্য প্রথম ইউরোপ ও পরে আমেরিকা যান। যাওয়ার আগে তিনি দিল্লিতে গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করেন। জুলাই মাসে তিনি আমেরিকার চোখের অপারেশন করালেন। ওই সময় নেহরু বিধানকে যুক্তপ্রদেশের (বর্তমানের উত্তরপ্রদেশ) গভর্নর করতে তাঁর কাছে বার্তা পাঠালেন। তিনি নেহরুকে জানালেন যে, তাঁর চোখের অপারেশনের তার জন্য তাঁকে কয়েকমাস সেখানেই থাকতেই হবে। সুতরাং তাঁর পক্ষে এখনই দেশে ফিরে গিয়ে কোন দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়। এভাবেই তিনি নেহরুর প্রস্তাব আপাতত নাকচ করে দিলেন। সরোজিনী নাইডু যুক্তপ্রদেশের অস্থায়ী গভর্নর হলেন। ১৯৪৭ সালের ২ নভেম্বর বিধান রায় দেশে ফিরে আসেন। ফিরে এসেই জানতে পারলেন যে, গভর্নর হিসাবে তাঁর নিয়োগ যেহেতু ভাইসরয়ের সুপারিশে সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ অনুমোদন করেছেন, সেহেতু তাঁর নিয়োগ বাতিল হয়নি। এদিকে সরোজিনী নাইডুর ওই পদটিকে ভাল লেগেছে শুনে বিধান নিশ্চিন্ত হলেন এই ভেবে যে তাহলে সেক্ষেত্রে তাঁর পদত্যাগ করা খুব সহজ হবে। তিনি জওহরলাল নেহরুকে জানালেন যে তিনি ওই পদ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করবেন। পদত্যাগ করে তিনি গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে গেলে, গান্ধীজি তাঁকে রসিকতা করে বললেন, "সে কি আপনি গভর্নরের পদগ্রহণ করতে রাজি হলেন না। আমি ভেবেছিলাম আপনাকে ইওর এক্সিলেন্সি বলে ডাকার সুযোগ পাব, তা আর হতে দিলেন না।" ডাঃ রায় হেসে জবাব দিলেন, "গান্ধীজি, আমি আপনাকে আরও ভাল বিকল্প দিতে পারি। আমি পদবীতে 'রয়', আপনি আমাকে 'রয়্যাল' বলতে পারে এবং যেহেতু আমি অনেকের চেয়ে লম্বা, সেহেতু আপনি আমাকে 'রয়্যাল হাইনেস'ও বলতে পারেন। সেটা কিন্তু যথার্থই হবে।" এদিকে সরোজিনী নাইডুকে পাকাপাকি যুক্তপ্রদেশের গভর্নর করতে হলে নতুন করে সম্রাটের কাছে প্রস্তাব পাঠাতে হবে এবং সেই সঙ্গে বিধানের পদত্যাগ তাঁকে দিয়ে অনুমোদন করাতে হবে। এতে কিছুটা সময় চলে গেল। ডিসেম্বর মাসে (১৯৪৭) বিধান দিল্লি গিয়ে তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও কেন্দ্রীয় শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন। শ্যামাপ্রসাদ বিধানকে

জানালেন যে, বাংলা বিধানসভায় তাঁর সদস্যপদ থেকে তিনি পদত্যাগ করেননি। শ্যামাপ্রসাদ ১৯৪৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজুয়েট নির্বাচন কেন্দ্র থেকে এম এল এ হয়েছিলেন। তিনি বিধানের জন্য ওই নির্বাচনকেন্দ্র ছেড়ে দিতে রাজি। বিধান বললেন তিনি রাজি। কেবল একটিমাত্র শর্তে। শর্তটি হল, স্বাস্থ্যের কারণে শ্যামাপ্রসাদ যদি বঙ্গ রাজনীতিতে ফিরে আসতে চান, তখন বিধান ওই কেন্দ্রটি থেকে পদত্যাগ করবেন।। বিধানের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের বন্ধুত্ব এমনই ছিল যে, দুজনেই সঙ্গে সঙ্গে ওই শর্তে রাজি হলেন। ইতিমধ্যে বিধান ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মন্ত্রিসভায় যোগদানের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিলেন। তখন ডঃ ঘোষ তাঁর মন্ত্রিসভার রদবদল ঘটালেন এবং এর ফলে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সবচেয়ে প্রভাবশালী "হুগলি গোষ্ঠী" ডঃ ঘোষের উপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হল। এই সময়ে ওই গোষ্ঠীর কয়েকজন নেতা দিল্লিতে বিধানের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে প্রাদেশিক রাজনীতিতে ফিরে আসতে অনুরোধ করেন। বিধান তাতে সম্মতি দেন। ফলে ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের বিকল্প খুব দ্রুত গড়ে উঠল।

মুখ্যমন্ত্রিত্বের প্রথমদিন থেকেই ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সুস্থির অবস্থায় ছিলেন না। গোঁড়া গান্ধীবাদী এই লোকটি কখনই আদর্শের সঙ্গে আপস করেননি ও অত্যন্ত স্পষ্টবাদিতা ও খর রসনার জন্য শত্রুব্যূহকে শক্তিশালী করে ফেলেছিলেন। তাঁর, আর একটা বড় অসুবিধা ছিল যে, দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত তিনি কখনই পরিষদীয় রাজনীতি করেননি। আর যেহেতু তিনি পূর্ববঙ্গের লোক, সেহেতু পশ্চিমবঙ্গে তাঁর সমর্থনভিত্তিক কোন জেলা ছিল না। ফলে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর যখন এম এল এ হওয়া দরকার হয়ে পড়ল। তখন কলকাতা ও কাছাকাছি কোন জেলারই কংগ্রেস এম এল এ ডঃ ঘোষের জন্য আসন ছাডতে রাজি হলেন না। শেষ পর্যন্ত বীরভূমের কংগ্রেস নেতা খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সিউড়ি বিধানসভার আসন ছেড়ে দিলে সেখান থেকে ডঃ ঘোষ সেখান থেকে দাঁড়ান ও খগেন্দ্রবাবুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ওই কেন্দ্রের উপনির্বাচনে জয়ী হন। এর মধ্যে ডঃ ঘোষ তাঁর মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য সরবরাহ মন্ত্রী রাধানাথ দাসকে দুর্নীতির অভিযোগে পদত্যাগে বাধ্য করলে কংগ্রেসের 'হুগলি গোষ্ঠীর' সঙ্গে তাঁর সম্মুখ সংঘর্ষ আরম্ভ হল। এদিকে দেশবিভাগ জনিত উদ্বাস্তু আগমন, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার পরিবেশ ও সেইসঙ্গে কমিউনিস্টদের অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপে প্রদেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছিল। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য ১৯৪৭ এর ডিসেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভায় সিকিউরিটি বিল বা নিরাপত্তা বিল পেশ করলেন। কমিউনিস্টরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ল ও কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী এটা গোপনে ডঃ ঘোষের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে লাগল। বিধানসভায় নিরাপত্তা বিল নিয়ে যখন আলোচনা চলছে, তখন এক বিক্ষোভ মিছিল ১৪৪ ধারা অমান্য করে বিধান সভার চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়ে। এই সময় পুলিশের গুলিতে

একজনের মৃত্যু হয়। এই ঘটনাটি ঘটে ১৯৪৭ সালের ১০ ডিসেম্বর। ডঃ ঘোষ এ সম্পর্কে বিধানসভায় বিবৃতি দিয়ে বলেছেন "হিংসাত্মক পন্থায় ক্ষমতা দখল করার জন্য এটা এক সুপরিকল্পিত চক্রান্ত।" কিন্তু কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ এম এল এ'রা ওই গুলিবর্ষণের নিন্দা করে। তাঁরা কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে এমন অভিযোগ করেন যে, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ কংগ্রেসকে জনগণের কাছে অপ্রিয় করে তুলছে। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কলকাতায় ছুটে আসেন ও প্রদেশের কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে কথাবার্তা হলেন। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি বিধান সভায় নিরাপত্তা বিল পাস হল বটে। কিন্তু সেইসঙ্গে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের প্রস্থানের পথ দ্রুততর হল। এর পর পরই কংগ্রেস এম এল এ-দের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ লিখিতভাবে ডঃ ঘোষকে জানালেন যে, তাঁর নেতৃত্বের প্রতি তাঁদের আস্থা নেই। তাঁরা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে তাঁদের নেতা হিসাবে চান। ডঃ ঘোষ এই চিঠি পাওয়ার পর পরিষদীয় দলের জরুরি সভা ডেকে দল নেতা হিসাবে তাঁর পদত্যাগ পেশ করেন।

এখানে একটা প্রশ্ন অনিবার্যভাবেই উঠতে পারে যে তাহলে কী বিধান আগে থেকেই জানতেন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে সরানোর প্রক্রিয়া চলছে। সেজন্যই তিনি যুক্তপ্রদেশের গভর্নরের পদ গ্রহণ করেননি। তবে বিধানের যে রাজনৈতিক পরিচয় দেশবন্ধুর আমল থেকে বঙ্গরাজনীতিতে রয়েছে তাতে ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতি তাঁর মানসিকতার পরিপন্থী। এই সব ঘটনাবলী ঘটে যাওয়ার প্রায় ত্রিশ বছর পর ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তাঁর স্মৃতিকথা 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে তাঁকে অপসারণের চক্রান্তের জন্য জি ডি বিড়লাকে দায়ী করেছেন। ওই সময়কার ঘটনাবলীর এক প্রামাণ্য ইতিহাস লিখেছেন প্রবীণ সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত তাঁর 'বঙ্গ সংহার এবং' গ্রন্থে। তিনি ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে (পৃষ্ঠা ৯৪-৯৫) বলেছেন "...এরপর ডিসেম্বর মাসে একদিন ঘনশ্যাম দাস বিড়লা কংগ্রেস এম এল এ-দের অর্ধেকের বেশি ৩৪ জনের দস্তখত সহ একখানি কাগজ নিয়ে এসে ৮ নং থিয়েটার রোডে আমাকে দেন। তাতে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিল না। শুধু শাসন ব্যবস্থা ভাল করে পরিচালনার জন্য নেতার পরিবর্তন দরকার এবং তাঁরা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে নেতা করতে চান।" পদত্যাগের প্রায় দশবছর পর ১৯৫৭ সালে সাধারণ নির্বাচনের সময় কৃষক প্রজা মজদুর পার্টির নেতা ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (১৯৫০-এর শেষে ডঃ ঘোষ সহ একদল গান্ধীবাদী নেতা কংগ্রেস ছেড়ে নতুন দল গঠন করেছিলেন) তার ব্যাপারে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উদঘাটন করেন। তাঁকে লেখা গান্ধীজির একটি চিঠি হল ওই তথ্য। ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস বাংলা বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করার সময় ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী (প্রিমিয়ার) মনোনীত হলে গান্ধীজি তাঁকে একটি চিঠি দেন দিল্লি থেকে। চিঠিটা হিন্দিতে লেখা। চিঠিটির বাংলা ভাষান্তর করলে এরূপ দাঁড়ায় যে,—"সর্দার আমাকে এই এত্তেলা

পাঠিয়েছে যে, আপনার মন্ত্রিসভায় বদ্রিপ্রসাদ গোয়েঙ্কা বা দেবীপ্রসাদ খৈতানের স্থান হোক। আমার মনে হয় যে, এ করা উচিত, না করা অনুচিত।" চিঠিতে গান্ধীজি ডঃ ঘোষকে সম্বোধন করেছিলেন 'চিরঞ্জীব প্রফুল্ল' বলে। ডঃ ঘোষ এই চিঠি প্রকাশিত করে সাংবাদিক সম্মেলনে সেই সময় বলেছিলেন যে, বিড়লা ও সর্দার প্যাটেল গান্ধীজিকে দিয়ে তাঁকে এ চিঠি লেখান। কিন্তু তিনি বিড়লাও সর্দার প্যাটেলের মনোমত কাজ করেননি বলে তাঁকে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে যেতে হয়েছিল। এই চিঠি খবরের কাগজে প্রকাশের পর প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষ ডঃ ঘোষের কড়া সমালোচনা করে একথা বলেছিলেন যে, ডাঃ রায়ের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ফায়দা তুলবার জন্য তিনি গান্ধীজির ওই চিঠি ব্যবহার করেছেন, কারণ 'গান্ধীজি পরে ওই চিঠি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।' (১৯৫৭ সালে নির্বাচনের সময় বামপন্থীরা ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে বিকল্প সরকার গড়ার ডাক দিয়েছিল)। যাহোক ডাঃ রায়ের দীর্ঘদিনের সহকারী সরোজ চক্রবর্তী তাঁর "মুখ্যমন্ত্রিদের সঙ্গে" গ্রন্থটিতে (পৃষ্ঠা ৬৭) এই ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন যে, দেশবিভাগের পর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আমেরিকা থেকে দিল্লি ফিরলে প্রধানমন্ত্রী নেহরু তাঁর বাড়িতে গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও তাঁর পত্নীর সম্মানে এক অভ্যর্থনার আয়োজন করেন। দিল্লিতে থাকার দরুন ডাঃ রায় ওই অভ্যর্থনার যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ পান। সেখানে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেশবিভাগজনিত পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাবলী নিয়ে মত বিনিময় করেন। ডাঃ রায়ের দৃষ্টিভঙ্গীতে মাউন্টব্যাটেন চমৎকৃত হন এবং শোনা যায় যে মাউন্টব্যাটেন জওহরলাল নেহরুকে এমন কথা বলে যে, ডাঃ রায়কে যুক্তপ্রদেশের গভর্নর করে না পাঠিয়ে তাঁকে সমস্যাজর্জর পশ্চিমবঙ্গের জন্য ব্যবহার করা উচিত। এদিকে গান্ধীজি ১৯৪৮ সালের জানুয়ারির গোড়াতেই তাঁর জীবনের শেষ অনশন আরম্ভ করলেন। বিধানকে অবিলম্বে দিল্লি পৌঁছানোর জন্য জরুরি তলব এল। ১২ জানুয়ারির (১৯৪৮) বিধান দিল্লির বিমান ধরার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, এই ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তাঁকে ফোন করে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সিদ্ধান্তের কথা জানালেন। ডঃ ঘোষ তাঁকে যত দ্রুত মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য অনুরোধ করলেন। বিধান ডঃ ঘোষকে বললেন যে, তিনি এক্ষুনি দিল্লি রওনা হচ্ছেন। সুতরাং এই মুহূর্তে তিনি কবে কী করবেন বলতে পারছেন না। ১৮ জানুয়ারি গান্ধীজি দিল্লিতে অনশন ভাঙলে বিধান তাঁকে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের প্রস্তাবের কথা জানালেন। গান্ধীজি বিধানকে কংগ্রেস দলের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পরামর্শ দিলেন ও তাঁকে বললেন, "আপনি পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি প্রথম শ্রেণীর মন্ত্রিসভা গড়ার চেষ্টা করুন। কে কংগ্রেসের প্রতি কতখানি অনুগত এটার চেয়ে কার যোগ্যতা ও প্রতিভা কতখানি সেটা যেন আপনার মন্ত্রী নির্বাচনের মাপকাঠি হয়।" বিধান দ্রুত কলকাতা ফিরে এসে কংগ্রেস

পরিষদীয় দলের ও প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতৃত্বকে বললেন যে, মন্ত্রী নির্বাচনে তিনি নিজের মতামতকে অগ্রাধিকার দেবেন, অন্যদের টানাপোড়েনকে নয়। তিনি তাঁদের একথাও জানালেন "আমি সুভাষের জন্মদিনে শপথ নেব।" ১৯৪৮ সালের ২৩ জানুয়ারি সকাল সোয়া নটায় তিনি গভর্নরের প্রাসাদে গভর্নর চক্রবর্তী রাজগোপালাচারীর কাছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রগুপ্তি ও আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেন। এই দিন থেকে সূচনা হল পশ্চিমবঙ্গের এক গৌরব উজ্জ্বল অধ্যায়ের। সে অধ্যায় চতুর্দশবর্ষ ধরে শিল্পে, উন্নয়নে, ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষাপ্রসারে সমৃদ্ধিতে ও রাজনৈতিক আধিপত্যে পশ্চিমবঙ্গকে দেশের শীর্ষ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল এবং এই শ্রেষ্ঠত্ব অব্যাহত ছিল ১৯৬২ সালের পয়লা জুলাই পর্যন্ত।

১২

পশ্চিমবাংলার পুনর্নির্মাণ ও রূপায়ন (১৯৪৮-৫২)

বিধান যখন প্রধানমন্ত্রিত্বের* দায়িত্ব নিলেন, তখন তাঁর প্রায় ৬৬। ভারতবর্ষের চিকিৎসা জগতের নেতৃত্ব তিনি বলতে গেলে যুবক বয়সেই পেয়েছেন। পরিণত বয়সে তাঁর কাছে চলে কলকাতার মেয়রের পদটি। তারপর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের পদ তাঁর কাছে আসে অনেকটা যেন মিছিল করে এবং ওইগুলি অনায়াসলব্ধ। তাঁর এই গৌরব উজ্জ্বল জীবনের শেষ মনিহার অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রিত্বের পদ যখন তিনি গ্রহণ করলেন তখন তিনি বার্ধক্যের দরজায় পা দিয়েছেন। কিন্তু অন্তরে এক প্রদীপ্ত যৌবনের দীপশিখা নিয়ে তাঁর জীবনের সব স্বপ্ন পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে উজাড় করে দিয়েছেন দীর্ঘ প্রায় পনেরো বছর। ২৩ জানুয়ারি তাঁর সঙ্গে আর যাঁরা শপথ নিলেন, তাঁরা ছিলেন নলিনীরঞ্জন সরকার, রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরি, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, ভূপতিচরণ মজুমদার, বিমলচন্দ্র সিংহ, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, মোহিনীমোহন বর্মণ, কালিপদ মুখার্জি, যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, ও হেমচন্দ্র নস্কর। ডাঃ রায় গভর্নরের কাছে মন্ত্রিমণ্ডলীর যে তালিকা পেশ করেছিলেন, তাতে দু'নম্বর স্থানে ছিল ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নাম ও তাঁকে স্বরাষ্ট্র দফতর দেওয়া হয়েছিল। ডঃ ঘোষ তখন দিল্লিতে। দিল্লি থেকে ফিরে তিনি ডাঃ রায়কে লিখিতভাবে ওই মন্ত্রিত্ব গ্রহণে তাঁর অক্ষমতা জানালেন। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন।

* ১৯৫০ সালের সংবিধান প্রবর্তন হওয়া অবধি প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী বা Premier বলা হত।

"সেদিন ওই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে যে কাজ করেছি, তা আজও মনে হয় ঠিকই করেছি।" শপথ গ্রহণের পর বিধান সরাসরি রাইটার্স বিল্ডিংয়ে চলে এলেন। বিধান মুখ্যমন্ত্রিত্বের আসনে বসার আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা দ্রুত খারাপের দিকে যাচ্ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বিপর্যস্ত অর্থনীতি ও ভয়াবহ মন্বন্তরের (১৯৪৩) অভাবের ছায়া, ও তদুপরি ১৯৪৬-৪৭ সালের সাম্প্রদায়িক পরিণতিতে দেশবিভাগ ও উদ্বাস্তু আগমন রাষ্ট্রতরণীকে টলমল করে তুলেছিল। মানুষের জীবনের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় পণ্যের অভাব ছিল দুর্বিষহ। ধুতিবস্ত্র এমন কী গামছা পর্যন্ত রেশনের দোকানে লাইন দিয়ে কিনতে হত। এমন একটা ভয়ংকর বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সাতদিনের মাথায় গান্ধীজি দিল্লিতে আততায়ীর হাতে নিহত হলেন। তাঁর কাছে এটা ছিল একটা বড় ব্যক্তিগত শোক, কারণ তিন তিনটি যুগ ধরে তিনি মহাত্মা গান্ধীর খুব কাছের মানুষ ছিলেন। গান্ধী হত্যার পর প্রদেশে সাম্প্রদায়িক বিশৃংখলা দমনের জন্য তিনি দ্রুত কড়া ব্যবস্থা নিয়ে তিনি আর-এস-এস, মুসলিম ন্যাশন্যাল গার্ড, খাকসার পার্টি-সহ সাম্প্রদায়িক দলগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। ব্যাপক পুলিশি বন্দোবস্ত করে বহু সন্দেহ-ভাজন লোকদের ধরপাকড় করা হল। এরপর ব্যারাকপুর গঙ্গারঘাটে তিনি সেদিন গান্ধীজির চিতাভস্ম পবিত্র গঙ্গায় বিসর্জন দিলেন সেদিন গঙ্গার দুই পাড়ে প্রায় দশ লাখ মানুষ দাঁড়িয়ে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কথা শুনেছিলেন। এই অনুষ্ঠান থেকে ফিরে এসে তিনি জওহরলাল নেহরুকে একটি আবেগময় দীর্ঘ চিঠি লেখেন। ওই চিঠিতে ডাঃ রায় বলেছেন : আজ বাংলায় বারাকপুরে গঙ্গার পবিত্র জলে গান্ধীজির দেহাবশেষ বিসর্জন অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। দশ লাখেরও বেশি লোক গভীর শ্রদ্ধায় এই পবিত্র অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছে। আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে এটা বিপদের দিনও বটে। আমি বলেছি পরলোকে চলে যাওয়া গান্ধীজির আদর্শ ও চিন্তাধারা এই অগণিত মানুষের শ্রদ্ধার মধ্য দিয়ে দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে যাবে। তিনি আমাদের মধ্যে নেই, একথাটা বলা বোধ হয় আমার ভুল হয়েছে। কারণ তিনি তো আমাদের মধ্যে প্রতিনিয়ত আছেন। যতদিন মানুষের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রাখব, ততদিন তিনি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। এলাহাবাদের সঙ্গমে তাঁর চিতাভস্ম বিসর্জন অনুষ্ঠানে আপনার কথা আমি রেডিওতে শুনেছি। শুনে মনে হয়েছে আমরা সকলেই এক অনুভূতির দ্বারা পরিচালিত।

কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্ঘাত ও নৈরাজ্য

স্বাধীনতা ও দেশবিভাগের অব্যবহিত পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও সক্রিয় কর্মীরা প্রদেশের আইন শৃংখলাকে আঘাত করতে আরম্ভ করল। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কংগ্রেস সরকারের নেতৃত্ব গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আক্রমণের ক্ষেত্র প্রসারিত ও তীব্রতর হল। ওই সময় ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পার্টি কংগ্রেস ডাকা হল কলকাতার। উত্তর কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে 'রেড গার্ড'দের মিছিল ও সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজের মধ্যে দিয়ে পার্টি সম্মেলনের সূচনা হল। তখন পর্যন্ত নিজাম শাসিত হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানায় পার্টির নেতৃত্বে সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন চলছে। ওই পার্টি কংগ্রেসে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ করে চীন, বর্মাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার জঙ্গি নেতারা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা "অবিলম্বে প্রদেশে রক্তাক্ত বিপ্লব" শুরু করার আয়োজন করতে বললেন। এই পার্টিতে কংগ্রেসেই অপেক্ষাকৃত নরমপন্থী বলে বিবেচিত পি সি যোশিকে অপসারিত করে কট্টরপন্থী হিংসাত্মক আন্দোলনের প্রবক্তা বি টি রনদিভেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান হিসাবে নির্বাচিত করা হল। দেশবিভাগে বিপর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গে 'এখনই বিদ্রোহ' সংগঠিত করার ডাক দিয়ে পার্টি কংগ্রেসে প্রস্তাব গৃহীত হল। সম্প্রতি প্রকাশিত "বঙ্গ সংহার এবং" গ্রন্থে লেখক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত ওই পার্টি কংগ্রেসের আনুপূর্বিক বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই গবেষণামূলক গ্রন্থটির একাংশে বলা হয়েছে যে, "...মহম্মদ আলি পার্কে অনুষ্ঠিত এই দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে এই গণসঙ্গীত গাওয়া হয়েছিল

'দেখছো কি হে
দেখছো কী
বাংলা বানাব তেলেঙ্গানা

সম্মেলনের শেষ দিনে 'রেড গার্ড সদস্যরা কলকাতার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে নিষ্প্রদীপ করে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী মশাল মিছিল বের করে।... এই পার্টি কংগ্রেস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাওড়া, হুগলির, কলকাতার শিল্পাঞ্চলে, চব্বিশ পরগণা, বর্ধমানের গ্রামাঞ্চলে আইন শৃঙ্খলা ভয়ানকভাবে বিঘ্নিত হতে আরম্ভ করে...।" কলকারখানার শ্রমিক ও পূর্ব বাংলা (পূর্বপাকিস্তান) থেকে আসা উদ্বাস্তুদের দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি পরীক্ষামূলক বিদ্রোহ চালাতে লাগল। অন্যদিকে সুন্দরবনের কাকদ্বীপ ও অঞ্চলে গুপ্ত কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত করতে লাগল। এই পরিস্থিতির মধ্যে বিধানচন্দ্র রায় একদিকে দৃঢ় মনোভাব ও অন্যদিকে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি এমন একজন সহকর্মী খুঁজছিলেন যিনি নির্ভীক বিদগ্ধ, বুদ্ধি ও রাজনৈতিক চাতুর্যে ক্ষুরধার। অনিবার্যভাবে তাঁর নজর গেল তাঁরই দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত বন্ধু কিরণশঙ্কর রায়ের উপর। দেশবিভাগে বিষণ্ণ ও ব্যথিত কিরণশঙ্কর

রায় গান্ধীজীর নির্দেশে পূর্ববঙ্গে চলে যান। সেখানে তিনি পূর্ববঙ্গ আইন সবায় কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা এবং পাকিস্তান গণপরিষদে বিরোধী দলের নেতার পদে মনোনীত হন। বিধানচন্দ্র রায়ের অনেক অনুরোধের পর কিরণবাবু কলকাতায় ফিরে আসতে রাজি হন এবং ১৯৪৮ সালের ৫ মার্চ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। ওই দিনই কয়েকটি বণিকসভা গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে কিরণশঙ্কর রায়কে এক সংবর্ধনা দেয়। ওই সংবর্ধনার উত্তরে কিরণশঙ্কর রায় যা যা বলেছেন, তাঁর উল্লেখ করেছেন প্রবীণ সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত তাঁর 'বঙ্গ সংহার এবং' গ্রন্থে। "কিরণবাবু দেশ বিভাগের পর নবগঠিত প্রদেশের আইন শৃংখলাজনিত অশান্ত পরিস্থিতির উল্লেখ করেন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির নাম না করে বলেন, কোন কোন মহল বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে। প্রদেশে শান্তি বজায় রাখতে না পারলে কলকারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হবে।..." কিরণবাবু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের তিন সপ্তাহের মধ্যে ২৫ মার্চ (১৯৪৮) পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ সংগঠন বলে ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার মতো কঠোর সিদ্ধান্তের বিরোধী ছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিগণ এই মর্মে একটি সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন। কিন্তু বিধান ও কিরণশঙ্কর নেহরু-সহ কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে বুঝিয়েছিলেন যে খোলাখুলিভাবে নাশকতা ও বিদ্রোহে উস্কানি দেওয়া পার্টিকে মোকাবিলা করতে গেলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। এই প্রসঙ্গে নেহরুর বক্তব্য ছিল এই যে, যে পার্টি মূলত গুপ্ত সংগঠনের দ্বারা চালিত ও গুপ্ত সন্ত্রাসে বিশ্বাসী, সেই পার্টিকে নিষিদ্ধ করে, কতটুকু কাজ হবে? বরং এই সুযোগে নিজেদের দেশদ্রোহী ও সন্ত্রাসবাদীর আড়াল করে দেশহিতৈষী ও শহীদের মুখোশ পরতে চাইবে। কিন্তু বিধান রায় নেহরুর ওই মতবাদ মানলেন না। বিধানসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে কিরণশঙ্কর রায় কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে বলেছিলেন, "কমিউনিস্টরা জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে হিংসাত্মক পন্থায় পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখল করতে চাইছে। তারা গ্রামেগঞ্জে মানুষদের আইন-শৃংখলা ভাঙতে ডাক দিচ্ছে। শ্রমিকদের শিল্প কারখানার মালিকদের আক্রমণ করে উৎপাদন ব্যাহত করতে উস্কানি দিচ্ছে। এবং বেআইনি অস্ত্র আমদানি করে পশ্চিমবঙ্গকে কমিউনিস্টদের নাশকতামূলক অভিসারের ঘাঁটিতে পরিণত করতে চাইছে।" কিন্তু ডাঃ রায়ের এমন একজন বন্ধু ও সহকর্মী কিরণশঙ্কর রায় বেশিদিন বাঁচলেন না। পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার এক বছরের মধ্যে তিনি অসময়ে অকস্মাৎ মারা গেলেন। কিরণবাবু বিধান রায় মন্ত্রিসভার প্রধান স্তম্ভ ছিলেন। প্রশাসনিক দক্ষতায় তিনি ছিলেন ডাঃ রায়ের রাজনৈতিক শক্তির একটি বড় উৎস।

দু বছরেরও কিছু বেশি সময় কমিউনিস্ট পার্টির উপর এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ

ছিল। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের নতুন সংবিধানকে গৃহীত হওয়ার পর সংবিধানের মৌলিক অধিকার অনুচ্ছেদের অধীনে কলকাতা হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন পেশ করা হয়। নয়া সংবিধানিক আইনে হাইকোর্ট কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণার আইন সংবিধান বহির্ভূত বলে রায় দেন। এই রায়ের ফলে কমিউনিস্ট পার্টি আবার প্রকাশ্যে তার রাজনৈতিক কার্যকলাপ আরম্ভ করে। কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ডাঃ রায়ের ওই পার্টির প্রতি কোন প্রতিহিংসা পরায়ণতা ছিল না। আত্মগোপন করা ও কারারুদ্ধ নেতাদের অনেকের সঙ্গেই তাঁর যোগাযোগ ছিল। বিশেষ করে বঙ্কিম মুখার্জি ও সোমনাথ লাহিড়ীকে তিনি খুব পছন্দ করতেন। ১৯৩০-৩১ সালে বিধান যখন মেয়র তখন ওঁরা দুজনেই ছিলেন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কর্মকর্তাদের মধ্যে। সুভাষচন্দ্র যখন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, তখন বঙ্কিম মুখার্জি ছিলেন একজন সহ-সভাপতি ও সোমনাথ লাহিড়ী সম্পাদকদের একজন। তাঁর নিজের ভাইঝি রেণু চক্রবর্তী (মেজদা সাধন রায়ের মেয়ে) ও তাঁর স্বামী নিখিল চক্রবর্তী আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট নেতাদের মধ্যে ছিলেন। ডাঃ রায় নিয়মিত এঁদের খবর রাখতেন। জ্যোতি বসুর পিতা তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু থাকার ফলে ডাঃ রায় কারারুদ্ধ জ্যোতিবাবুর খবরাখবর নিতেন।

ইতিমধ্যে কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে শৃংখলাহীনতা ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বিধানের সমস্যা বাড়ায়। বিধান এর একটা স্থায়ী বিহিত করতে চাইছিলেন। কংগ্রেস পরিষদীয় দলের চিফ হুইপ অমরকৃষ্ণ ঘোষ একদল বিক্ষুব্ধ এম এল এ-দের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। এই অমরকৃষ্ণ ঘোষই ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার কলকাঠি নেড়েছিলেন। তিনিই আবার বিধান রায়ের বিরুদ্ধে কলকাঠি নাড়তে আরম্ভ করলেন। বিধানবাবু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার তিনমাসের মধ্যে এপ্রিলে (১৯৪৮) কয়েকজন এম এল এ স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়কে দিলেন। ওই স্মারকলিপিতে একথা বলা হয়েছে, রায় মন্ত্রিসভা খাঁটি কংগ্রেসি মন্ত্রিসভা নয়, কারণ এই মন্ত্রিসভায় এমন কিছু বাইরের লোক আছে যাঁদের সঙ্গে কংগ্রেসের নামগন্ধ নেই। ডাঃ রায় জানতে পারলেন যে এবার অমরকৃষ্ণ ঘোষ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষকে দিয়ে তাঁকে সরাতে চাইছেন। ২২ এপ্রিল (১৯৪৮) ওই দলভুক্ত কয়েকজন এম এল এ ও এ আই সি সি সদস্য বোম্বাইতে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে দেখা করে পশ্চিমবঙ্গে নেতৃত্বের বদল ও একটি খাঁটি কংগ্রেসি মন্ত্রিসভা গঠনের দাবি জানালেন।

বিধান ব্যাপারটা জেনে ফেললেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাঘাত করলেন। ২২ এপ্রিল (১৯৪৮) তিনি এক বিবৃতিতে জানালেন যে, প্রধানমন্ত্রীর কাছে দেওয়া স্মারকলিপির স্বাক্ষরকারীদের একজন তাঁর স্বাক্ষর প্রত্যাহার করে নিয়েছেন এবং বোম্বাইতে যে সব কথাবার্তা হয়েছে তা তাঁকে জানিয়েছে। এছাড়া নির্দল দু'জন এম

এল এ বর্ধমানের মহারাজা উদয়চাঁদ মহাতব ও প্রভু দয়াল হিম্মৎশিংকা কংগ্রেসের প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করে কংগ্রেস সদস্য হয়ে গিয়েছেন। ৫ মে ডাঃ রায় তাঁর বাড়িতে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের এক জরুরি বৈঠক ডাকলেন। বৈঠকে উপস্থিত ৫৩ জন এম এল এ'র মধ্যে ৩১ জন বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বের প্রতি তাঁদের আস্থা ব্যক্ত করলেন। বিক্ষুব্ধ কয়েকজন মন্ত্রী এই বৈঠকে যোগ দিলেন না। বাদ বাকি এম এল এ'রা বুঝতে পারলেন যে তাঁরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছেন। তাঁরা তখন আগেকার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নতুন করে পারস্পরিক আলোচনার প্রস্তাব দিলেন। বিধান তখন 'বিদ্রোহ' নির্মূল করার পদক্ষেপ নিলেন। তিনি ভূপতি মজুমদার, হেমচন্দ্র নস্কর ও মোহিনীমোহন বর্মনকে বাদ দিয়ে মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন করলেন। বরখাস্ত মন্ত্রিরা ছুটে গেলেন ডাঃ রায়ের কাছে এবং লিখিতভাবে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেন। কয়েকদিন পরে ডাঃ রায় তাঁদের আবার মন্ত্রিত্বে ফিরিয়ে নিলেন। এর কয়েক মাস পরে মন্ত্রী মোহিনীমোহন বর্মন তাঁর নিরাপত্তা রক্ষীর গুলিতে নিহত হলেন। বিক্ষুব্ধ ও বিরোধী হয়ে রইলেন কেবল গান্ধীবাদী 'অভয় আশ্রম' গোষ্ঠীর কয়েকজন এম এল এ, যাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। এক বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের শেষভাগে কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচনে ডাঃ রায় এক ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেস গড়ে তোলার প্রয়াস নিলেন। সাংগঠনিক নির্বাচনে হুগলি গোষ্ঠীর নেতা অতুল্য ঘোষ ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বাধীন 'অভয় আশ্রম' গোষ্ঠীর সমর্থকদের হারিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। কংগ্রেস সংগঠনের এই পরিবর্তন ডাঃ রায়কে একদিকে স্বস্তি দিল এবং অন্যদিকে প্রশাসনিক ও উন্নয়নের কাজে নিরুদ্বিগ্ন মনসংযোগের পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। ১৯৫০ সালের শেষদিকে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে কৃষক প্রজা মজদুর পার্টি নামে নতুন দল গঠন করলেন। ফলে কংগ্রেসের মধ্যে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর অস্তিত্ব আর রইল না। এদিকে কমিউনিস্টদের কার্যকলাপও প্রতিদিন কলকাতার শান্তি-শৃংখলাকে বিঘ্নিত করছিল। প্রায় রোজই হয় কলেজ স্ট্রিটে, অথবা ডাঃ রায়ের বাড়ির উল্টোদিকে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কিংবা রাইটার্স বিল্ডিংস এলাকায় সরকার ও প্রাদেশিক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল চলছিল। পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদেব সংঘর্ষ, লাঠি, টিয়ারগ্যাস ও গুলিরও বিরাম ছিল না। কিন্তু বিধান কোন ভ্রূক্ষেপ না করে তাঁর বাড়িতে ও রাইটার্স বিল্ডিংসে প্রতিদিন ১৫ থেকে ১৬ ঘণ্টা কাজ করে যেতেন। কখনও কখনও শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করতেন ও তাঁদের অভিযোগ শুনতেন। প্রচণ্ড মানসিক চাপ সত্ত্বেও তিনি কখনও বিরক্তি প্রকাশ করতেন না। নির্দিষ্ট অভাব অভিযোগগুলির সুরাহা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। কিন্তু ভয় দেখিয়ে চাপ সৃষ্টি করে তাঁর কাছ থেকে যে কিছু আদায় করা যাবে না, একথা তিনি তাঁদের বুঝিয়ে দিতে ভুলতেন না। ছাত্র প্রতিনিধিরা তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসলে তিনি তাঁদের পরিষ্কার বলে দিতেন যে

তিনি কখনই বিশৃংখলার সঙ্গে আপস করবেন না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে তিনি নিজের এমন একটি মানসিক কাঠামো তৈরি করেছিলেন যে, রোগের ইতিহাস ও রোগীর আনুপূর্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে রোগ নিরাময়ের যেমন দ্রুত বিধান দেওয়া দরকার, তেমনি পশ্চিমবঙ্গের জন্যও দ্রুত নিরাময়ের বিধান দরকার। এই সময়ের মধ্যে বিধান 'বন্দেমাতরম'কে দেশের জাতীয় সংগীত (anthem) হিসাবে নির্বাচনের জন্য এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। বিধান নেহরুকে বলেছিলেন যে, জাতির দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে 'বন্দেমাতরম'-এর এক অচ্ছেদ্য বন্ধন রয়েছে। সেহেতু 'বন্দেমাতরম'ই জাতীয় সংগীত হওয়া উচিত। তখন গণপরিষদে সংবিধানের খসড়া নিয়ে আলোচনা চলছে। নেহরুর যুক্তি ছিল এই যে, যেহেতু দেশের জাতীয় সংগীত সামরিক বাহিনীর পক্ষে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ সেহেতু 'জনগণমন' শব্দবিন্যাস ব্যান্ডে সুর বাঁধার পক্ষে অনেক বেশি সহজ। বিধান নেহরুর যুক্তি মেনে নিতে পারেননি। সেই সময় দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ বিধানের মতের পক্ষে ছিলেন। যাহোক, বিধান শেষ পর্যন্ত নেহরুর কথার বিরোধিতা করলেন না এবং সংবিধানের খসড়ায় 'জনগণমন' জাতীয় সংগীতরূপে মেনে নিলেন।

১৯৪৮-এর মাঝামাঝি থেকে ১৯৪৯ সালের প্রথম দিকে তিনি পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনকে কলকাতায় আসার আমন্ত্রণ জানান এবং পূর্ববঙ্গের হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার পন্থা পদ্ধতি নিয়ে বৈঠক করেন। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন ব্রিটিশ নৌবাহিনীতে প্রত্যাবর্তন করলে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল রাজগোপালচারী ওই পদে নিযুক্ত হন। নেহরু বিধানের কাছে জানতে চান পরবর্তী রাজ্যপাল হিসাবে তাঁর কাকে পছন্দ। ডাঃ রায় কৈলাসনাথ কাটজুকে বেছে নিলেন। ১৯৪৮ সালের শেষভাগ নেহরু ডাঃ রায়কে জরুরি তলব পাঠিয়ে দিল্লিতে ডেকে নিয়ে যান। তিনি সেখানে তিনদিন নেহরুর বাড়িতেই থাকেন। ওই সময় ব্রিটিশ শাসন আমলের দেশীয় করদ রাজ্য হায়দ্রাবাদের নিজাম ও তাঁর প্রধানমন্ত্রী মির লায়েক আলি হায়দ্রাবাদকে পাকিস্তানের অঙ্গ প্রদেশে পরিণত করার চক্রান্ত করছিলেন। ফলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে এক গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছিল। হায়দ্রাবাদে ভারত সরকার পুলিশ অভিযানের ব্যবস্থাদি নিয়ে আলোচনার জন্যই নেহরু বিধানকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কলকাতায় ফিরে এসেই তিনি শাহিদ সুরাবর্দিকে তাঁর বাড়িতে ডেকে পাঠালেন। সুরাবর্দি সাহেব তখন পর্যন্ত ভারতেই বসবাস করেছিলেন। মনে হয় যে, বিধান নেহরুর অনুরোধেই সুরাবর্দিকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিধান ১৩ সেপ্টেম্বর (১৯৪৮) প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন, তার সারাংশ হল এই—"আজ সন্ধ্যায় শাহিদ সুরাবর্দি আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। শাহিদ আমাকে একথা বলেছে যে হায়দ্রাবাদে পুলিশি অভিযান যেভাবেই ঘটে থাকুক না কেন ভারতের কিংবা পাকিস্তানের মুসলমানেরা এ বিষয়ে

কোন বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে না বলেই শাহিদ মনে করেন। প্রদেশে হাঙ্গামা ঘটলে তা প্রতিরোধ করার জন্য সব সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তবে মুসলমানদের হয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি একাজ কিছু গণ্ডগোলের সৃষ্টি করতে পারে। কারণ, হাঙ্গামা ও বিশৃংখলার মধ্য দিয়ে ওই পার্টি সুবিধা ভোগ করতে চায়।"

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বাজেট (১৯৪৮-৪৯)

গান্ধী হত্যার শোকার্ত পরিবেশে ১৯৪৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গের আইন সভার প্রথম বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হল। ১৭ ফেব্রুয়ারি অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার প্রদেশের প্রথম বাজেট পেশ করলেন। এক বছর আগে অবিভক্ত বঙ্গের শেষ বাজেট পেশ করেছিলেন সুরাবর্দি মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী বগুড়ার মহম্মদ আলি। কিরণশঙ্কর রায়ের মতো নলিনীরঞ্জন সরকার ও বিধান মন্ত্রিসভার এক শক্তিশালী স্তম্ভ ছিলেন। স্বভাবতই ওটা ছিল বিধান সরকারের প্রথম ঘাটতি বাজেট। তখন বাজেটে যে বার্ষিক রাজস্ব আদায় ধরা হয়েছিল তার মধ্যে জনগণের জন্য উন্নয়ন খাতে ব্যয় ধরা হয়েছিল সাড়ে ছ' কোটি টাকা। টাকার অঙ্কে ও জনসংখ্যার অনুপাতে অবিভক্ত বঙ্গের শেষ বাজেটের চেয়ে অনেক বড় বাজেট ছিল। দেশভাগের পর পাট ও চাল উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ ঘাটতি অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। পাট উৎপাদনের বৃহৎ এলাকা পড়ে গিয়েছে পূর্ববঙ্গে। কিন্তু চটকলগুলি সবই রয়েছে কলকাতার আশেপাশে। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গে নিরাপত্তার অভাবে সংখ্যালঘু হিন্দুদের একটা জনস্রোত অবিরাম সীমান্তের এপারে চলে আসছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যভাণ্ডারে টান পড়েছে। ডাঃ রায় ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মহতাব ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহের সঙ্গে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আলোচনা চালিয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীদের একাংশকে ওই দুটি প্রদেশে পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করলেন। এদিকে দেশবিভাগের মুখে মুখে নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়ায় রেলইঞ্জিন নির্মাণ কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব হয়েছিল। কিন্তু দেশবিভাগের পর কাঁচড়াপাড়া সীমান্তের খুব কাছে বলে ভারত সরকার প্রস্তাবিত ওই কারখানা বিহারের কোন স্থানে স্থাপনের কথা বিবেচনা করছিলেন। এই সময় বিধান উদ্যোগ নিলেন যাতে রেলইঞ্জিন নির্মাণ কারখানা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সীমানার মধ্যেই স্থাপিত হয়। বিহারের মিহিজাম স্টেশনের গায়ে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার শেষপ্রান্তের কয়েকটি মৌজা তিনি বেছেনিলেন রেলইঞ্জিন নির্মাণ কারখানার স্থান হিসাবে। তাঁর রাজনৈতিক গুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নামে ওই স্থানের নামকরণ করা হল। কারখানাটিও ওই নামে নামাঙ্কিত হয়ে ভারতে রেলইঞ্জিন নির্মাণ করতে আরম্ভ

করল ১৯৫১ সাল থেকে। এই কাজে তিনি তখনকার কেন্দ্রীয় শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে প্রভূত সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছিলেন। এই একই সঙ্গে তিনি দামোদর অববাহিকা অঞ্চলের জলনিকাশি ব্যবস্থার দ্বারা বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিহার ও পশ্চিমবাংলার যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করলেন দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন (ডি ভি সি) গঠনের মধ্য দিয়ে। আমেরিকাতে সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য টেনেসি ভ্যালি অথরিটি নামে একটি সংস্থা আছে. ডাঃ রায়ের এক প্রচণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং মানসিকতার জন্য তিনি এই প্রকল্পটি সম্পর্কে আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময় থেকে। তাঁর আমেরিকা গ্রহণকালে তিনি টেনেসি ভ্যালি অথরিটি পরিদর্শন করেন ও এই প্রকল্পের প্রধান রূপকার ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে পরিচিত হন। ওই ইঞ্জিনিয়ার বিশেষজ্ঞকে তিনি আমন্ত্রণ করে আনেন ও তাঁকে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের দামোদর অববাহিকা অঞ্চল ঘুরিয়ে দেখান। তাঁরই সুপারিশে পরিকাঠামোর ভিত্তিতে নির্মিত হল মাইথন, তিলাইয়া ও দুর্গাপুর জলাধার ও ব্যারেজ। এই অঞ্চলের বিদ্যুৎ চাহিদা পূবণের জন্য ডাঃ রায়ের সুপারিশেই তৈরি হল বোকারো তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। তিনি শ্রীজওহরলাল নেহরুর মতোই দামোদব উপত্যকা অঞ্চলকে ভারতের শিল্পসমৃদ্ধ রূঢ় অঞ্চলে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

বিধানচন্দ্র রায় যখন প্রদেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক উদ্যোগ নিয়ে একদিকে ব্যস্ত, তখন পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসা হিন্দুদের সংখ্যাবৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। ১৯৪৯ সালের ২২ আগস্ট তিনি প্রধান শ্রী নেহরুকে চিঠিতে লিখলেন :

আপনার এই মাসের ১৬ তারিখের চিঠি পেয়েছি। আপনি বলেছেন যে, পূর্ববঙ্গ থেকে লোকদের চলে আসা ঠেকাতে আমাদের সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এটা ঘটনা যে, হিন্দু নেতারা ওই দেশ থেকে চলে আসছে। সুতরাং আপনার ওই কথা বলার কোন অর্থ নেই। সতীশ দাশগুপ্ত মশাই আজ আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে গত দু'তিন মাসে পূর্ববঙ্গের অবস্থার অবনতি ঘটেছে। তিনি সেখানে শান্তির জন্য যেসব কাজ করে যাচ্ছেন, তা তাঁকে পূর্ববঙ্গ সরকার আর করতে দেবেন বলে মনে হয় না। সুতরাং তিনি ভীত ও সন্ত্রস্ত যে সব লোক পূর্ববঙ্গ প্রদেশ থেকে চলে আসতে চায় তাদের জন্য সাময়িক আস্তানা তৈরি করার পরিকল্পনা রচনা করতে রাজি আছেন। আমি তাঁকে বলেছি যে রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ও তিনি নিজ এ ধরনের কিছু সংখ্যক আস্তানা তৈরি করার উদ্যোগ নিতে পারেন। পরিস্থিতির মোকাবিলার এটা একটা পথ হতে পারে। অন্যান্য প্রদেশ পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের জায়গা দিতে রাজি নয় বলে আপনার চিঠিতে যেসব কথা উল্লেখ করেছেন, সে সম্পর্কে আমি বলতে পারি যে, আমি ওড়িশার হরেকৃষ্ণ মহাতবের সঙ্গে কথা বলেছি। যে সব দেশীয় রাজ্য ওড়িশা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে

গিয়েছে, সেখানে আমাদের উদ্বাস্তুদের তাঁরা জায়গা করে দিতে রাজি। অবস্থা এখন যা দাঁড়িয়েছে, তাতে ওইরকম একটা পরিকল্পিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা দরকার। কারণ, উদ্বাস্তুদেব জায়গা দেবার জন্য যে সব ঘরবাড়ি ও সামরিক ছাউনিগুলি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি ইতিমধ্যে ভরে গিয়েছে। এদিকে আরও উদ্বাস্তু আসছে।" বিধান রায়ের এই চিঠির জবাবে নেহরু লিখলেন, "আপনার ২২ আগস্টের চিঠি আমি পেয়েছি। আমরা যদি একাজ মহাপ্রলয়ের সম্মুখীন হই, এবং আমাদের মধ্যে কেউ কেউ যদি ওই প্রলয়ের স্রোতে ভেসে যাই, তাহলেও আমাদের ওই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। তবু ওই প্রলয় প্রতিরোধের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করারও প্রয়োজন আছে। এই বাপারে আমাদের যথেষ্ট পরিষ্কার থাকতে হবে যে, আমাদের কারও কোন কথা বা কোন কাজ এমন না হয়, যাতে লোকেরা ভুলপথে পরিচালিত হয়। এ ব্যাপাবে আমি গোড়া থেকেই খুব পরিষ্কারভাবে বলে আসছি যে, হিন্দুদের পূর্ববঙ্গ থেকে দেশত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা উচিত নয়। এভাবে দেশত্যাগের ঘটনা যদি ব্যাপকভাবে ঘটতে থাকে, তাহলে সেটা হবে একটি বড় ধরনের বিপর্যয়। পালিয়ে আসার পথ কোন সমস্যার সমাধান হতে পারেনা। যে সব হিন্দু নেতারা পূর্ববঙ্গ থেকে চলে এসেছেন, তাঁরা তাঁদের জনগণের কোন উপকারে আসেননি। এখন আপনি যে কথা বলছেন যে, পরিস্থিতি ইতিমধ্যে খুবই খারাপের দিকে চলে গিয়েছে ; তাহলে আমরা যতদূর সম্ভব সাহায্য করতে পারি তাই করব। কিন্তু দেশত্যাগের এই স্রোত মানুষের জীবনে যে দুর্দশার ও বিপর্যয় নিয়ে আসবে তা ভাবতে গিয়ে আমি শিউরে উঠছি। তবে আমার কথা হল, যদি একটা যুদ্ধও করতে হয়, তাহলেও আমি শেষ পর্যন্ত দেশত্যাগ প্রতিরোধ করতে চেষ্টা চালিয়ে যাব।"

পূর্ববঙ্গ থেকে যত সংখ্যক হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলে আসবে তাদের থাকার জায়গা দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ থেকে তত সংখ্যক মুসলমানদের পূর্ববঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়ার সম্ভাব্য বন্দোবস্ত সম্পর্কে জওহরলাল নেহরু ওই একই চিঠিতে বলেছেন, "ব্যাপারটা হল এই যে, কোন একজন ব্যক্তিবিশেষকে মুসলমান বলেই বিজাতীয় গণ্য করা যায় না। তার মনে কুমতলব থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিবিশেষ সম্পর্কে আমরা ব্যবস্থা নিতে পারি। কিন্তু একদল ভারতীয় নাগরিককে এই যুক্তিতে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না, যেহেতু অন্যদেশ তাদের নাগরিকদের ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবহার করছে না। আইন ও সমতার দৃষ্টিতে এটা হতে পারে না। আমরা যেখানে নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে দাবি করছি, সেখানে একথার অর্থ হল ওই ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শের মূলে কুঠারাঘাত করা। পরিণাম যাই হোক না কেন, আমরা কখনই ওই কাজ করতে পারি না। কোন ব্যক্তিবিশেষ যদি কুকর্ম করে, তাহলে সেটা হবে একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার। আমি জেনে খুশি হলাম যে, ওড়িশা ও সে সব দেশীয় রাজ্য ওই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেখানে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের

পুনর্বাসনে প্রাদেশিক সরকার রাজি। নিশ্চয়ই তারা এখন থেকে নিজেদের এ ব্যাপারে প্রস্তুত রাখতে পারে, যেমন আপনার সরকার কাজ করছে। তবে আপনি যে একাজটা করছেন এটা ছড়িয়ে পড়লে তাতে পূর্ববঙ্গ থেকে দেশত্যাগের ঘটনা বাড়বে। সুতরাং সেটা পরিহার করা দরকার।" ১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি সময়েই পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতা ও তার আশেপাশে উদ্বাস্তুদের জন্য ৫০টিরও বেশি ত্রাণকেন্দ্র খুলতে বাধ্য হন। সীমান্ত জেলাগুলিতে বেশ কিছু ত্রাণকেন্দ্র খুলতে হয়। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দুদের হয়রানি ও অত্যাচারের ঘটনাবলী যাতে সেখানকার সরকারকে নিরন্তর অবহিত করা যায়, সেজন্য বিধানচন্দ্র রায়ের অনুরোধে ভারত সরকার ঢাকায় একজন স্থায়ী ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার নিয়োগে সম্মত হন এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ওই পদাধিকারী নির্বাচনের দায়িত্ব বিধানরায়ের উপর ছেড়ে দেন। ডাঃ রায় ১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে ওই পদের জন্য কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ও অবিভক্ত বঙ্গের এক সময়কার মন্ত্রী সন্তোষকুমার বসুকে মনোনীত করেন।

১৯৪৯ সালের গ্রীষ্মকালের মধ্যেই সংবিধানের খসড়া তৈরির কাজ শেষ হয়ে যায় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া তাদের মতামতের জন্য। ওই বছরেই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার শারদ অধিবেশনে সংবিধানের খসড়া নিয়ে আলোচনা চলে। সংবিধানের যে অনুচ্ছেদে রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় রাজস্য ও কর বণ্টনের ব্যবস্থা আছে, সে ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ডাঃ রায়ের আনা একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন করে। প্রস্তাবটিতে পশ্চিমবঙ্গের দাবি ছিল এই : আয়কর ও কর্পোরেশন ট্যাক্সেব বাবদ কেন্দ্রীয় সরকার যে রাজস্ব সংগ্রহ করে থাকে, তাব ৬০ শতাংশ এবং কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্কের ৫০ শতাংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করতে হবে। এ ছাডা পাটজাত দ্রব্য রফতানি মারফত এবং বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক ধার্য করে কেন্দ্রের যে রাজস্ব আদায় হয়, তারও ৫০ শতাংশ রাজ্যগুলিকে দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পেশ করা ওই করসংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি এখনও প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে বিধান রায়ের মৃত্যুর চল্লিশ বছর পরেও কেন্দ্রীয় রাজস্বের বিভাজন পদ্ধতি ভারতীয় রাজনীতিতে কেন্দ্র রাজ্য মত পার্থক্যের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রয়েছে। সংবিধানের খসড়া রচনার মুহূর্তেই তাঁর দূরদৃষ্টিতে এই বিতর্কের ছায়া দেখা গিয়েছিল।

১৯৪৯ সালের সূচনা থেকেই নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থকেরা প্রদেশের আইন শৃংখলার উপর একের পর এক হিংসাত্মক আঘাত হানতে আরম্ভ করে। ১৮ জানুয়ারি (১৯৪৯) তারিখে কলেজ স্ট্রিট ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ বাধে। ট্রামে বাসে আগুন দেওয়া হয় ও সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি সাধন চলতে থাকলে পুলিশের গুলিতে চারজনের মৃত্যু হয়। এই সময় থেকে কলকাতায় বামপন্থীদের হিংসাত্মক আন্দোলনের যে সূচনা ঘটে, তা

পরবর্তী দুটি যুগ ধরে একই ধারায় চলতে থাকে। কমিউনিস্ট প্রভাবিত ছাত্র বিরোধ এখন কলেজ স্ট্রিট এলাকা ছাড়িয়ে রাইটার্স বিল্ডিংস বাজভবন ও বিধানসভা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের একাংশ ছাত্র আন্দোলনের সামিল হওয়ায় হিংসাকাণ্ডের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পেল। এরকম বিক্ষোভ চলতে থাকায় কলকাতার কলেজগুলিতে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো বিঘ্নিত হতে লাগল সাংঘাতিকভাবে। এরকম অবস্থায় একদিন ডাঃ রায় পুলিশ রিপোর্টের পরামর্শ উপেক্ষা করে খানিকটা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ঝুঁকি নিয়ে একদল ছাত্রের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হলেন। ছাত্রেরা কলকাতা শহরের বিভিন্ন এলাকা বিশেষ করে কলেজ স্ট্রিট এলাকা থেকে ১৪৪ ধারা-সহ বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানাল। ছাত্রদের কাছে তিনি দাবি রাখলেন, হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করতে হয়। ছাত্ররা পাল্টা দাবি রাখল পুলিশি বাড়াবাড়ি ও যথেচ্ছারের তদন্ত করতে হবে। ছাত্ররা হিংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি দিলে ডাঃ রায় ছাত্রদের সব দাবি মেনে নিলেন। এর ফলে কলকাতা শহরে অনেকটা শান্তি ফিরে এল। এরকম এক অবস্থার মধ্যে ডাঃ রায় মন্ত্রিসভার সবচেয়ে শক্তিশালী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিরণশঙ্কর রায় ২০ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৯) অকস্মাৎ মারা যান। এই আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনার এক সপ্তাহ পরে রাজ্যের আইন শৃংখলা সাংঘাতিক ভাবে বিপর্যস্ত হল এক অভাবনীয় ঘটনায়। ২৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৪৯) আর সি পি আই দলের (রিভলিউশানারি কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া) একটি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী পান্নালাল দাশগুপ্তের নেতৃত্বে দমদমের জেশপ কারখানায় আক্রমণ চালিয়ে ক্যাশ অফিস লুঠ করে, তিনজন সাহেবকে কারখানার জ্বলন্ত বয়লারে ঢুকিয়ে দেয় ও প্রহরীদের গুলি করে হত্যা করে। তারপর ওই দলটি চলে যায় দমদম বিমানবন্দরে। সেখানে টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের প্রহরারত রক্ষীদের গুলি করে তাদের অস্ত্র কেড়ে নেয় ও কন্ট্রোল রুমের যন্ত্রপাতি ভেঙে ফেলে। তারপর তারা চলে যায় বসিরহাটে। সেখানে এস ডি ও'র অফিস আক্রমণ ও ট্রেজারি লুঠ করে দলটি ইটিন্ডা ঘাট হয়ে ইচ্ছামতী পেরিয়ে পূর্ববঙ্গের খুলনা জেলায় ঢুকে পালিয়ে যায়। ৪ মার্চ তারিখে ডাঃ রায় এক দীর্ঘ বিবৃতিতে ওই আর সি পি আই দলটির হিংসাত্মক কার্যকলাপের বিবরণ দিয়ে বলেন যে, রাজ্যের আইন-শৃংখলা ভেঙে দিয়ে এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের এক সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল এই ঘটনাটি। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় তাঁর বিবৃতির একাংশে বলেছেন, "যদিও এই হানাদারি দলটির প্রায় সকলেই আর সি পি আই দলভুক্ত, তাহলে একটা সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করার ষড়যন্ত্রে এই দলটির সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির যোগসাজস ছিল।" পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে 'দমদম বসিরহাট হামলা' নামে পরিচিত এই ঘটনা সম্পর্কে ওই ফেব্রুয়ারি মাসেই পার্লামেন্টে এক বিবৃতি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নেহরু বলেছেন, "১৯৪৮ সালের পুরো বছরটাই ভারতের

কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে সরকারের বিরুদ্ধে সে সব আক্রমণাত্মক কাজ করেছে, তা বিদ্রোহের শামিল। ওই হামলার ঘটনার যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তারা সকলেই আর সি পি আই নামে একটি দলের সদস্য। এই দলটি মূলত কমিউনিস্ট পার্টিরই একটি বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী ও কমিউনিস্টদের সহযোগী হিসাবেই কাজ করছে।" এদিকে চব্বিশ পরগনা জেলার সুন্দরবন এলাকায় সি পি আই নেতা কংসারি হালদারের নেতৃত্বে এক সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ চলছিল। ১৯৪৯ ও ৫০ সালে ডাঃ রায় ওই বিদ্রোহ অনেকটা নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলেন। 'কাকদ্বীপ ষড়যন্ত্র মামলা' নামে পরিচিত এই বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রণে আসে প্রধানত তিনটি কারণে। তা হল, একদিকে পুলিশি ব্যবস্থা, অন্যদিকে ওই অঞ্চলের সেই সময়কার বিশিষ্ট কংগ্রেস সংগঠক হংসধ্বজ ধাড়ার পাল্টা প্রচার অভিযান ও কতকটা সীমিত পন্থায় ভূমি সংস্কারের কাজ। বাঙালি যুবকদের সামরিক বাহিনীর উপযুক্ত করে তুলতে বিধান রায় প্রয়াস নিলেন 'পশ্চিমবঙ্গ ন্যাশন্যাল ভলান্টিয়ার ফোর্স' নামে একটি আধা সামরিক বাহিনী গঠন করে। সংক্ষেপে এন ভি এফ নামে পরিচিত এই বাহিনীর বিভিন্ন মহড়া ও কুচকাওয়াজ পরিদর্শনে আসেন ভারতের প্রথম প্রধান সেনাপতি জেনারেল কারিয়াপ্পা। তিনি এই বাহিনী দেখে এতই সন্তুষ্ট হন যে, তিনি এন-ভি-এর-এর দুশো বাঙালিকে সামরিক বাহিনীতে নিযুক্তির প্রস্তাব দেন। ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বাহিনীকে পরবর্তীকালে মূল সাংগঠনিক লক্ষ্য থেকে সরিয়ে আনা হয়। এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে, জেনারেল কারিয়াপ্পার প্রস্তাব ও সুপারিশ কার্যকর করার প্রশ্নে সামরিক বাহিনীতে মতভেদ দেখা দেয়। পরিণতিতে এন-ভি-এফ পুলিশের সহায়ক বাহিনীতে পরিণত হয়।

প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে বিধানের সম্পর্ক ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবাদ কাহিনীর মতো হলেও তা সবসময় কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। ১৯৪৯ সালের জুন মাসে দক্ষিণ কলকাতার উপনির্বাচনের ফলাফলের পর তা ধরা পড়ে। কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে কংগ্রেস হাইকমান্ডের মনোমালিন্য চলছিল ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের প্রশ্ন নিয়ে। তারপর ১৯৪৬ সালে কেন্দ্রে অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভা থেকে খামখেয়ালের বশে শরৎচন্দ্র বসুকে সরিয়ে দেওয়ায় ব্যক্তিগত তিক্ততা চরমে পৌঁছায়। তারপর দেশভাগ ও শাহিদ সুরাবর্দির সঙ্গে 'সার্বভৌম যুক্ত বঙ্গ" গঠনের আন্দোলন শরৎচন্দ্র বসুকে কংগ্রেস থেকে বিচ্যুত করে। শেষপর্যন্ত তিনি কংগ্রেস ও প্রাদেশিক আইন সভা থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৪৬ সালে তিনিই কংগ্রেসপ্রার্থী হিসাবে দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্র থেকে অবিভক্ত বাংলার আইন সভার নির্বাচনে জিতেছিলেন। তাঁরই পদত্যাগের ফলে ওই আসনটি শূন্য হয়। ইতিমধ্যে শরৎ বসু সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি' নামে একটি নতুন দল গঠন করেন। দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রের ওই নির্বাচনে শরৎ বসুকে দেশের সকল বামপন্থী দল সমর্থন করে। ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় সরাসরি।

সুরেশচন্দ্র দাসের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। সুরেশবাবু ওই সময় দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। এই নির্বাচনী প্রচারে শরৎচন্দ্র বসুর আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। ফলে নির্বাচনী ফলাফলের প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার পুরো ধাক্কাটাই আসে ডাঃ রায়ের উপর। কংগ্রেসের মধ্যে ডাঃ রায়ের বিরুদ্ধবাদীরা এই সুযোগ গ্রহণের জন্য সচেষ্ট হয়ে পড়ে। বিধানবাবু অবশ্য ভোটের ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শরৎবাবুকে এই বিজয়ের জন্য অভিনন্দন জানান কিন্তু জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের এই পরাজয়কে ক্ষুব্ধ চিত্তে গ্রহণ করেন। কারণ, শরৎ বসুর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত তিক্ততা চরমে পৌঁছেছিল। ক্ষুব্ধ ও অনেকটা ক্রুদ্ধ নেহরু দক্ষিণ কলকাতা উপনির্বাচনের ফল সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলেন, "এই নির্বাচনী ফলে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার প্রতি জনগণের অনাস্থা প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং এই মন্ত্রিসভার পদ্যাগ করা উচিত।" ডাঃ রায় নেহরুর ওই বিবৃতি দেখেই ২০ জুন (১৯৪৯) তারিখে নেহরুকে এক চিঠি লিখে তাঁর পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ডাঃ রায় তাঁর চিঠিতে নেহরুকে দ্রুত জবাব দিতে বলেন। কারণ দু'দিন পরেই তিনি তাঁর চক্ষু চিকিৎসার জন্য সুইজারল্যান্ড রওনা হবেন। একদিকে প্রদেশে কমিউনিস্ট পার্টির বিদ্রোহমূলক কাজকর্ম ও অন্যদিকে একদল কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অসতর্ক মন্তব্য বিধানের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। কিন্তু নেহরু সম্ভবত তাঁর মন্তব্যের ভুল বুঝতে পেরে দুদিনের মধ্যেই ডাঃ রায়কে চিঠির জবাব দিলেন। চিঠিতে নেহরু ডাঃ রায়কে বললেন, যে, খবরের কাগজে তাঁর কথা যেভাবে বেরিয়েছে, সেভাবে তিনি ওই সব কথা বলেননি। তিনি কখনই একথা বলেননি যে, পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রিসভা জনগণের আস্থা হারিয়েছে ও তাদের পদত্যাগ করা উচিত। চিঠিতে নেহরু ডাঃ রায়ের চক্ষুরোগের দ্রুত আরোগ্য কামনা করলেন। ২৩ জুন (১৯৪৯) ডাঃ রায় ইউরোপ রওনা হয়ে গেলে ওইদিনই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এক জরুরি বৈঠকে মিলিত হয়ে "পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিচালনায় ডাঃ রায়ের নেতৃত্বের প্রতি তাঁদের আস্থা" পুনর্ব্যক্ত করলেন।

ডাঃ রায় প্রায় দু'মাস ইউরোপে ছিলেন। সুইজারল্যান্ড থেকে তিনি প্যারিসে যান। নাৎসি আক্রমণে বিধ্বস্ত প্যারিস কত দ্রুত পুনর্গঠিত হয়েছে, তা তিনি দেখেন। সেখানে তিনি যে কোম্পানি প্যারিসের ভূগর্ভ রেলপথ নির্মাণ করেছে, তার ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলেন। কলকাতায় ভূগর্ভ রেল তৈরি করতে গেলে শহরের সামগ্রিক অবস্থা ও মাটি পরীক্ষাদির জন্য তিনি ওই কোম্পানিকে কলকাতায় একটি বিশেষজ্ঞ দল পাঠাতে সরকারিভাবে অনুরোধ করেন। পশ্চিম জার্মানিতে গিয়ে তিনি জার্মান সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গে লবণ তৈরির কারখানা স্থাপন করা সম্পর্কে জার্মান বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলেন। লন্ডনে এসে তিনি শহরের আশেপাশে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্ম দেখেন। কলকাতার পরিবহণ ব্যবস্থার স্বার্থে তিনি বার্মিংহামে যে কারখানায় দোতলা সারের ডিজেল ইঞ্জিন তৈরি হয়

সেখানে যান ও দক্ষ কারিকরদের সঙ্গের। দ্রুত পরিবর্তিত শহরাঞ্চলের মানুষের সামাজিক উত্তেজনার যে একট বড় উৎস শহরের পরিবহণ সমস্যা, এটা তিনি তখন থেকেই বুঝে নিয়েছিলেন। তাই চিকিৎসার জন্য ইউরোপ সফরে গিয়েও কলকাতার পরিবহণ সমস্যা তাঁর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। তিনি ডেনমার্ক গিয়ে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার ব্যাপারে একটি ডেনিশ কোম্পানির সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। তিনি তখনই বুঝে নিয়েছিলেন যে পরবর্তী দশকগুলিতে পশ্চিমবঙ্গে যে জনসংখ্যার চাপ বাড়বে, তাতে মাছের চাহিদা এত বাড়বে তা যোগান দেওয়া পুকুর, বিল, নদী নালার মাছে সম্ভব হবে না। ওই ডেনিশ কোম্পানি কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে কলকাতায় পাঠায়। তাঁরা কয়েকটি ট্রলার নিয়ে চব্বিশ পরগনা ও মেদিনীপুর জেলার বঙ্গোপসাগর এলাকায় মাছ ধরার সমীক্ষা চালান। পঞ্চাশের যুগের গোড়া থেকে রাজ্য সরকারের মৎস্য দফতর পুরোদমে এই প্রকল্প চালু করেন। ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন শহরের আবাসিক এলাকার গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ ব্যবস্থাদি তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। সেই থেকেই তাঁর মনে জন্ম নেয় কলকাতা শহরে ও আশেপাশে সরকারি আবাসন নির্মাণ পরিকল্পনা। প্যারিসের মেট্রো রেলের নির্মাতা কোম্পানির বিশেষজ্ঞরা ডাঃ রায়ের আমন্ত্রণে কলকাতা আসেন। তাঁরা কয়েক মাস কলকাতায় থেকে কলকাতা শহরে মেট্রো রেল প্রকল্প নির্মাণ বিষয়ে বারোটি খণ্ডে বিভক্ত এক দীর্ঘ রিপোর্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দেন। ডাঃ রায় ওই রিপোর্টের কপি ভারত সরকার ও রেল দফতরকে পাঠান এবং জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়াকে ভূগর্ভের একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত মাটি পরীক্ষা করাতে বলেন। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় তা আর হয়ে উঠেনি ও তাঁর মৃত্যুর পর দশবছর ওই উদ্যোগ চাপা পড়ে থাকে। ১৯৭২ সালে তাঁর এক উত্তরাধিকাবী মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় প্রায় ধ্বংসস্তূপ থেকে ডাঃ রায়ের ওই ঐতিহাসিক প্রস্তাবটি উদ্ধার করেন। এরপর ভারত সরকার সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের দিয়ে কলকাতা শহরের ভূগর্ভে রেল টানেল নির্মাণের কাজ শুরু করান। অবশেষে এই স্বপ্নদ্রষ্টা বাঙালির মৃত্যুর দুই যুগ পরে কলকাতা মেট্রো রেল বাস্তবায়িত হল।

ডাঃ রায় যখন ইউরোপে তখন পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার কার্যনির্বাহী মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মীমাংসা করা ছিল তাঁর আয়ত্তের বাইরে। হঠাৎ ডাঃ রায় কংগ্রেস সভাপতির কাছ থেকে দ্রুত দেশে ফিরে আসার জন্য এক তারবার্তা পেলেন। ওই তারবার্তায় বলা হয়েছে যে ১৩ জুলাই (১৯৪৯) দিল্লিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস ও প্রাদেশিক সরকারের কাজকর্ম নিয়ে ওই বৈঠকে আলোচনা হবে। সুতরাং ডাঃ রায়ের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ডাঃ রায় কংগ্রেস সভাপতিকে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর পক্ষে এখন দেশে ফেরা সম্ভব নয়। কারণ, তিনি প্যারিস, জুরিক ও ভিয়েনাতে ডাক্তারদের দিয়ে তাঁর চোখ পরীক্ষা করাবেন। কার্যনির্বাহী মুখ্যমন্ত্রী

নলিনীরঞ্জন সরকারকে যাতে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে উপস্থিত থাকতে বলা হয় সেজন্য তিনি কংগ্রেস সভাপতিকে ব্যবস্থা নিতে বলেন। বেশ কিছুদিন ধরে কংগ্রেস এম এল এ'দের একটি বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী বিধান রায়কে অপসারণের জন্য চেষ্টা করে আসছে। দক্ষিণ কলকাতার উপনির্বাচনে শরৎচন্দ্র বসুর জয়লাভে উল্লসিত সেই গোষ্ঠী আবার নতুন করে তোড়জোড় শুরু করল। এবার এই গোষ্ঠীকে নেতৃত্ব দিলেন জে সি গুপ্ত। তিনি ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে আবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রিত্বে ফিরিয়ে আনার জন্য নেহরু ও সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন। তিনি নেহরুর কাছে এক স্মারকলিপি দিয়ে ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভার ১৭ জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনলেন ও বললেন যে, ওই মন্ত্রীরাই কংগ্রেসের বদনামের জন্য দায়ী। নেহরু জে সি গুপ্তের ওই স্মারকলিপি কার্যনির্বাহী মুখ্যমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকারের হাতে দিয়ে তদন্ত চালাতে ও তদন্তের রিপোর্ট তাঁকে দিতে বললেন। এসব ঘটনা সম্পর্কে সদ্য প্রকাশিত 'বঙ্গসংহার এবং' গ্রন্থে (লেখক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত) ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের স্মৃতিকথা 'জীবনস্মৃতি' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, সর্দার প্যাটেল ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের পুনর্বহালে একটি শর্তে রাজি হয়েছিলেন। শর্তটি ছিল এই যে, গান্ধী হত্যার পর ডঃ ঘোষ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে সর্দার প্যাটেলের পদত্যাগের দাবি করে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তা ডঃ ঘোষকে প্রত্যাহার করে নিতে হবে। কিন্তু ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তাতে রাজি হননি। যাহোক ডাঃ রায় ২ সেপ্টেম্বর (১৯৪৯) বোম্বাইতে এলেন। সেখানে সর্দার প্যাটেল অসুস্থ ছিলেন, তাঁকে দেখাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু বোম্বাইতে ফিরে ডাঃ রায় জানতে পারলেন যে, নেহরু ও সর্দার প্যাটেল উভয়েই পশ্চিমবঙ্গে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বকে কোনভাবেই সংকটে ফেলতে রাজি নন। সর্দার প্যাটেল নেহরুকে ডাঃ রায়ের বিরুদ্ধবাদীদের সম্পর্কে এরূপ কথা বলেছিলেন, "সিংহের পিছনে ইঁদুর খোঁচাখুঁচি করছে।" কিন্তু বিধান দেশে ফেরার আগেই তাঁর পদত্যাগপত্র লিখে সই করে রেখেছিলেন সেটি পকেটে নিয়েই তিনি বোম্বাইতে নামেন। ওই পদত্যাগপত্রটির বয়ান ছিল এই, "গান্ধীজি তাঁর অনশনের অব্যবহিত পরেই ২০ জানুয়ারি আমাকে ডেকে বললেন, লোকে যখন চাইছে তখন তোমাকে বাংলার মন্ত্রিসভা গঠনের দায়িত্ব নিতে হবে। যেহেতু আমার কাছে তিনিই সমগ্র কংগ্রেসের প্রতিনিধি, তাই তাঁর নির্দেশ আমি মেনে নিয়েছি। আজ ওই মহান প্রতিষ্ঠানের যাঁরা প্রতিনিধি তাঁরা ভাবছেন যেহেতু বাংলায় আশু নির্বাচনের সম্ভাবনা সেহেতু বাংলায় এক পুনর্গঠিত অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভার প্রয়োজন। আমার সুস্পষ্ট কর্তব্য হল ওই নির্দেশ মেনে নেওয়া। যে ১৮ মাস বাংলার সেবা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, তাতে আমি আমার প্রদেশকে যথাসাধ্য সেবা করার চেষ্টা করেছি। আমি ভুল করে থাকতে পারি। আমি হয়তো অনেককেই সন্তুষ্ট করতে পারিনি। আমি বাংলার মানুষকে তাদের ন্যায্য চাহিদামতো খাদ্য বস্ত্র ও অন্যান্য দৈনন্দিনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করতে

পারিনি। তবে আমি বলতে চাই যে, আমি তাদের ওইসব চাহিদা পূরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি ও আমাকে বহু প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করে কাজ করতে হয়েছে। আমার বিবেক ও আমার কর্তব্যবোধ এই মাসগুলিতে আমাকে কাজ করতে চালিত করেছে। এখন আমি আমার পুরানো জায়গা অর্থাৎ চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে ফিরে যেতে চাই, কারণ, ওই জায়গা থেকেই আমি এসেছি। আমার মনে এই ভাবনা রয়েছে যে, একেবারে চেষ্টা না করার চেয়ে চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়া ভাল। আমি বিশ্বাস করি যে আমার এই প্রিয় প্রদেশের জন্য পরিকল্পিত উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করতে পেরেছি ও আমার উত্তরাধিকারীকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তাঁর চলার পথ সুগম হোক। সরকারের যে সব অফিসার ও কর্মচারীদের সঙ্গে আমি কাজ করেছি, মন্ত্রিসভার ও আইনসভার আমার সহকর্মীদের জানাই তাঁদের চলারপথে ভগবানের আশীর্বাদ পড়ুক।

"তবে যাহাক, এখন আমি মনে করি যে বাংলায় এই সময়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কোন কাজে আসবে না। তাহলেও ওরকম এক মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রয়াসের পথে আমি অন্তরায় সৃষ্টি করতে চাই না। সুতরাং আমার পরিষ্কার কর্তব্য হল, আমার এখনই পদত্যাগ করা যাতে আরও যোগ্য কোন ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যায়।" ডাঃ রায় বোম্বাইতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন ও তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগের উত্তর দেন। তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে তার মন্ত্রিসভার ১৭ জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে সেদিন বলেছিলেন :—"আমি ওই অভিযোগকারীর কাছে এজন্য কৃতজ্ঞ যে তিনি তাঁর অভিযোগমাত্র ১৭ জন মন্ত্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কারণ পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার বিবিধ কার্যাবলীর দিকে তাকালে ওই সংখ্যা আরও বেশি হওয়া উচিত ছিল। তবে যারা কাজ করে, তারাই সমালোচনার সম্মুখীন হয়। যারা মৃত, মৃতপ্রায় কিংবা নিদ্রিত তাদের কোন সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় না। আমি জোরের সঙ্গে বলছি যে, গত ১৯ মাস ধরে আমার নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা অত্যন্ত দায়িত্বশীল ছিল। এই মন্ত্রিসভা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্টভাবে প্রদেশের ও সাধারণভাবে দেশের উন্নতির জন্য কাজ করেছে।" অবশেষে এই সংকটের মীমাংসা হয়ে গেল নেহরুর হস্তক্ষেপে। নেহরু প্রদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে বিধান রায়ের ব্যাখ্যা মেনে নিলেন ও বিধানকে পদত্যাগের জন্য চাপ না দিতে অনুরোধ জানালেন। বোম্বাই থেকে ডাঃ রায় সরাসরি কলকাতা ফিরে এলেন। ১০ সেপ্টেম্বর (১৯৪৯) পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পরিষদীয় দল এক জরুরি বৈঠকে মিলিত ৩৪-১৪ ভোটে বিধানের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা পুনর্ব্যক্ত করল। একটি পৃথক প্রস্তাবে কংগ্রেস পরিষদীয় দল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছে এই অনুরোধ রাখলেন যে, একটি অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে কমিটি যেন তাদের আগেকার সিদ্ধান্ত

পুনর্বিবেচনা করেন এই অবস্থা সম্পর্কে ডাঃ রায় সাংবাদিকদের জানালেন যে, প্রদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনই সবচেয়ে জরুরি ও গত ১৯ মাস ধরে তাঁর মন্ত্রিসভা এ ব্যাপারে যথেষ্ট ছিলেন। এরপর ১৯৪৯ সালের শেষদিকে ডাঃ রায় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে বোঝাতে পারলেন যে, এখন পশ্চিমবঙ্গের জন্য কোন মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রয়োজন নেই। নতুন সংবিধান অনুযায়ী সারা দেশে যখন সাধারণ নির্বাচন হবে, তখনই এই প্রদেশে নির্বাচন হলে চলবে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ সবকার তখন এক ভয়ানক আর্থিক সংকটের মধ্যে নিমজ্জিত। বিক্ষিপ্তভাবে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা বাস্তুত্যাগীদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য পর্যাপ্ত টাকা নেই। ডাঃ রায় টাকার জন্য প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদেব কাছে চিঠিতে একথা লিখছেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের পুনবাসনের জন্য অন্যান্য প্রাদেশিক সরকার যে টাকা পাচ্ছেন, পশ্চিমবঙ্গকে সেই খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ থকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এই অবস্থার মধ্যে ১৯৪৯ সালের ১ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীকে এই চিঠি লিখলেন :—

"প্রিয় জওহরলাল,

আপনার চিঠিতে আপনি যে সব যুক্তি ও সিদ্ধান্তের অবতারণা করেছেন, তা আমার কাছে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। আপনার মনে এই ধারণা রয়েছে যে, আপনার সরকার ত্রাণ ও পুনর্বাসন খাতে আমাকে 'প্রচুর টাকা মঞ্জুর' করেছে। আপনি কী একবার ভেবে দেখেছেন যে ত্রাণ ও পুনর্বাসন যাতে আপনার সরকার ১৯৪৮-৪৯ ও ১৯৪৯-৫০, এই দুটি আর্থিক বছরে আমার সরকারকে তিন কোটি টাকা দিয়েছে। বাকি পাঁচ কোটি টাকা দিয়েছে ঋণ বাবদ। আপনি কী মনে করেন না যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে যে টাকা খরচ হচ্ছে, তার তুলনায় এটা অপ্রতুল? আমি দু'য়ের মধ্যে কোন তুলনা করতে চাই না, কারণ, তাতে সব সময়ই এক টানা-পোড়েন চলবে। কিন্তু একথা আমি জোর দিয়ে বলছি যে, যে টাকা আমাকে বরাদ্দ করা হয়েছে, তা এখন পর্যন্ত আসা ১৬ লাখ উদ্বাস্তুর জন্য একেবারেই যথেষ্ট নয়। বরাদ্দ পাওয়া টাকার অঙ্কের হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে, দু'বছরে মাথাপিছু উদ্বাস্তুর জন্য খরচ হয়ে ২০ টাকা করে! আপনি কি এটাকে যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন না?

"আমার আসল কথা হচ্ছে যে, ত্রাণ ও পুনর্বাসন খাতে আমি বরাদ্দের রূপান্তর চাইছি না। আমি যেটা বলতে চাই যে, ১৯৪০-৫০ সালের আর্থিক বছরে আমাদের নির্দিষ্টভাবেই ব্যয় করতে হবে ৪ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। এই পরিমাণের মধ্যে মাত্র ১ কোটি ৭৫ লাখ হল সাহায্য ও বাকি ৩ কোটি টাকা হল ঋণ। যে টাকা আমাকে ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে, তা থেকে যদি এক কোটি টাকা যদি দু'বছরে উদ্বাস্তু ছাত্রদের জন্য খরচ করতে দেওয়া যায় কিনা তা বিবেচনা করা হোক। কারণ, আমি মনে করি যে, আমার সুপারিশ মতো ব্যবস্থা নিলে ভবিষ্যতে খরচের পরিমাণ

কমবে। কারণ, কলকাতায় অশান্তি ও বিশৃংখলার একটা বড় অংশই উদ্বাস্তু ছাত্রদের দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে। ফলে তাদের শান্ত রাখতে পারলে অনেক জীবনহানির হাত থেকে রেহাই পাব ও পুলিশ-মিলিটারির জন্য খরচের বহরও কমবে। আমি যে কথা অনেকবার বলেছি, সেকথা আবার বলছি যে, পশ্চিমবঙ্গ ভাগ হয়েছে। আড়াই কোটি টাকার ঘাটতির বোঝা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক জীবনের সূচনা ও যে ঘাটতির দায় এখনও পশ্চিমবঙ্গকে মেটানো হয়নি। অথচ আমরা কেন্দ্রের কাছ থেকে দুর্ব্যবহার পেয়ে যাচ্ছি ও আয়কর থেকে আমাদের পাওনার অংশ কেন্দ্র নিয়ে নিচ্ছে। চট শিল্পের কর থেকে আমাদের যা পাওনা তা থেকে আমাদের বঞ্চিত করে অন্যান্য প্রদেশকে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে। প্রকৃত ঘটনা হল এই যে, আমাদের আগে থেকে কিছু না জানিয়ে ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে আমাদের বলা হল যে, আয়কর থেকে পশ্চিমবঙ্গের পাওনার পরিমাণ ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১২ শতাংশ করা হয়েছে। এই কমিয়ে দেওয়ার অর্থ হল এই যে পশ্চিমবঙ্গ আয়কর থেকে যেখানে বছরে ৬ কোটি টাকা পেত, তা কমিয়ে সাড়ে তিন কোটিতে নিয়ে আসা হল। আড়াই কোটি টাকা থেকে আমাদের বঞ্চিত করে সেই টাকা ভাগ করে দেওয়া হল অন্য প্রদেশগুলিকে। একবার ভেবে দেখতে বলছি এই নতুন ব্যবস্থা আমাদের কতটা ক্ষতি করেছে। বোম্বাই প্রদেশ তার ২ কোটি ১০ লাখ জনসংখ্যা নিয়ে কেন্দ্রীয় করের পাওনা ২০ থেকে ২১ শতাংশ পেয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সমসংখ্যক কিংবা আরও একটু বেশি জনসংখ্যা নিয়ে কেন ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১২ শতাংশ পাবে? অথচ পশ্চিমবঙ্গ ও বোম্বাই প্রদেশ আয়করে কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে সমপরিমাণ অর্থ যোগান দিয়ে থাকে। এর জন্য এই কারণ দেখানো হয়ে থাকে যে, পশ্চিমবঙ্গের আয়তন অনেক ছোট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বঙ্গ প্রদেশের যে অংশ নিয়ে পূর্ববঙ্গ প্রদেশ গঠিত হয়েছে, সেই অংশটুকু অবিভক্ত বঙ্গ প্রদেশ থেকে সংগৃহীত কেন্দ্রীয় আয়করের মোট পরিমাণের মাত্র ৫ শতাংশ দিত। আয়করের বাকি অংশ আসত কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চল থেকে। এই পরিমাণটাই ছিল সবচেয়ে বেশি। আয়কর সংগ্রহের পরিসংখ্যানের যে হিসাব দেওয়া হচ্ছে, তাতে মনে হয় যে, যদি পূর্ববঙ্গ আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন না হত ও যদি যুক্তবঙ্গই থাকত, তাহলেও দেখছি আমাদের ক্ষেত্রে আয়করের প্রাপ্য এই রকম থাকত। সুতরাং আমি বুঝতে পারছি না কী যুক্তিতেও কোন নীতির ভিত্তিতে আয়কর থেকে প্রাপ্য বরাদ্দের পরিমাণ স্থির করা হল। এই ব্যবস্থার পরিণতিতে আমাদের আর্থিক অবস্থা পঙ্গু হয়ে পড়েছে। আমি কোন সংকীর্ণ মানসিকতা থেকে এসব কথা বলছি না। কিন্তু পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে, যাতে ওসব কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। এখন আমাদের এই সঙ্গীন আর্থিক অবস্থা নিয়ে সীমান্ত এলাকায় অসংখ্য পুলিশ চৌকি স্থাপন করতে হচ্ছে। এটা মনে রাখতে হবে যে, এটা এমন একটা কাজ যা অসামরিক প্রশাসনের কাজ নয়, অথচ তার জন্য বিপুল খরচের বোঝা আমাদের

বহন করতে হচ্ছে। কিন্তু আমাদের সীমান্ত ও কতগুলি সীমান্ত ঘাঁটি সুরক্ষিত রাখতে হবে, কারণ ওই সব পথ দিয়ে চোরাচালানি ও নিষিদ্ধ মালামাল দেশের ভিতরে ঢোকে। এই দুটি বিষয়ে নিশ্চিতভাবেই সারা ভারতের পক্ষে জরুরি। অথচ এ ব্যাপারে বারংবার কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কেন্দ্রের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পাচ্ছি না। ১৫ লাখ উচ্চ ও মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙ্গালি পূর্ববাংলা থেকে সবকিছু ফেলে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। তারা অনাহার ও নিরাশ্রয়কে অবলম্বন এখানে এসেছে এক বিকল্প বাসস্থানের আশায়। বেশ কয়েক মাস ধরে কেন্দ্রীয় সরকার তার নিজের অর্থে এদের দায়দায়িত্ব বহন করতে চাইছে না। পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক সরকার তার নিজের সামর্থ্যে এই মানুষগুলির জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা করছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই হতভাগ্য উদ্বাস্তুদের জন্য দু'বছরে মাথাপিছু ২০ টাকা বরাদ্দ করার বদান্যতা দেখিয়েছেন! আমি কেন্দ্রের ভয়ানক অসুবিধাগুলি বুঝতে পারছি ভালভাবেই। কারণ, কেন্দ্রের মতো আমিও প্রদেশের শিল্পায়ন ও উন্নয়নের কাজের দায়িত্ব পালন করছি। আমি জানি ও খুব নিশ্চিতভাবেই জানি যে কেন্দ্রীয় সরকারের অসুবিধাগুলির জন্য দায়ী কেন্দ্রেরই দ্বিধাগ্রস্ত নীতি। কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে গেলে যে যে সুস্পষ্ট লক্ষ্য থাকা দরকার তা কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। বিভিন্ন দফতরের অফিসাররা যে যার অধিকারের জায়গা নিয়ে ব্যস্ত। সম্মিলিতভাবে কোন কাজ করতে পারে না। আপনার একথা ঠিক নয় যে প্রদেশগুলির চেয়ে কেন্দ্রের অসুবিধা অনেক বেশি। আপনার এই উক্তি ভুল। তবে এই বিষয়ে আমরা দু'জনে আলাদা মত পোষণে একমত হতে পারি। আমি বলতে চাই যে, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে অফিসারদের সমালোচনা করছি না ; কারণ, অফিসারদের কাজের দায়দায়িত্বের অংশীদার না হয়ে তাদের সমালোচনা করার সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্ক থাকে না। উদ্বাস্তু ছাত্রদের কলকাতা শহর থেকে বিভিন্নস্থানে সরিয়ে দিতে আমি যে পরিকল্পনা করেছি তা আমার এই প্রদেশের স্বার্থে অনুমোদনের জন্য আমি আপনাকে আবার চাপ দিচ্ছি। যদি এই খাতে আপনি আমাকে টাকা দিতে না চান, তাহলে অন্তত আমাদের বাজার থেকে ঋণ তুলতে অনুমতি দিন, আমরা তাতেই খুশি থাকব। এ ব্যাপারে আমি আপনাকে এই সময়োচিত সামান্য হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখছি যাতে সময়মতো ব্যবস্থা নিয়ে আমরা ভবিষ্যতের গণ্ডগোল পরিহার করতে পারি।"

সীমান্তের সবচেয়ে বড় সংকট

কিন্তু ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সমগ্র রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জীবনের সবচেয়ে বড় সংকট তখনও আসেনি। কেবল সীমান্ত অঞ্চল থেকে গোয়েন্দা সূত্রে কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত সংবাদ আসছিল যে, পূর্ববঙ্গের খুলনা জেলার একাংশে হিন্দুবিরোধী দাঙ্গার খবর পাওয়া যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ইংরেজ আমলের দেশীয় করদ রাজ্য কোচবিহারের ভারত ভুক্তি হয়ে গিয়েছিল ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে একজন চিফ কমিশনারের দ্বারা শাসিত হচ্ছিল। একদা কামরূপ সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ও জনগোষ্ঠীগত নৈকট্যের কারণে অসম কোচবিহারকে নিজ প্রদেশের অংশ হিসাবে দাবি করেছিল। কিন্তু প্রশাসনিক ভৌগোলিক, ভাষা ও সংস্কৃতিগত কারণে কেন্দ্রীয় সরকার কোচবিহারকে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের অংশে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় চিফ সেক্রেটারি সুকুমার সেন-কে নিয়ে কোচবিহার গেলেন ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারি। ওই দিন এক জনসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের পক্ষে চিফ কমিশনার নানজাপ্পা ডাঃ রায়ের হাতে বর্গমাইল এলাকার সাবেক দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের পশ্চিমবঙ্গ ভুক্তির নথিপত্র (ইনস্ট্রুমেন্টস অব এ্যাকসেসন) তুলে দেন। ডাঃ রায় ওই দলিল গ্রহণ করে জনসভায় ঘোষণা করেন যে, ৮ লাখ লোকের এই 'রাজ্য' এখন থেকে পশ্চিম-বঙ্গের একটি জেলা হিসাবে কাজ করবে। কোচবিহার শহর থাকবে জেলাসদর হিসাবে ও সাবেক 'মহারাজের', আমলের সকল কর্মচারীকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারী বলে গণ্য করা হবে। ৮ জানুয়ারি (১৯৫০) প্রধানমন্ত্রী নেহরু দিল্লিতে ঘোষণা করলেন যে, ২৬ জানুয়ারির দিন থেকে দেশে যে নতুন সংবিধান প্রবর্তন করা হবে তদনুযায়ী প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে সারা দেশে সাধারণ নির্বাচন হবে। প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা ছিল ডাঃ রায় ও তাঁর মন্ত্রিসভার পক্ষে বিজয়সূচক। কারণ, তিনি এটাই চাইছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪৯ সালে কোন মধ্যবর্তী নির্বাচন না করে সারা দেশের সঙ্গে একযোগে নির্বাচন করা উচিত। কিন্তু ওই ৮ জানুয়ারির সন্ধায় যাদবপুরের রাস্তায় এক বেদনাদায়ক ও উদ্বেগজনক ঘটনা-ঘটল। ওইদিন বিকালে ডাঃ রায় যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়ের সঙ্গে বৈঠক সেরে কলকাতা ফিরছিলেন। রাস্তায় একটি রেলওয়ে লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে আত্মগোপনকারী একদল কমিউনিস্ট ডাঃ রায়ের দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির উপর এক সাংঘাতিক আক্রমণ চালাল। তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে তাঁর উপর এমন হিংসাত্মক ব্যক্তিগত আক্রমণের ঘটনা আর কখনও ঘটেনি। এই ঘটনার খবর পেয়ে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ১২ জানুয়ারি কলকাতা আসেন ও ময়দানে পাঁচ লক্ষাধিক লোকের একজনসভায় ডাঃ রায়ের উপর কমিউনিস্টদের আক্রমণের ধিক্কার জানান। এদিকে কলকাতার খবরের কাগজগুলিতে পূর্ববঙ্গের খুলনা ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি

জেলায় পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু অফিসারের প্ররোচনায় হিন্দুবিরোধী দাঙ্গার অল্পবিস্তর খবর বের হচ্ছিল এবং কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছিল। ২৬ জানুয়ারি (১৯৫০) ভারতের প্রথম প্রজাতন্ত্র ও সংবিধান প্রবর্তনের প্রথম দিনটিতে শিয়ালদা স্টেশনে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত হাজার হাজার উদ্বাস্তুদের ভিড় উপচে পড়েছে। ডাঃ রায় পূর্ববঙ্গের নির্যাতিত মানুষদের দুর্দশার কথা মনে রেখে জনগণকে প্রজাতন্ত্র দিবসের আলোকসজ্জা ও আড়ম্বর বর্জন করার অনুরোধ জানালেন। ওইদিন সকালে ডাঃ রায়ের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার সকল সদস্য নতুন সংবিধান অনুযায়ী শপথ নিলেন। রাজ্যপাল, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, বিধানসভার স্পিকারকেও নয়া সংবিধানের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে শপথ গ্রহণ করতে হল। ওইদিন থেকে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অবলুপ্তি ঘটল এবং ফলে 'প্রদেশ'গুলি হল 'রাজ্য' ও 'প্রিমিয়ার'দের নামকরণ হল 'মুখ্যমন্ত্রী'।

ফেব্রুয়ারি (১৯৫০) মাসে গোড়াতেই কলকাতা ও সীমান্তবর্তী জেলাগুলির অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করল। পূর্ব খুলনা, ফরিদপুর, যশোর জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের হিন্দু নমশূদ্র সম্প্রদায়ের লোকদের উপর অকথ্য অত্যাচারের ফলে তাদের স্রোত বাড়তে লাগল। একদিন সন্ধ্যার পর ডাঃ রায় খবর পেলেন যে, খুলনা থেকে আসা বরিশাল এক্সপ্রেস ট্রেনের কয়েকটি কামরায় কোন যাত্রী নেই। কেবল রক্তের দাগ, ছেঁড়া শাড়ির অংশ ভাঙা শাঁখা ও ছুরি ইতস্তত ছড়ানো। খবর পেয়েই তিনি প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে ফোন করে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, "পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের রক্ষার জন্য একটা ব্যবস্থা আপনাকে নিতে হবে।—(মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে—সরোজ চক্রবর্তী)। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থার জন্য অপেক্ষা না করে বরিশাল, চাঁদপুরে আটকে পড়া হাজার হাজার হিন্দুকে স্টিমারে করে সরাসরি কলকাতার গঙ্গার ঘাটে আনার ব্যবস্থা করলেন। নিজের দায়িত্বে দমদম থেকে ১৬ খানা ডাকোটা বিমান ঢাকা পাঠিয়ে ওই শহরে আটক হিন্দুদের উদ্ধার করলেন। ডাঃ রায়ের নিজের তৈরি করা বিমান কোম্পানি এয়ারওয়েজ ইন্ডিয়া'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর কে কে রায়কে তিনি ঢাকায় আটক হিন্দু পরিবারগুলিকে উদ্ধারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। ওই বিমান কোম্পানির প্রথম চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি কোম্পানি কর্তৃপক্ষকে এই অনুরোধ করেছিলেন যে ওই যাত্রীদের বিনা ভাড়ায় কলকাতায় নিয়ে আসতে হবে। টাকার হিসাব পরে করা হবে। পূর্ববঙ্গের হত্যাকাণ্ডের বদলা হিসাবে কলকাতা এবং হাওড়া, হুগলি ও চব্বিশ পরগনার শিল্পাঞ্চলে মুসলমানদের উপর আক্রমণ ঘটতে লাগল। হাওড়াতে কার্ফু, সামরিক আইন ও পাইকারি জরিমানার ব্যবস্থাদি গ্রহণ করলেন ডাঃ রায়। এই দুঃসময় ও বিষাদের দিনগুলি সম্পর্কে "মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে" গ্রন্থে সরোজ চক্রবর্তী বলেছেন যে, ওই অশান্ত দিনগুলিতে একদিন অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ও ডাঃ রায়ের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ফজলুল হক সাহেব সন্ধ্যাবেলা ডাঃ রায়ের বাড়িতে এলেন। তিনি কলকাতায় তাঁর ঝাউতলা রোডের সাবেক

বাড়িতেই উঠেছেন। তখন তাঁর ওই বাড়ির কাছেই মুসলমান সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হচ্ছিল। হক সাহেব সেই সময় কলকাতা এসেছিলেন তাঁর এখানকার সম্পত্তি বিক্রির বন্দোবস্ত করতে। এই সময়ে দাঙ্গাকারীরা বরিশালে গুজব রটায় যে কলকাতায় হক সাহেবকে খুন করা হয়েছে। এই গুজব ছড়িয়ে তারা নির্বিচারে হিন্দুদের হত্যা করতে থাকে। ডাঃ রায় হক সাহেবকে দ্রুত বরিশালে ফিরে যেতে এবং ওখানকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য অনুরোধ করেন। পরে তিনি তাঁর নিজের গাড়িতে কড়া পুলিশ প্রহরায় ঝাউতলার বাড়িতে পৌঁছে দেন। হক সাহেবও ডাঃ রায়ের কথা মতো দ্রুত বরিশালে ফিবে গিয়েছিলেন।

কিন্তু মার্চ মাসে পূর্ববঙ্গের অবস্থা এমন ভয়াবহ আকার নিল যে, ডাঃ রায় নেহরুকে ফোনে ও চিঠিতে বলতে বাধ্য হলেন যে, পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের রক্ষার জন্য ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপ দরকার। এই বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও কেন্দ্রীয় শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে একমত হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ডাঃ রায় ভারত ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের সমস্যার স্থায়ী মীমাংসার জন্য পাকিস্তানের স্রষ্টা জিন্না সাহেবের লোক বিনিময়ের প্রস্তাবও নেহরুর কাছে উত্থাপন করেছিলেন। মার্চ মাসের মধ্যে ২০/২২ লাখ হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে এসে গিয়েছে। নেহরু ওই মাসেই দু'দুবার কলকাতায় এলেন ও ডাঃ রায়ের সঙ্গে বনগাঁ ও রানাঘাটে গেলেন উদ্বাস্তুদের দেখতে। কংগ্রেস এম এল এ-দের একটি সভায় নেহরু লোক বিনিময়ের প্রস্তাব বিবেচনার আশ্বাস দেন। অবশ্য পরে তিনি এই বিষয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করেননি। ডাঃ রায় নেহরুকে একথাও বলেছিলেন যে, যদি পাকিস্তান পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয় ও হিন্দু উৎখাত বন্ধ না করে, তাহলে উদ্বাস্তু হিন্দুদের পুনর্বাসনের জন্য পূর্ববঙ্গের কিছু অঞ্চল দখল করে নেওয়া হোক। কিন্তু নেহরু এই বিষয়েও রাজি হলেন না। কিন্তু এই প্রশ্নেও সর্দার প্যাটেল ও শ্যামাপ্রসাদ ডাঃ রায়ের পক্ষে ছিলেন। অবশ্য ডাঃ রায় নিশ্চিত ছিলেন যে, একমাত্র যুদ্ধ ছাড়া পাকিস্তানের কাছে থেকে জমি আদায় করা যাবে না। এই সময় একদিন ভারতের প্রধান সেনাপতি জেনারেল কারিয়াপ্পা রাতের দিকে ডাঃ রায়ের বাড়িতে এলেন। তাঁর সঙ্গে বেঙ্গল এরিয়ার জি-ও-সি মেজর জেনারেল এস বি এস রায়। এই দুই সামরিক অফিসার ডাঃ রায়ের সঙ্গে অবিভক্ত বঙ্গ প্রদেশের একটি বড় মানচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত সন্নিহিত পূর্ববঙ্গের কয়েকটি জেলা চিহ্নিত করছিলেন এবং দাঙ্গার সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বরিশাল ও ঢাকা এলাকায় প্যারা সৈন্য কীভাবে নামিয়ে দেওয়া যায় তা নিয়ে মত বিনিময় করেন। পরপর তিনদিন এই দুই জেনারেলের সঙ্গে ডাঃ রায়ের আলোচনা চলে। তাঁরা মানচিত্রে খুলনা, যশোর, কুষ্ঠিয়া, দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী চিহ্নিত করছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন কিছু বাস্তবায়িত হল না। কারণ, প্রধানমন্ত্রী নেহরু কিছুতেই পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। তিনি এই ব্যাখ্যা দিলেন

যে, একবার ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পুরো যুদ্ধ আরম্ভ হলে দুই দেশ এক সর্বগ্রাসী দাঙ্গায় নিমজ্জিত হবে। ২৩ ফেব্রুয়ারি (১৯৪০) নেহরু পার্লামেন্টে চার হাজার শব্দের এক দীর্ঘ বিবৃতি দিলেন পূর্ববঙ্গের দাঙ্গা পরিস্থিতি নিয়ে। ওই বিবৃতিতে তিনি দুই দেশের সংখ্যালঘু সমস্যার মীমাংসার জন্য লোক বিনিময় কিংবা যুদ্ধের সম্ভাবনা বাতিল করে দিলেন। তিনি পার্লামেন্টকে আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে, এখন থেকে বাংলার সমস্যাকে তিনি অগ্রাধিকার দেবেন। তিনি পাকিস্তানেব প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খানের আশ্বাসকে বিশ্বাস করলেন। শেষ পর্যন্ত উভয় দেশের সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার ও নিরাপত্তা দিতে লিয়াকৎ আলি ৩ এপ্রিল (১৯৫০) তারিখে এক বড় প্রতিনিধিদল নিয়ে দিল্লি এলেন। ডাঃ রায় এর কয়েকদিন আগে দিল্লি গিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নেহরু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁব আলোচনা পর্যন্ত ডাঃ রায়কে দিল্লিতে থাকতে অনুরোধ কবেছিলেন। কিন্তু ডাঃ রায় তাতে রাজি হননি। তিনি নেহরুকে বলেছিলেন, দুই প্রধানমন্ত্রীর আলোচনাব মধ্যে তিনি নিজেকে জড়াতে চান না। পরবর্তী ঘটনাবলীতে এটা মনে হয় যে, লিয়াকৎ আলির সঙ্গে আলোচনায় একটা ভাল ফল পাওয়া যাবে, এমন আশা ডাঃ রায়ের ছিল না বলেই তিনি ওই আলোচনার অংশীদার হতে চাননি।

যাহোক ৮ এপ্রিল দিল্লিতে ঐতিহাসিক নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় এই চুক্তি নিয়ে নেহরু প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হলেন শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রিসভার বৈঠকে চুক্তির কড়া সমালোচনা করে বললেন, "নেহরু-লিযাকৎ চুক্তি কখনই নিরাপত্তা দিতে পারবে না।" এর পরপরই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। কর্মদক্ষতা ও দৃঢ় মনোভাবের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় শ্যামাপ্রসাদের প্রভাব এত বেশি ছিল যে, কংগ্রেস পরিষদীয় দল এক জরুরি বৈঠকে মিলিত হয়ে শ্যামাপ্রসাদকে তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য এক নজিরবিহীন প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৪ এপ্রিল (১৯৫০) শ্যামাপ্রসাদ পার্লামেন্টে এক দীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে তাঁর পদত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করেন। ঠিক একই কারণে প্রতিবাদ জানিয়ে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ডাঃ রায় খুবই বিপদগ্রস্ত হলেন। কারণ, শ্যামাপ্রসাদ ও ক্ষিতীশ নিয়োগী দুজনেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ডাঃ রায়ের খুব সাহায্যকারী ছিলেন।

যাহোক, শেষ পর্যন্ত নেহরু-লিযাকৎ চুক্তি অনুযায়ী ভারত ও পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারে সংখ্যালঘুমন্ত্রী নিয়োগের ব্যবস্থা হল। বিধান রায়ের পরামর্শে নেহরু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলার বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাসকে সংখ্যালঘু ও আইন দফতরের মন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। পাকিস্তান সরকারের ওই দফতরের মন্ত্রী হলেন ডাঃ এ এম মালেক। কিন্তু পূর্ববঙ্গের হিন্দু সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার যে শর্তাবলী ওই চুক্তিতে রয়েছে, সেগুলি পাকিস্তানের দিক থেকে লোক

দেখানোর ব্যাপারে পর্যবসিত হল। ফলে হিন্দুদের বাস্তুত্যাগ ও তাদের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও অসমে আগমন অব্যাহত থাকল। ফলে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি সম্পর্কে যেসব আশঙ্কা ব্যক্ত করে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন, তা সত্য ও বাস্তব ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। পাকিস্তানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের বিরোধিতা করে পদত্যাগের পর শ্যামাপ্রসাদ ও ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী যেদিন কলকাতা ফিরলেন, সেদিন তাঁদের সংবর্ধনা জানাতে বলতে গেলে সারা পশ্চিমবঙ্গ ভেঙে পড়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক জীবনে সেটা ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এখানে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে ডাঃ রায়ের দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ হল এই যে, ডাঃ রায় নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তিকে সার্থক হওয়ার একটা সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন। যদিও তাঁর মনে চুক্তির সাফল্য সম্পর্কে গভীর সংশয় ছিল। কিন্তু তিনি ওই চুক্তির বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করেননি, যে পথটি শ্যামাপ্রসাদ বেছে নিয়েছিলেন। এই সময় কলকাতার কয়েকটি খবরের কাগজে এরূপ খবর বের হল যে, নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন মন্ত্রীও পদত্যাগ করেছেন। ১৬ এপ্রিল (১৯৫০) ডাঃ রায় খবরের কাগজে এই বিবৃতি দিলেন "যে উদ্দেশ্য নিয়ে নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, তাকে সফল করতে আমি ও আমার মন্ত্রিসভার সব সহকর্মী পূর্ণ সহযোগিতা করব।" বিবৃতিতে তিনি কয়েকজন মন্ত্রীর পদত্যাগের খবরকে ভিত্তিহীন বললেন। ডাঃ রায় নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তাঁর চিকিৎসক বন্ধু ডাঃ আর আমেদকে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে। ১৫মে (১৯৫০) তারিখে তিনি অসমের মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলুকে নিয়ে ঢাকা গেলেন। নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির পর কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গের শিবির থেকে দেশে ফিরে গিয়েও ঘরবাড়ি ফেরত না পাওয়ায় যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, ডাঃ রায় সেসব বিষয় নিয়ে পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের সঙ্গে কথা বলেন। পূর্ববঙ্গের আইনসভার কয়েকজন হিন্দুসদস্য ও বিভিন্ন প্রতিনিধিরা ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন দেশপ্রিয় সহধর্মিণী নেলি সেনগুপ্তা, যতীন্দ্রনাথ সেন, আশালতা সেন, ভবেশ নন্দী। আগস্ট মাসের শেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক প্রেস নোটে জানান যে, নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি স্বাক্ষরের পর এপ্রিল মাসের (১৯৫০) মাঝামাঝি সময় থেকে আগস্ট মাসের (১৯৫০) শেষ অবধি পূর্ববঙ্গ থেকে ৪ লাখ ৬০ হাজার ৬১০ জন হিন্দু পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে। ওই সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১ লাখ ৩৯ হাজার ৯৯০ জন মুসলমান পূর্ববঙ্গে চলে গিয়েছে। পূর্ববঙ্গের এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও তার ভয়াবহ সামাজিক প্রতিক্রিয়ার মোকাবিলায় বিধানচন্দ্র যে সব সুদূরপ্রসারী ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, তা তাঁকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের এক উচ্চশিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। এই সময় তিনি প্রতিদিন একদিকে মধ্যপন্থী নেহরু ও ঠিক তাঁর বিপরীত মেরুর ব্যক্তিত্ব সর্দার

প্যাটেলের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। পূর্ববঙ্গের দাঙ্গা ও পশ্চিমবঙ্গে তার বদলা দাঙ্গার ব্যাপারে নেহরু কলকাতার খবরের কাগজগুলির কড়া সমালোচক ছিলেন। নেহরুর মতে কলকাতার কাগজগুলি 'সাম্প্রদায়িক।' কিন্তু সর্দার প্যাটেল তা মনে করতেন না। এই প্রশ্নে তিনি অনেকটাই শ্যামাপ্রসাদের মতের সঙ্গে একমত ছিলেন। শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে সর্দার প্যাটেল পাকিস্তানকে এই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে, যদি পাকিস্তান হিন্দুদের উপর অত্যাচার বন্ধ না করে, তাহলে হিন্দু বাস্তুত্যাগীদের পুনর্বাসনের জন্য পূর্ববঙ্গের জমি ভারতকে হস্তান্তর করতে পাকিস্তানকে বাধ্য করা হবে। শ্যামাপ্রসাদ ৩০ জুলাই (১৯৫০) পার্লামেন্টে নেহরুকে এই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে, পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সামাজিক সমস্যার দ্রুত সমাধান করতে সরকার না পারলে দেশে এক অদৃশ্য বিপ্লব সংগঠিত হবে। তাঁর মতে উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের তিনটি উপায় আছে। ওই উপায় তিনটি হল :— (১) ভারত ও পাকিস্তানের একীকরণ, (২) পরিকল্পিতভাবে লোক বিনিময় ও নতুবা (৩) উৎখাত করা হিন্দুদের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ভারতকে দিতে পাকিস্তানকে বাধ্য করা। কিন্তু নেহরু ওই তিনটি বিকল্পকেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে ঘোষণা করলেন। তাঁর মতে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ও ভারতের নিজস্ব সংবিধানেই ওই ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব নয়। কিন্তু এই উপমহাদেশের পরবর্তী ঘটনাবলীর ভিত্তিতে ইতিহাস এ কথাই বলবে যে, পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ও হিন্দু সংখ্যালঘুদের রক্ষার ব্যাপারে পাকিস্তানি শাসকদেব আশ্বাসের কোন মূল্য নেই। এই প্রশ্নে সর্দার প্যাটেল, শ্যামাপ্রসাদ ও বিধান রায় তাঁদের আলাদা চিন্তাধারায় যেসব ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নেহরুর কাছে সুপারিশ করেছিলেন, ইতিহাস তাতেই সায় দেবে। কারণ ১৯৪৭ সালেব দেশ বিভাগের সময় থেকে ১৯৭০ সালের শেষ অবধি পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুদের উৎখাত বিরামহীনভাবে চলেছে এবং পুনর্বাসনের জন্য আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাক বা নাই যাক, কেবল দৈহিক নিরাপত্তার জন্য পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও অসমে প্রবেশ ছিল অব্যাহত।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে বিভিন্ন নতুন পন্থা উদ্ভাবন

১৯৪৭ সালের জুন-জুলাই মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি (এ আই সি সি) দেশ বিভাগের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনাকালে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের বারংবার যে সব প্রতিশ্রুতি রাষ্ট্রনেতারা দিয়েছিলেন, ডাঃ রায় নেহরু, সর্দার প্যাটেল ও অন্যান্য প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীদের প্রতিদিনই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস নেতা ও প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীদের বুঝিয়ে দিতে দ্বিধা

করেননি যে, পূর্ববঙ্গ থেকে উৎখাত হিন্দুরা কেবল ভাষাগত কারণে প৺িমবঙ্গের সমস্যা নয়, এটা ভারতের জাতীয় সমস্যা। ইতিহাসগতভাবে এটা অনস্বীকার্য যে ডাঃ রায়ের এই কাজে তাঁর মস্তবড় সহায় ছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রশাসনিক দক্ষতার সঙ্গে উদ্ভাবনী শক্তির মিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি উত্তর, দক্ষিণ ও রাঢ়বঙ্গের অনুর্বর পতিত জমিতে উদ্বাস্তু উপনিবেশ গড়ে তুলেছেন। বিহারের শিল্পাঞ্চলের কাছাকাছি স্থানে বাঙালি উদ্বাস্তুদের বসতি স্থাপন করিয়ে দিয়েছেন। ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশেব সীমান্তবর্তী খনিজ সমৃদ্ধ রায়গড় অঞ্চলে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন। কেন্দ্রশাসিত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের আশায তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে স্থানীয় প্রশাসনে বাঙালি আই সি এস ও বি সি এস অফিসারদের পোস্টিং করিয়েছেন। লক্ষাধিক কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী উদ্বাস্তুকে তিনি আন্দামানের মাটিতে অবতরণ করিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির লোকজন ও গুপ্তচরেরা আন্দামানের মাটিতে ও জাহাজে উদ্বাস্তুদের দিযে বিদ্রোহ ঘটিয়ে ডাঃ রায়ের বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ পবিকল্পনাকে বানচাল করে দিযেছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও যে কয়েকশ উদ্বাস্তু পরিবার আন্দামানে থেকে গিয়েছিলেন, তাঁরা আজ অর্ধশতাব্দী পরে আন্দামানের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করে রয়েছেন।

এই সময় ডাঃ রায় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও প্রশাসনের জন্য উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দফতর স্থাপন করলেন। এই দফতরেব কমিশনারের পদে তিনি প্রবীন আই.সি.এস অফিসার হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যাযকে নিযুক্ত করলেন। উদ্বাস্তুদের প্রতি মমত্ববোধ ও ধৈর্যশীল এমন অফিসার তখনকার ভারতীয় প্রশাসনে বিরল ছিল। তিনি প্রায় দীর্ঘ দশবছর ওই পদে ছিলেন। হিরন্ময়বাবু যখন ওই দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, তখন ফেব্রুয়ারি শেষ কিংবা মার্চ মাসেব (১৯৫০) গোড়ার দিক। ওই সময় থেকে ১৯৫০ সালের মে মাস পর্যন্ত বনগাঁ-শিযালদা শাখার ও শিয়ালদা মেন লাইনের গেদে থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত প্রতিটি রেল স্টেশনের প্লাটফরমে যশোর রোড ও বারাকপুর ট্রাংক রোডের দু'পাশে ও রানাঘাট থেকে ধুবুলিয়া পর্যন্ত কৃষ্ণনগর-বহরমপুরে রোডের উভয় দিকে কম ১৫ লাখ উদ্বাস্তু খোলা আকাশের নীচে জীবন যাপন করছিল।

খুব স্বাভাবিকভাবে উদ্বাস্তুদের এক অংশ চেষ্টা করে যেখানে ফাঁকা জমি শহরের কাছে পাওয়া যায় সেখানেই জবরদখল করে বসে যেতে। কলকাতা শহরের দশ পনেরো মাইলের মধ্যে প্রায় দুশোব মতো বৃহৎ সৌধ ও বাগানবাড়ি পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। এগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কাল পর্যন্ত বাংলার রাজা মহারাজা, নবাব ও জমিদারদের প্রমোদভবন হিসাবে ব্যবহৃত হত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছুটা চোখ-কান বুজে থেকে এগুলিকে উদ্বাস্তুদের অস্থায়ী বাসভূমিতে পরিণত করলেন। এভাবে বাঁচার তাগিদে উদ্বাস্তুরা কলকাতা মহানগরীর চৌহদ্দির মধ্যে অসংখ্য কলোনি গড়ে তুলল। ওইসব

অট্টালিকা ও প্রাসাদসংলগ্ন শত শত বিঘা জমিতে উদ্বাস্তুরা বসতি স্থাপন করে ফেলল। ওই সব জমির মালিকেরা পুলিশের কাছে তাঁদের সম্পত্তি দখলের নালিশ জানালেন। পুলিশকে সরকারের তরফে মৌখিকভাবে বলা ছিল উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে এ ধরনের কোন নালিশ ডায়েরিভুক্ত না করতে। সম্ভবত বিধান রায়ের নেতৃত্বের জন্যই ওই অট্টালিকা, প্রাসাদের মালিকেরা সরকারেব বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করেননি। এইসব মালিকদের ওয়ারিশনরা যাতে ভবিষ্যতে উদ্বাস্তু উচ্ছেদে মামলা-মোকদ্দমা করতে না পারেন, সম্ভবত সেজন্য ডাঃ রায় দ্রুত ১৯৫৩ সালেই জমিদারি দখল আইন পাশ কবিয়ে নিলেন বিধানসভায় যার ফলে ১৯৪৪ সালের ১৪/১৫ এপ্রিল (বাংলা পয়লা বৈশাখ) তারিখ জমিদারি দখল আইন কার্যকব হল। সীমান্তবর্তী নদীয়া ও চব্বিশ পরগনা জেলার বিভিন্নস্থানে জমায়েত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য ডাঃ রায় প্রতিরক্ষা দফতরের কাছ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ধুবুলিয়া, হাবড়া, কাঁচড়াপাড়া ও বর্ধমানের অঞ্চলে বিমানঘাঁটির বিস্তীর্ণ এলাকা রাজ্য সরকারের দখলে নিয়ে এলেন উদ্বাস্তু শিবির স্থাপনেব জন্য। এসব স্থানে দেশবন্ধু, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, নেহরু, শ্যামাপ্রসাদ, বিধান, সর্দার প্যাটেল, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি জাতীয় নেতার নামে নামে উদ্বাস্তু কলোনি গড়ে উঠল। এছাড়া বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা ও শহিদ অরবিন্দ, ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন, বিনয়-বাদল-দীনেশের নামেও অসংখ্য কলোনি গড়ে তোলা হল। এইসব জবরদখল কলোনিগুলিতে স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তুলে ও এগুলোকে আইনগত স্বীকৃতি দিতে ডাঃ বায় কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রী অজিতপ্রসাদ জৈনের শরণাপন্ন হয়েছিলেন বহুবার। ১৯৪৭ সাল নাগাদ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উদ্বাস্তু নেতা মেহেরচাঁদ খান্না কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় ডাঃ রায়ের খুবই সুবিধা হয়েছিল। ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে ডাঃ রায় নদীয়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, বর্ধমান এবং উত্তরবঙ্গের উদ্বাস্তু অধ্যুষিত অঞ্চলে অর্ধশতাধিক স্কুল ও কলেজ পুনর্বাসন খাতের টাকায় স্থাপন করতে পেরেছিলেন। এগুলির মধ্যে কয়েকটি কলেজকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'স্পনসর্ড' অর্থাৎ আধা সরকারি কলেজের মর্যাদা দিয়েছিলেন। মেহেরচাঁদ খান্নার সহৃয়তার জন্য ওই সময়ে মধ্যমগ্রাম ও বিরাটি স্টেশনের মধ্যবর্তীস্থলে তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে পরিকল্পিত উদ্বাস্তু উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল 'নিউ ব্যারাকপুর' নামে। এই উপনিবেশের সংকটে হরিপদ বিশ্বাস ডাঃ রায়ের খুব স্নেহভাজন ছিলেন। সরকারি নিয়মে যে কাজটি করাতে ডাঃ রায়ের বিলম্ব হত, সে কাজটি তিনি হরিপদ বিশ্বাসকে দিয়ে মেহেরচাঁদ খান্নার কাছ থেকে করিয়ে আনতেন। ১৯৫৬।৫৭ সালে তিনি এখানে নতুন রেলস্টেশন স্থাপন করিয়ে দেন। প্রতিটি কলোনি এলাকায় উদ্বাস্তুরা নিজেরাই যাতে দোকান বাজার চালাতে পারে, সেজন্য তিনি আর্থিক সাহায্য ও ঋণের ব্যবস্থাও ধরেছিলেন। যার ফলে কলোনিগুলির চারপাশে অসংখ্য

দোকানপাট গড়ে ওঠে ও উদ্বাস্তুদের রুজি-রোজগারে কতকটা বিকল্প সহায়তা আসে। অবসর সময়ে ও সন্ধ্যাবেলা উদ্বাস্তুদের চিত্ত বিনোদনের জন্য যাত্রা-থিয়েটার ও গানের জলসা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ডাঃ রায় নাট্যকার মন্মথ রায়, সঙ্গীতজ্ঞ পঙ্কজ মল্লিক, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেনদের সঙ্গে বৈঠক পর্যন্ত করেছিলেন। এসব ঘটনায় প্রমাণ হয় যে উদ্বাস্তুদের মানসিক পুনর্বাসনের জন্যও তাঁর চিন্তা কতদূর প্রসারিত ছিল। প্রথম থেকে একশ্রেণীর রাজনৈতিক লোকের প্রচার ও প্ররোচনায় ডাঃ রায়ের এই উদ্যোগকে উদ্বাস্তুদের একাংশ বাধা দিয়েছিল। তারপর তারাই যখন দেখল কমিউনিস্ট পার্টির গণনাট্য সংঘ উদ্বাস্তু কলোনিগুলিতে রাজনৈতিক প্রচার সম্বলিত নাটক ও গানের আসর আবম্ভ করল, তখন তারাই ওই বিরোধিতার পথ ছেড়ে দিল। উদ্বাস্তু কলোনিগুলিতে এরূপ নাটক অভিনয় ও সঙ্গীতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকাবেব নিজস্ব সংস্কৃতিক দফতর (ফোক এন্টারটেনমেন্ট সেকশান)।

এই বছরগুলিতে পশ্চিমবঙ্গে বিপুল খাদ্য ঘাটতি ছিল। অবশ্য সারা দেশে তখন খাদ্যে ঘাটতি ছিল ও খাদ্যশস্য ছিল কন্ট্রোল ব্যবহার অধীনে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। একদিকে উদ্বাস্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রায দু'লাখ একর জমিতে পাটচাযের জমিতে রূপান্তব ও অন্যদিকে একদা বঙ্গপ্রদেশের শস্যভাণ্ডার বলে প্রসিদ্ধ জেলাগুলি পূর্ববঙ্গের ভাগে চলে যাওয়ায় অবস্থা খুবই সংকটজনক হয়ে উঠতে লাগল। ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ঘাটতির পরিমাণ ছিল দু'লাখ টনেরও বেশি। চালের মজুত ভাণ্ডার দ্রুত নিঃশেষ হতে থাকলে কলকাতার রেশনিং ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হল। উদ্বিগ্ন ডাঃ রায় তাঁর মন্ত্রিসভার সহকর্মীদেব ও রাজ্যেব কংগ্রেস নেতাদের কাছে আবেদন জানালেন চাল খাওয়া বন্ধ করতে, অন্তত কম খেতে। ওই সময় তিনি প্রতি সপ্তাহে দিল্লি গিযে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তদ্বিব করে কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার থেকে পশ্চিমবঙ্গের জন্য ববাদ্দ বাড়িযে আনতেন। তৎকালীন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী রফি আমেদ কিদোযাই এক্ষেত্রে ডাঃ রাযের মস্ত সহায়ক ছিলেন ও পশ্চিমবঙ্গের দুববস্থা দেখতে তিনি বেশ কয়েকবার কলকাতা সফর করেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গ আর একটা দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা পেল।

এদিকে জনজীবনে যখন এই সংকট চলছে, তখন পশ্চিমবঙ্গেব কংগ্রেস সংগঠনে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। একদিকে অতুল্য ঘোষের নেতৃত্বে হুগলি, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের কংগ্রেস কর্মিগণ মন্ত্রিসভাব ডাঃ রায়ের নেতৃত্বের প্রতি অনুগত ও অন্যদিকে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে 'অভয় আশ্রম' গোষ্ঠী ও সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের নেতৃত্বে 'যুগান্তর' গোষ্ঠী এককাট্টা হয়ে ডাঃ রায়ের বিরোধিতায় অবতীর্ণ। ১৯৫০ সালের নাসিকে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ওই বিরোধের অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল। ১৭ সেপ্টেম্বর (১৯৫০) প্রদেশ

কংগ্রেসের ওই নির্বাচনে হুগলি গোষ্ঠীর নেতা অতুল্য ঘোষ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন ডাঃ রাযের অতি ঘনিষ্ঠ বিজয় সিং নাহার। এঁরা দুজন ডাঃ রাযেব জীবদ্দশা পর্যন্ত তাঁর পাশে স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়েছিলেন। ওই সময়ের মধ্যে অতুল্য ঘোষের নেতৃত্বও মাত্র দু'বার চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল। প্রথমটি ছিল, ১৯৫৬ সালে বাংলা-বিহার সংযুক্তির প্রশ্নে কলকাতা উত্তর-পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী অশোক সেনের পরাজয়। ডঃ মেঘনাদ সাহার মৃত্যুতে এই কেন্দ্রে উপনির্বাচন হযেছিল। তবে এই পরাজয়ের দায়ভাগ সবটাই ডাঃ রায় নিজেই প্রকাশ্যে গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয়বার ১৯৫৮ সালে ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভা থেকে সিদ্ধার্থশঙ্কব রায়েব পদত্যাগের পর। সিদ্ধার্থবাবু একইসঙ্গে মন্ত্রিসভা ও বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করলে তাঁর দক্ষিণ কলকাতার ওই অঞ্চলে উপনির্বাচন হয। উপনির্বাচনে সিদ্ধার্থবাবু কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থীদের সমর্থনে কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাস্ত করে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। পদত্যাগের সময় সিদ্ধার্থবাবু বিধানসভায় এক বিবৃতি দিয়ে অতুল্য ঘোষ ও খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে "Diablocal murderer" বলে নিন্দা করেছিলেন। এখানেও ডাঃ রায় দৃঢ়ভাবে অতুল্য ঘোষেব পাশে দাঁড়িযে তাঁর নেতৃত্বকে সুরক্ষিত করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জির নেতৃত্বে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী যাঁরা বাংলাব রাজনৈতিক ইতিহাসে 'অভয় আশ্রম গোষ্ঠী' নামে পরিচিত তাঁরা ১৯৫০ সালের শেষদিকে কংগ্রেস ছেড়ে বেবিয়ে গেলেন এবং কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি নামে আলাদা বাজনৈতিক দল গঠন করলেন। অবশ্য এঁদের প্রায় বছরখানেক আগে কংগ্রেস পবিষদীয় দলের সম্পাদক হেমন্তকুমার বসু কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগ দেন। কিন্তু ডাঃ রায়ের জাতীয ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসকে এসব চ্যালেঞ্জ থেকে রক্ষা করল। কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি ১৯৫১ সালে সর্বভারতীয় রূপ পেল। যখন এই পার্টি মিলিত হন কৃপালনিব নেতৃত্বে বিভিন্ন রাজ্যের অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী ও গান্ধীবাদী নেতাদের নিয়ে সংগঠিত (এঁদের মধ্যে আচার্য নরেন্দ্র দেব, জয়প্রকাশ নারায়ণ, ডঃ রামমনোহর লোহিয়া টি প্রকাশক, এইচ ভি কামাথ, খান্দুভাই দেশাই, পত্তম থানু পিল্লাই, অশোক মেহতার নাম উল্লেখযোগ্য।) প্রজা সোসালিস্ট (পি.এস.পি.) পার্টিতে। যাহোক ১৯৫১ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশন আরম্ভ হলে সদ্য কংগ্রেস ত্যাগী সাবেক কংগ্রেস সদস্যরা ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে বিরোধী আসনে বসলেন। ২ জন কমিউনিস্ট সদস্য জ্যোতি বসু, রতনলাল ব্রাহ্মণ এবং মুসলিম লিগের ৯ জন সদস্যকে নিয়ে তখন বিরোধীদের মোট সংখ্যা ছিল ১৯। বিধানসভায় ও বাইরে ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভাকে হেনস্তা করার জন্য কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি ও কমিউনিস্টরা একযোগে উদ্বাস্তুদের ব্যবহার করা শুরু করল। অবশ্য এ দুয়ের মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শগত ফারাক ছিল

সীমাহীন। কিন্তু ডাঃ রায় ও প্রদেশ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তারা একরব। রাজ্যপাল কৈলাসনাথ বাটজু বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধন করে জানালেন যে, ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত আশ্রয় শিবিরে বসবাসকারী ২৩ লাখ উদ্বাস্তুর মধ্যে ১২ লাখের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছে। ১১ লাখের এখনও কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া নতুন উদ্বাস্তু আগমন অব্যাহত আছে। এদিকে কলকাতার আশেপাশে ও শহরের কোন কোন স্থানে উদ্বাস্তুরা কারো কারো বসতবাটির একাংশ দখল করায় এক নতুন সামাজিক উত্তেজনা দেখা দিল। বাধ্য হয়ে রাজ্য সরকার বাজেট অধিবেশনে 'অননুমোদিত দখলদার উচ্ছেদ' বিল ওই অধিবেশনে পেশ করলেন। এই বিলকে 'উদ্বাস্তু স্বার্থ-বিরোধী' আখ্যা দিয়ে বিরোধী দলগুলি সম্মিলিতভাবে এক বিরাট বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করল। ১৯৫১ সালের ২৮ মার্চ ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে বিধানসভা অভিযানের জন্য এক বড় মিছিল বের হল। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতি বসু, আশুতোষ লাহিড়ী, লীলা রায়, অধ্যাপক সমর গুহ ও অন্যান্যরা। এসপ্লানেড ইস্ট ও ডেকার্স লেনের মুখে এসে মিছিলকারীরা ১৪৪ ধারা অমান্য করার চেষ্টা করলে পুলিশ তাঁদের আটকায়। পুলিশ কর্ডন করে নেতাদের গ্রেফতার করলে জনতার সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ বাধে। এই সময় বিধানসভাব ভিতরে পুরো ধকল ডাঃ রায়কে একাই সামলাতে হয়। একদিকে কিবণশঙ্কব রায় নেই ও অন্যদিকে সুযোগ্য অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার অসুস্থ। ফলে বিবোধীদেব পুরো আক্রমণের সমস্ত ভার ডাঃ রায়কেই প্রতিহত করতে হয়। অসুস্থ অবস্থায় হুইল চেয়ারে বসে অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার ১৯৫১-৫২ সালের বাজেট পেশ করলেন। বাজেটে ওই বছরে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ধরা হয়েছিল ৩৪ কোটি টাকা ও ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছিল ৩৮ কোটি ৮ লাখ টাকা। দেশবিভাগের ফলে উইপোকার কাটা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে এটা ছিল এক বড় অগ্রবর্তী পদক্ষেপ। দেশবিভাগের আগের দিনগুলিতে বাংলার অর্থনীতির যে জ্বলজ্বলে ভাব ছিল, এই বাজেট ছিল পশ্চিমবাংলাকে অনেকটা সেদিকে নিয়ে যাওয়ার এক চেষ্টা। রাজ্যের এই অবস্থায় ডাঃ রায় ১৭ এপ্রিল (১৯৫১) প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে চিঠিতে লিখলেন :—

"আপনার চিঠি আমাকে কেবল এই প্রদেশ সম্পর্কে নয় সারা ভারতবর্ষ সম্পর্কে ভীষণ ভাবিয়ে তুলেছে। এ সম্পর্কে একজনের প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে তার চারপাশের পরিবেশের উপর। এই প্রদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনি যা বলেছেন তা ঠিকই। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সে সমস্যা রয়েছে তা এভাবেই দেখতে হবে। উদ্বাস্তুরা পূর্ববঙ্গ থেকে এক সাংঘাতিক মানসিক উত্তেজনা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকছে। তাদের ওই মানসিক অবস্থার মধ্যে উগ্রবাদী রাজনৈতিক লোকেরা তাদের কব্জা করে তাদের দিয়ে সরকার ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন

ধরনের প্রচারে নামাচ্ছে। এছাড়া আমার এই প্রদেশে বাঙ্গালি-অবাঙ্গালি সমস্যাও রয়েছে। এখানে মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ হয়তো তার কিছু বেশিও অবাঙ্গালি বসবাস করেছে। কমিউনিস্ট ফরোয়ার্ড ব্লকের মতো এটাও আমাদের একটা সমস্যা। এই মুহূর্তে আমার এখানে ওই দল দুটি খুবই সক্রিয়। এছাড়া আর একটি সমস্যাও আছে ; তা হল, দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এক বিপুল সংখ্যক কংগ্রেস কর্মী, বহু অসুবিধার ফলে কংগ্রেস ছাডতে বাধ্য হয়েছে। এই শ্রেণীর লোকেরা কংগ্রেসকে হেয় করার জন্য উঠে পড়ে লেগে এবং হাতের কাছে যে কোন সুযোগ পেলেই তারা কংগ্রেস ও কংগ্রেস পরিচালিত সরকারকে অপদস্থ করে চলেছে। এর উপর তপশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরাও এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদের মধ্যে একটা হীনমন্যতাবোধ রয়েছে, যা থেকে তারা সব সময়েহ মনে করে চলেছে যে, তাদের যা পাওয়া উচিত, তা তারা কংগ্রেসের কাছ থেকে পাচ্ছে না। তবে এসব সমস্যার কথা ছেড়ে দিলেও এখন আমার সামনে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে গুণ্ডাবাজি ও গুণ্ডাদের কার্যকলাপ। এই গুণ্ডারা সকলেই যে কোন একটি রাজনৈতিক দলের সদস্য বা গোষ্ঠীভুক্ত তা নয়। তবে তারা সব সময়েই বিশৃংখল পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে থাকে।”

তাঁর মাথার উপর পশ্চিমবাংলার বিপুল সমস্যা নিয়েও তিনি প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতেন। সাধারণভাবে অসমের বাঙ্গালিদের একটা সমস্যা দীর্ঘদিন থেকে সেখানে রয়েছে। ১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গের দাঙ্গার পর ওই রাজ্যে বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু এসে আশ্রয় নেয়। ফলে সমস্যা আরও বেড়ে যায়। এদিকে পঞ্চাশের শেষদিকেই মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলুই অকস্মাৎ মারা গেলে ওই রাজ্যের নেতৃত্ব এসে পড়ে বিষ্ণুরাম মেধির উপর। ডাঃ রায় মেধিকে পছন্দ করতেন। এছাড়া তিনি চাইছিলেন অসমের মেধি মন্ত্রিসভায় একজন যোগ্য ও শক্ত ধাতের বাঙ্গালির স্থান হোক। অনিবার্যভাবেই তাঁর চোখ পডল ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার বৈদ্যনাথ মুখার্জির উপর। উল্লেখযোগ্য যে দাঙ্গাব সময় ঢাকার ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার সন্তোষ কুমার বসুর ভূমিকা পূর্ববঙ্গে র সংখ্যালঘু হিন্দুদের অনুকূল না থাকার ডাঃ রায় সন্তোষ বাবুর উপর খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। সেই সময় ডাঃ রায়ের পরামর্শেই নেহরু অসমের বাঙ্গালি কংগ্রেস নেতা বৈদ্যনাথ মুখার্জিকে ঢাকায় পাঠিয়ে সন্তোষ বসুর স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বৈদ্যনাথবাবুর অসমের রাজনীতিতে ফিরে আসা দরকার মনে করে ডাঃ রায় নেহরুকে অনুরোধ করলেন বৈদ্যনাথ বাবুকে অসমের রাজনীতিতে ফিরিয়ে দিতে। বৈদ্যনাথবাবু ঢাকা থেকে অসমে ফিরে মেধি মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী নিযুক্ত হলেন। এদিকে আমেরিকার ‘টেনেসি ভ্যালি’ প্রকল্প ডাঃ রায়কে ১৯৪৭ সাল থেকেই প্রভাবিত করে আসছিল। তিনি ভাবলেন ভারতে ওইরকম একটি বহু উদ্দেশ্য সাধক নদী উপত্যকা প্রকল্প জনগণের বিশেষ উপকারে আসতে পারে।

জলাধার নির্মাণ করে বন্যার জল সংরক্ষণ, সেচের কাজে ওই জল ব্যবহার, জলস্রোত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতি ব্যবস্থা ওই রকম একটি প্রকল্পের দ্বারা হতে পারে। তিনি প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে বিষয়টি বুঝিয়ে দিলেন। নেহরু চমৎকৃত হয়ে 'টেনেসি ভ্যালি'র আদলে একটি নদী-উপত্যকা কর্তৃপক্ষ গঠনে রাজি হলেন। রচিত হল দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন বা ডি-ভি-সি। এই সংস্থার সমান অংশীদারিত্ব রইল বিহার, কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে। এই সংস্থার পরিপূরক হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কানাডা সরকারের সহাযোগিতায় বিহার সংলগ্ন মশানজোড়ে একটি জলাধার নির্মাণ করলেন। এই জলাধারের জল ময়ূরাক্ষী সেচ প্রকল্পের জলাধারের সহায়ক হিসাবে কাজ করছে। ১৯৫৬ সালে কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও জওহরলাল নেহরুর ব্যক্তিগত বন্ধু লেস্টার পিয়ারসন (Lester Pearson) মশানজোড়ে এসে ওই জলাধারের উদ্বোধন করলে ওই বাঁধের নাম দেওয়া হল কানাডা বাঁধ (Canada Dam)। ওই বছরেই লেস্টার পিয়ারসন নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন। ইতিমধ্যে ময়ূরাক্ষী সেচ প্রকল্পের অধীন তিলাইয়া জলাধার ১৯৫১ সালেই সম্পূর্ণ হয়ে গেলে ওই বছরের ৩০ জুলাই ডাঃ রায় ওই জলাধার থেকে জল ছাড়া উদ্বোধন করলেন। বীরভূম জেলাবাসীর পক্ষে এটি একটি ঐতিহাসিক দিন। ডাঃ রায় জলাধারের সুইচ টেপার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকনা সরে গিয়ে উদ্‌গত জলরাশি প্রবল বেগে ১৩০ মাইল দীর্ঘ ময়ূরাক্ষীর সেচখালগুলি দিয়ে বয়ে চলল।

এদিকে ১৯৫০ সালের ১৫ ডিসেম্বর বোম্বাইতে সর্দার প্যাটেল পরলোক গমনে কংগ্রেস সংগঠনে ও জাতীয় নেতৃত্বে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হল। শোকাহত ডাঃ রায় বললেন, "এটা আমার এক নিদারুণ ব্যক্তিগত ক্ষতি। আমি পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণের সময় থেকে আমাদের দু'জনের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনায় আমি তাঁর বাস্তব পরামর্শের উপর সবসময় নির্ভর করেছি ও তাঁর পরামর্শ আমি গ্রহণ করেছি।" সর্দার প্যাটেলের শূন্যস্থান পূরণের জন্য নেহেরু বিধানচন্দ্র রায়কে চাইলেন। কিন্তু দিল্লির ঝলমলে তখত্-তাউসে বিধানের তেমন আগ্রহ ছিল না। তিনি তার প্রিয় বঙ্গভূমির প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন এবং তিনি কিছুতেই কলকাতা ছাড়তে রাজি হলেন না। নেহরুর প্রস্তাব তিনি সরাসরি নাকচ করে দিলেন। সর্দার প্যাটেলের মৃত্যুর পর কংগ্রেস সংগঠনে এক বড় সংকট দেখা দিল। বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস কমিটিগুলি, তাদের নেতা ও কর্মীরা এমন কী মুখ্যমন্ত্রীরা পর্যন্ত দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। একটি শিবির ছিল নেহরু পন্থীদের ও অন্যটি ছিল কংগ্রেস সভাপতি পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডনের সমর্থকদের। ডাঃ রায় মনে করলেন যে দেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের মুখে কংগ্রেসের এই বিভেদ নির্বাচনের উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলবে। এই বলা দরকার যে ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বরে নাসিক কংগ্রেসে নির্বাচনে নেহরুর মনোনীত

প্রার্থী ছিলেন আচার্য কৃপলানি ও সর্দার প্যাটেল মনোনীত প্রার্থী ছিলেন পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন। ট্যান্ডনের জয়লাভ বলতে গেলে কংগ্রেস সংগঠনে নেহরু নেতৃত্বেরই পরাজয় সূচিত করেছিল। ডাঃ রায় ব্যক্তিগতভাবে নেহরুর সমর্থক। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস ছিল ট্যান্ডনের পক্ষে। সর্দার প্যাটেলের মৃত্যুতে ট্যান্ডন শিবির হতাশ হয়ে পড়লেও দুর্বল হয়নি। কংগ্রেসে নেহরুর সমর্থকদের একটি প্রভাবশালী অংশ আচার্য কৃপলানির নেতৃত্বে কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এলেন ১৯৪১ সালের মার্চ মাস নাগাদ। এই দলের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন রফি আমেদ কিদোয়াই ও অজিতপ্রসাদ জৈন। এঁরা দুজনেই তখন নেহরু মন্ত্রিসভার সদস্য ও নেহরুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এই দলত্যাগ ছিল প্রকৃতপক্ষে ট্যান্ডনের প্রতি অনাস্থারই নামান্তর। কৃপলানি, কিদোয়াই ও অজিতপ্রসাদ জৈন পশ্চিমবঙ্গে সদ্য গঠিত ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের কৃষক মজদুর পার্টিতে যোগদান করলে আচার্য কৃপলানি ওই পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি মনোনীত হলেন। ইতিমধ্যে ডাঃ রায় মধ্যস্থের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। তাঁর এই ভূমিকাকে দিল্লির কিছু কিছু খবরের কাগজ সুনজরে দেখেনি। ওই কাগজগুলি এ ব্যাপারে ডাঃ রায়কে 'হস্তক্ষেপকারী' বলে কটাক্ষ করেছিল। যাহোক, ডাঃ রায় পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডনকে অনেক বুঝিয়ে তাঁকে কংগ্রেস সভাপতির পদে ইস্তফা দিতে রাজি করালেন। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ও নেহরুর বারংবার অনুরোধের ফলে রফি আমেদ কিদোয়াই ও অজিতপ্রসাদ জৈন কংগ্রেসে ফিরে গেলেন। কিন্তু কৃপলানির নেতৃত্বে আর যেসব নেতা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা কেউই ফেরেননি।

স্বাধীনতালাভের পরও পরবর্তী একযুগ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বিহার, ওড়িশা ও সারা উত্তর পূর্বাঞ্চলের ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার আকর্ষণ স্থল। ১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গের দাঙ্গার পর হাজার হাজার উদ্বাস্তু ছেলেমেয়েদের উপস্থিতি এক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক বোঝা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সদস্য হিসাবে স্যার আশুতোষের আমল থেকে উচ্চশিক্ষ'র সম্প্রসারণে ডঃ রায়ের আগ্রহ সুবিদিত। ১৯৪২-৪৩ দল থেকেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, একা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তার আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে এই বিপুল সংখ্যক ছাত্রদের চাপ সহ্য করতে পারবে না। তিনি ঘন ঘন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তদ্বির করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাছ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য টাকার বন্দোবস্ত করছিলেন। এই অবস্থায় তিনি ১৯৫৫ থেকে

এই পাঁচ বছরে রাজ্যে যথাক্রমে যাদবপুর, বর্ধমান, কল্যাণী ও উত্তরবঙ্গ এ-চারটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ নামে যে ঐতিহাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয় আন্দোলনের স্রোতে যাদবপুরে গড়ে উঠেছিল তাকে তিনি প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ দিলেন ১৯৫৫ সালে। ডাঃ রায় তখন এই শিক্ষা পরিষদের সভাপতি ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদে কারিগরি শিক্ষা প্রবর্তিত

হয়েছিল ১৯০৫ সালের পর থেকেই। উত্তরবঙ্গ, বিশেষ করে রাজ্যের পার্বত্য এলাকার জনগণের দীর্ঘদিনের চাহিদা অনুযায়ী তিনি শিলিগুড়ির কাছে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে মনস্থ করলেন। তিনি জানতেন, ভৌগোলিক দূরত্বের জন্য উত্তরবঙ্গের লোকেরা নিজেদের 'বিচ্ছিন্ন ও অবহেলিত' মনে করে আসছে। তাদের মন থেকে এই হতাশা দূর করার জন্য তিনি নিজে কয়েক বৎসর পরে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে শিলিগুড়ির অদূরে নয়নাভিরাম বনাঞ্চল পরিবেষ্টিত এক বিস্তীর্ণ এলাকা নির্বাচন করলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য। এর কাছাকাছি আর একটি জায়গা বেছে নিলেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের জন্য।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষপর্বে যখন রিচার্ড কেসি বাংলার গভর্নর ছিলেন, তিনি হরিণঘাটাকে পছন্দ করেছিলেন গো-মহিষাদি ও হাঁস মুরগি পালনের খামার হিসাবে। এখানে তখন ছিল একটি বিমানঘাঁটি। কাছেই ছিল কাঁচড়াপাড়া রেল কারখানা ও রেল জংশন। ১৯৫০ সালের পর সময় থেকে হরিণঘাটার চারপাশে অসংখ্য উদ্বাস্তু কলোনি গড়ে ওঠায় ডাঃ রায় এখানকার উন্নয়নে দৃষ্টি দিলেন। গড়ে উঠল কল্যাণী উপনগরী। হরিণঘাটাকে তিনি বেছে নিলেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত স্থান হিসাবে। হরিণঘাটায় কৃষি বিজ্ঞানের ছাত্র ছাত্রীরা ও পশু বিজ্ঞান ও চিকিৎসায় উচ্চশিক্ষালাভে উৎসুক ছেলেমেয়েদের জন্য হরিণঘাটায় পোস্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। কল্যাণীতে স্থাপন করলেন তিনি কলা বিজ্ঞান বিষয়ক সাধারণ পাঠ্যক্রম। ফলে দমবন্ধ অবস্থা থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তি পেল। ১৯৪৯ সালের শেষদিকে কেন্দ্রীয় শিল্প ও সরকার মন্ত্রী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ডাঃ রায়কে এই খবর দিলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার দেশে একটি কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা ভাবছেন ও উপযুক্ত স্থানের সন্ধান করছেন। বিষয়টি নিয়ে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব রয়েছে মন্ত্রিসভার বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা ডঃ শান্তিস্বরূপ ভাটনগরের উপর। ডঃ ভাটনগর নেহরুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন বলে ডাঃ রায় জানতেন। ডাঃ রায় এটাও জানতেন যে, বাঙ্গালোরের ইন্সটিটিউট অব সায়েন্সের ডিরেক্টর ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ডঃ ভাটনগরের ব্যক্তিগত বন্ধু ও ডঃ ঘোষ এ ব্যাপারে খুব সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করতে পারেন। ডাঃ রায় একদিকে ডঃ ভাটনগরের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন ও অন্যদিকে ডঃ ঘোষকে একবার দ্রুত কলকাতায় আসতে অনুরোধ করলেন। ডঃ ভাটনগর ডাঃ রায়কে জানালেন যে, যেখানে কাছাকাছি এমন রেলওয়ে জংসন থাকবে, সেখান থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে যাওয়া যায়। এছাড়া কাছাকাছি বিমান অবতরণ ক্ষেত্রও আছে। ডাঃ রায়ের মনে খড়গপুরের কাছে ইংরেজ আমলের বিপ্লবীদের বন্দীনিবাস হিজলি 'ডিটেনশন ক্যাম্পের' ভাবনা এল। ১৯২৮-৩০ সাল থেকে বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এই শিবিরে অন্তরীণ রাখা হয়েছে। এটা পুরো ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিল। হিজলির গায়ে রয়েছে সালুয়া গ্রাম। এখানে ইংরেজ সৈন্যদের জন্য

ব্যারাক নির্মাণ করা হয়েছিল ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সালুয়াতেই একটি ছোট বিমান অবতরণ ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। স্বাধীনতার পর সেখানে স্থাপন করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আধা সামরিক বাহিনী ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসেব (E F R) সদর দফতর। এখানে কয়েক হাজার একর জমির উপর নির্মিত বন্দীশিবির ও সামরিক ছাউনি থাকার ফলে সড়ক সংযোগ ও জল সরবরাহ ব্যবস্থা বেশ ভাল ছিল। কাছেই ৮/১০ কিলোমিটার মধ্যে রয়েছে ভারতীয় বিমান বাহিনীর ঘাঁটি কলাইকুণ্ডা। ডাঃ রায় ডঃ ভাটনগর ও ডঃ ঘোষকে নিয়ে খড়গপুরে গেলেন। সেখান থেকে হিজলি ও সালুয়া তাঁদের ঘুরে দেখালেন। ডঃ ভাটনগরেব জায়গাটি দেখে পছন্দ হল ও একটা নতুন কিছু গড়ে তুলতে গেলে প্রারম্ভিক পর্যায়ে যে পরিকাঠামোর দরকার তা সবই হিজলিতে রয়েছে। ডঃ ভাটনগর প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে রিপোর্ট দিলেন খড়গপুরকে পছন্দ করে। স্থির হল, খড়গপুরেই স্থাপিত হবে দেশের সর্বপ্রথম কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় বা ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি (আই আই টি)। ডাঃ রায় জানতেন একটা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে যে ধরনের যোগ্যতা ও দক্ষতা দরকার, সেরকম লোকের সংখ্যা দেশে খুব বেশি নেই। ১৯১৮ সালে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন হয় তখন ওই বিশ্ববিদ্যালয়টি গডে তোলার ক্ষেত্রে ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হস্টেল নির্মাণেব ব্যাপারে ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষেব অসামান্য অবদান ছিল। ডাঃ রায় খড্গপুর আই-আই-টির প্রথম ডিরেক্টর হতে ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষকে অনুরোধ করলেন। ওদিকে বাঙ্গালোরের ইন্সটিটিউট অব সায়েন্সেস ডঃ ঘোষকে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। শেষ পর্যন্ত নেহরুর হস্তক্ষেপে ডঃ ঘোষ বাঙ্গালোর থেকে ছাড়া পেলেন। খড়গপুরে বিশ্বখ্যাত দেশের প্রথম আই-আই-টির প্রতিষ্ঠাব কৃতিত্ব ও সাফল্যের সঙ্গে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে আর যে বাঙ্গালিব নামটি ছডিয়ে আছে তিনি হলেন ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ।

প্রথম সাধারণ নির্বাচন (১৯৫২)

১৯৫১ সালের অক্টোবর থেকেই দেশের নয়া সংবিধান অনুযাযী প্রথম সাধাবণ নির্বাচনের তোড়জোড় আরম্ভ হয়ে গেল। ডাঃ রায় প্রদেশ কংগ্রেসের নির্বাচন কমিটির সভাপতি মনোনীত হলেন। তখন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মোট আসনসংখ্যা ছিল ২৩৮। কংগ্রেসের প্রার্থী বাছাই সম্পর্কে স্থির হল যে, যাঁরা প্রার্থী হওয়াব জন্য আবেদন করবেন, তাঁদের প্রত্যেককে নির্বাচন কমিটির কাছে ইন্টাবভিউ দিতে হবে। এর জন্য ডাঃ রায়কে দিনে ৭/৮ ঘণ্টা সময় ব্যয় করতে হতো। তিনি বোগী দেখার মতো প্রতি কংগ্রেস প্রার্থীকে প্রশ্ন করে পরীক্ষা করতেন। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ড পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে একমাত্র বিশেষ কারণে ডাঃ রায়কে দুটি কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনুমতি দিলেন। তিনি কলকাতার বউবাজার ও

মেদিনীপুরের মহিষাদল কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী মনোনীত হলেন। নতুন সংবিধানে এই প্রথম দেশে প্রাপ্তবয়সের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের সূচনা। ডাঃ রায় নতুন কায়দা ও কৌশলে ভোটের প্রচার কার্য স্থির করলেন। কেবল দেয়ালে দেয়ালে ছাপানো পোস্টারই নয়, বড় বড় রাস্তার মোড়ে সুদৃশ্য নিওন আলোতে ঝলমল করা ফেস্টুন প্রচার আরম্ভ হল কংগ্রেস প্রার্থীদের জন্য। এদিকে পশ্চিমবঙ্গবাসী ভোটারের সঙ্গের যুক্ত হয়েছে প্রায দশ থেকে বারো লাখ উদ্বাস্তু ভোটার। এদের বেশির ভাগই ছড়িয়ে রয়েছে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে ও কলকাতা সন্নিহিত চব্বিশ পরগনার শিল্পাঞ্চলে। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ড ডাঃ রায়কে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বিহারের নির্বাচনী প্রচারের দায়িত্বও দেয়। এদিকে কংগ্রেস বিরোধী শিবিরের রাজনৈতিক চেহারাটা ছিল এরকম :—ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জনসংঘ, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের কৃষক প্রজা পার্টি মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক, জয়প্রকাশ নারায়ণদের ভারতের সোশ্যালিস্ট পার্টি, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন RCPI গোষ্ঠী, বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি, নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক, সুবোধ ব্যানার্জিদের এস-ইউ-সি-আই, ত্রিদিব চৌধুরিদের আর এস পি ও হিন্দু মহাসভা। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সেভাবে পশ্চিমবঙ্গে কোন বিরোধী জোট না গড়ে উঠলেও ডাঃ রায় ও অতুল্য ঘোষের উদ্বেগ ছিল উদ্বাস্তু ভোট নিয়ে। উদ্বাস্তু কলোনিগুলিতে সাধারণভাবে কমিউনিস্টদের প্রচারের তীব্রতা ছিল বেশি। পুরানো কংগ্রেস কর্মীদের যে অংশ উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে এসেছে, তাঁদের একটা বড় অংশ গান্ধীবাদী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষদের কৃষক মজদুর প্রজা পার্টির সঙ্গেই ছিল। নির্বাচনী প্রচাবে বিরোধীরা সকলেই সম্মিলিতভাবে বলতে গেলে আক্রমণ কবেছে কংগ্রেসকে। এই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষ।

পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের এই প্রথম নির্বাচন ভারতের মুখ্যনির্বাচন কমিশনার সুকুমার সেনের এক ঐতিহাসিক কৃতিত্ব বলে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। এখানে এটা বলা দরকার যে ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে নেহরু যখন দু'বছরের মধ্যেই দেশে সাধারণ নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করলেন, তার পরপরই নেহরু কাকে ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদে নিয়োগ করা যায় তা নিয়ে ডাঃ রায়ের সঙ্গে কথা বলেন। সুকুমার সেন আই সি এস তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চিফ সেক্রেটারি। সুকুমার সেন ইংরেজ শাসনকালে প্রায় পঁচিশ বছর আইন ও বিচার বিভাগের অফিসার হিসাবে প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। উপনিবেশিক শাসন আমলেও তাঁর নিরপেক্ষতার খ্যাতি ছিল এক কিংবদন্তি। ডাঃ রায় প্রধানমন্ত্রী নেহরুর কাছে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদের জন্য সুকুমার সেনের নাম প্রস্তাব করেন ও নেহরু তাতে সম্মত হন। ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে সুকুমার সেন ভারতের প্রথম মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব গ্রহণ করে দেশকে দুবছরের গণতন্ত্রের এক সফল

পরীক্ষায় উত্তরণ ঘটান। যাহোক, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন প্রক্রিয়া আরম্ভ হল ১৯৫২ সালের ৩ জানুয়ারি। রাজ্যে ভোট গ্রহণ হয়েছিল তিন পর্যায়ে। ডাঃ রায় তাঁর দলের অন্যান্য প্রার্থীদের জন্য নির্বাচনী প্রচারে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, নিজের কেন্দ্র বউবাজারের ভোটারদের কাছে তাঁর নিজের হাজির হওয়ার সময় ছিল না। ভোটের মাত্র তিনদিন আগে তিনি তাঁর নির্বাচনী এলাকায় ঘুরতে লাগলেন। ওই এলাকায় হিন্দি ও উর্দুভাষী ভোটারদের সংখ্যা বাংলাভাষী ভোটারদের সমান সমান। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিলেন মাত্র একজন ; তিনি মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী সত্যপ্রিয় ব্যানার্জি। তাঁকে অন্যসব বিরোধী দল সমর্থন করেছিল। ডাঃ রায় ৪ হাজারের সামান্য কিছু ভোটের ব্যবধানে জয়ী হলেন। এই কেন্দ্রে বিরোধীদের প্রচারের তীব্রতা এত বেশি ছিল যে ভোটের ফল দেখে মনে হয়েছিল যে ডাঃ রায় ছাড়া অন্য কেউ কংগ্রেস প্রার্থী হলে তাঁর পরাজয় ছিল অনিবার্য। এই নির্বাচনে ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভার ১১ জন মন্ত্রীও পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি পরাজিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রমমন্ত্রী কালিপদ মুখোপাধ্যায় ও ভূমি রাজস্বমন্ত্রী বিমলচন্দ্র সিংহ। এর ফলে ডাঃ রায়কে মন্ত্রিসভা গঠনে খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। তিনি প্রফুল্লবাবু ও কালিপদবাবুকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। এঁরা দু'জনেই ছিলেন ডাঃ রায়ের অনুগত। ডাঃ রায় তাঁর রাজনৈতিক জীবনে কখনই অনুগতদের দূরে সরিয়ে দেননি। এদিকে নির্বাচনের পর কংগ্রেস সভাপতির এই নির্দেশ ছিল যে, পরাজিত কংগ্রেস প্রার্থীরা কখনই এম এল সি (বিধান পরিষদের সদস্য) করে কিংবা উপনিবাচনের মাধ্যমে মন্ত্রী করা যাবে না। কিন্তু ডাঃ রায় কিছুতেই তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটতে রাজি নন। তিনি নেহরুকে লিখলেন, "মন্ত্রী হিসাবে এঁরা দু'জন তাঁদের দফতর সম্পর্কে এতই ওয়াকিবহাল যে আমি তাঁদের কোন বিকল্প দেখছি না এমনকী, বিধানসভায় এমন আর কোন কংগ্রেস সদস্য নেই যাঁরা ওই দুজনের শূন্যস্থান পূরণ করতে পারে।" কিন্তু নেহরু ডাঃ রায়ের এই দাবি মানতে রাজি নন। তিনি ডাঃ রায়কে লিখলেন, "ব্যক্তিবিশেষের দক্ষতা যাই হোক না কেন, তাঁদের 'আপার হাউসের' (বিধান পরিষদ) সদস্য করে পুনরায় মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করলে আমার মনে হয় জনসাধারণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে ও তাতে আমাদের আদর্শ দুর্বল হয়ে পড়বে। আমার মনে হয় যে কোন একজন দক্ষ লোককে গ্রহণ করে আমাদের সামগ্রিক নীতিও আদর্শ দুর্বল না করাই ভাল।" এদিকে ডাঃ রায় প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও কালিপদ মুখোপাধ্যায়কে যেভাবেই হোক অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন, এরকম গুজব ছড়িয়ে পড়ায় কলকাতার খবরের কাগজগুলি ডাঃ রায়ের ও প্রফুল্লবাবু ও কালিপদবাবুর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠল। কিন্তু ডাঃ রায় দমে যাওয়ার পাত্র নন। তিনি প্রফুল্লচন্দ্র সেন, কালিপদ মুখোপাধ্যায় ও লোকসভার আসনে (শ্রীরামপুর কেন্দ্র) পরাজিত কংগ্রেস প্রার্থী রেণুকা রায়কে বিধান পরিষদের

(এম এল সি) নির্বাচনে জিতিয়ে নিলেন। তারপর এই তিনজনকে মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়ে ১১ জুন (১৯৫২)। ভোটের ফল প্রকাশের প্রায় সাড়ে তিন মাস পরে ১৩ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে নিয়ে তাঁর মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। রেণুকা রায়ের অন্তর্ভুক্তি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মহলকে অবাক করে দিয়েছিল। তাঁর স্বামী বিখ্যাত আই সি এস এস এন রায় তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চিফ সেক্রেটারি। এমনকী, প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতৃত্বও রেণুকা রায়ের মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে ছিল। ডাঃ রায় কেবল তাঁকে মন্ত্রীই করলেন না, তাঁকে সেই আমলের সবচেয়ে স্পর্শকাতর দফতর উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এই তিনজনের মন্ত্রিত্ব নিয়ে সেই সময় লোকসভার ও বিধান সভার কমিউনিস্টরা প্রচণ্ড হট্টগোল করেছিল। কিন্তু ডাঃ রায় অবিচল ছিলেন। তিনি এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে উদ্বাস্তু কলোনিগুলিতে মেয়েদের সামাজিক সমস্যা দিনের পর দিন তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এজন্যই তিনি একজন বিদগ্ধ মহিলাকে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দফতরের দায়িত্বে বসিয়ে ছিলেন। এমনকী ওই দফতরের উপমন্ত্রীর পদটিও তিনি একজন পোড় খাওয়া মহিলা পূরবী মুখোপাধ্যায়কে বসালেন।

১৯৫২ সালের নির্বাচনের পর ডাঃ রায় বিধানসভার এক প্রচণ্ড শক্তিশালী বিরোধী দলের সম্মুখীন হলেন। যদিও ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি ও অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরির মতো গান্ধীবাদী নেতারা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের কৃষক মজদুর প্রজা পার্টির মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলায় প্রমথ ব্যানার্জি, হরিপদ চ্যাটার্জি, শিবনাথ ব্যানার্জি, শিশির দাস সহ বেশ কয়েকজন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী গান্ধীবাদীরা এম এল এ হয়েছিলেন। কমিউনিস্টদের মধ্যে বঙ্কিম মুখার্জি, সোমনাথ লাহিড়ী, জ্যোতি বসু, বনেন সেন পরিষদীয় বক্তা হিসাবে ছিলেন অদ্বিতীয়। একদিকে পরিষদীয় রাজনীতির এই অবস্থা অন্যদিকে পূর্ববঙ্গের দাঙ্গায় বিপর্যস্ত ও পঙ্গু অর্থনীতিকে কাঁধে নিয়ে ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গকে বয়ে নিয়ে চললেন প্রগতি ও স্বাভাবিক অবস্থার লক্ষ্যের দিকে। দেশবিভাগের পর খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে যে বিপর্যয় এসেছিল, তা অনেকটা কাটিয়ে ওঠা গিয়েছিল ১৯৫১ সালের পর থেকে। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য বিপুল খরচ বহন করেও পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি যে এক স্থিরতার পথে এগিয়ে চলেছে তার প্রমাণ মিলল রাজ্যের প্রথম নির্বাচনে। বিধানসভার ২৩৮টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১৪৯টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ২৮টি আসন পেয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম ও প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা গেল। তারপরের অবস্থায় দাঁড়াল কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি। ডঃ শ্যামাপ্রসাদের প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জনসঙ্ঘ বিরোধী শিবিরে তৃতীয় স্থান পেল। কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে ডাঃ রায়ের নেতৃত্বকে কেউ আর চ্যালেঞ্জ করতে পারল না। কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এমনকী অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও কংগ্রেস সভাপতিদের চোখে তাঁর মর্যাদা হয়ে দাঁড়াল এক প্রাজ্ঞ

প্রবীণ রাষ্ট্রনীতিবিদের এবং সময়ে অসময়ে তাঁরা ডাঃ রায়ের কাছে পরামর্শ নিতে আসতেন। ১৯৫২ সাল থেকেই ডাঃ রায়ের মন খুঁজে বেড়াত কোথায় পশ্চিমবঙ্গের দুর্বলতা ও শূন্যতা রয়েছে। পরবর্তী দশ বছর তিনি ওই শূন্যতা ভরাট করার কাজই করে গিয়েছেন। জলপাইগুড়িতে গিয়ে তিনি শিমুল গাছের বনাঞ্চল সম্প্রসারণ করিয়েছেন। মেয়েদের জন্য আলাদা কলেজ স্থাপন করেছেন। দার্জিলিঙে পর্যটন ব্যবস্থার সম্প্রসারণে পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করেছেন। এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে দ্রুত পণ্য সরবরাহের জন্য 'রোপওয়ে' খুলেছেন। দুর্গাপুরে ইস্পাত নির্মাণ কারখানা ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য দুর্গাপুর প্রোজেক্টস তৈরি করেছেন। হরিণঘাটায় দুগ্ধ প্রকল্প ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেছেন। কল্যাণীতে রাজ্যের প্রথম উপনগরী গড়ে তুলেছেন। গড়ে তুলেছেন কল্যাণী, যাদবপুর, বর্ধমান ও উত্তরবঙ্গে পৃথক পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠা করেছেন উত্তরবঙ্গ, বাঁকুড়া ও বর্ধমানে মেডিকেল কলেজ। গড়ে তুলেছেন খড়গপুরে দেশের প্রথম কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় (আই আই টি)। দীঘাতে গড়ে তুলেছেন বিভিন্ন পর্যটননিবাস ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের সৈকতাবাস। গড়ে তুলেছেন এই রাজ্যে দেশের প্রথম 'বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ইন্সটিটিউট'। এভাবেই তিনি নিজের সৃজনশীল কর্মে নিমগ্ন থেকে বের করে এনেছেন আর এক অনন্য সাধারণ সৃজনশীল প্রতিভা সত্যজিৎ রায়কে। লৌহ কঠিন সরকারি আর্থিক নিয়মাবলীর বেড়াজাল ভেঙ্গে তিনি সত্যজিৎকে অর্থ সাহায্য করলেন। চলচ্চিত্র সাম্রাজ্যের সিংহাসনে উপবিষ্ট হলেন সত্যজিৎ রায়। অসমের ভাষাদাঙ্গায় জর্জরিত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং বরাক ও কাছাড় উপত্যকার বাঙালিদের মাতৃভাষার রক্ষাকবচ 'ত্রিভাষা ফর্মুলা'র খসড়া তৈরি করে দিলেন ডাঃ রায় লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে। আজ সেটাই 'শাস্ত্রী ফর্মুলা' নামে অসমের বাঙ্গালিদের মুখের ভাষা, মায়ের ভাষা হিসাবে বিরাজ করছে। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬২ সাল, এই দশবছর ছিল বিধানচন্দ্রের বাঙ্গালির জন্য স্বপ্ন দেখার যুগ। আলমোড়াতে উদয়শঙ্করের নৃত্যকেন্দ্র যখন আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল, তখন উদয়শঙ্করের বিকল্প পুনর্বাসনের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন ডাঃ রায়। কিন্তু এই সকল এতসব কাজের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত রেখেও ডাঃ রায় তাঁর রাজনৈতিক জীবনে ছিলেন নিঃসঙ্গ ও একাকী। প্রথম কিরণশঙ্কর রায় ওপরে নলিনীরঞ্জন সরকারের মৃত্যুর পর তাঁর জীবনের একাকিত্বের বোঝা ভারি হয়ে পড়েছিল। ঠিক যেমনটি ঘটেছিল নেহরুর ক্ষেত্রে সর্দার প্যাটেল, রফি আমেদ কিদোয়াই ও মৌলানা আজাদের মৃত্যুর পর। তবে ডাঃ রায়ের একাকিত্বের বোঝা অনেকটা লাঘব করেছিলেন অতুল্য ঘোষ। ডাঃ রায়ের সঙ্গে অতুল্য ঘোষের বয়সের ব্যবধান ছিল প্রায় পঁচিশ বছরের। বলতে গেলে একটা প্রজন্মের তফাৎ। কিন্তু ১৯৫২ সালের নির্বাচনের পর থেকে অতুল্য ঘোষ বিধানবাবুকে কংগ্রেস সংগঠন নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা করতে দেননি। অতুল্য ঘোষের এই আনুগত্য ডাঃ রায়কে পশ্চিমবঙ্গের

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও শিল্পায়নের কাজ নিবিষ্ট চিত্তে এগিয়ে নিয়ে যেতে দিয়েছিল। রাজনীতিতে এই আনুগত্যের মূল্য কিন্তু অপরিসীম। এছাড়া প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও নতুন গড়ার কাজে দশ বারোজিন দক্ষ, নিঃস্বার্থ ও কর্তব্যপরায়ণ আই. সি. এস অফিসারকে পেয়েছিলেন। এঁরা হলেন প্রথম চিফ সেক্রেটারি সুকুমার সেন (যিনি পরে ভারতের প্রথম মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হয়েছিলেন), পরবর্তী চিফ সেক্রেটারি এস. এন. রায়, আর গুপ্ত, কে কে হাজরা, শৈবাল গুপ্ত, এস কে দে, হিরণ্ময় ব্যানার্জি, এম এম বসু, আর. এস ত্রিবেদি, এ ডি খান, জে এন তালুকদার, এম এম বসু, কে সেন, অশোক মিত্র, এইচ এন রায়। আই. সি. এস ঘরানার বাইরের অফিসারদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বিনয় দাশগুপ্ত। ইনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন (বি. সি. এস)। কিন্তু ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে নলিনীরঞ্জন সরকার অর্থমন্ত্রী হয়ে আই সি এসদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁকে আই সি এসদের সমান বেতন দিয়ে অর্থদফতরের সেক্রেটারির পদ নিয়োগ করেছিলেন। ডাঃ রায় অতি দ্রুত বিনয় দাশগুপ্তকে আই এ এস পদমর্যাদায় উন্নীত করেন। বিনয় দাশগুপ্ত প্রায় ১৪ বছর রাজ্যের অর্থসচিব ছিলেন। আর একজন হলেন লেঃ জেনারেল ডি এন চক্রবর্তী। তিনি ভারতীয় সামরিক বাহিনীর 'চিফ অব দি আর্মি মেডিকেল কোর' ছিলেন। ডাঃ রায় তাঁকে স্বাস্থ্য দফতরের সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত করেন। অন্যজন হলেন ডঃ ডি এম সেন। ইনি ইংরাজ আমলে দীর্ঘদিন কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগে কাজ করেছেন। ডাঃ রায় তাঁকে শিক্ষাদফতরের সেক্রেটারি করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণে তাঁর অবদান স্মরণীয়। এই সকল ব্যক্তিত্ব ডাঃ রায়ের মুখ্যমন্ত্রীর কর্মজীবনে নিত্যসঙ্গী ছিলেন। তিনি সবসময় এঁদের দৃঢ় সমর্থন দিতেন।

১৩

অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ও রাজনৈতিক স্থায়িত্বের মধ্যাহ্ন গগনে পশ্চিমবাংলার আরোহণ

১৯৫২ সালের নির্বাচনের পর ডাঃ রায়ের পাশে এসে দাঁড়ালেন অতুল্য ঘোষ এক শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেস নিয়ে। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে অতুল্য ঘোষের লৌহকঠিন ও সাহসী নেতৃত্ব রাজ্যের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নে ডাঃ রায়কে অদম্য উৎসাহ ও নিরলস প্রচেষ্টার প্রেরণা। ডাঃ রায় একান্ত মন ও অনুদ্বিগ্নচিত নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জন্য একের পর এক পরিকল্পনা রচনা করেছেন ও এসবের সাফল্যের পথের সকল বাধা নির্মূল করে দিয়েছেন। ১৯৫২ থেকে ১৯৬২ এই দশ বছরের ইতিহাসই হল পশ্চিমবঙ্গে

র উন্নয়নের ইতিহাস। দেশবিভাগ ও স্বাধীনতার সময় থেকে অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত টলটলায়মান রেখেছিল। কিন্তু ১৯৫১ সালেই কংগ্রেস নেতৃত্বে অতুল্য ঘোষের অভ্যুত্থান ও দাপট ডাঃ রায়কে নিশ্চিত করে রেখেছিল তাঁর রাজনৈতিক অস্তিত্ব সম্পর্কে। এই সময় নেহরু অনুপ্রাণিত হলেন দেশের গ্রাম উন্নয়নের এক নতুন ভাবাদর্শে। দীর্ঘকালের আমেরিকা প্রবাসী এক বাঙালি ব্যক্তিত্ব সুরেন্দ্রকুমার দে (এস. কে. দে) সর্বাঙ্গীন সমাজ উন্নয়নের (কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট) এক কর্মপরিকল্পনা নেহরুকে দিলেন। গ্রামীণ ভারতের কৃষি, সমাজ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সর্ববিধ উন্নয়নের কর্মপ্রচেষ্টাকে একই ছত্রছায়ায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত হল ওই পরিকল্পনায়। ডাঃ রায়, নেহরুর সঙ্গে একমত হয়ে ওই পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। ডাঃ রায় এই পবিকল্পনা মোতাবেক পশ্চিমবঙ্গের প্রতি থানায় একটি করে প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করলেন। এই চিকিৎসাকেন্দ্রগুলির তৎপরতায় প্রায় দুই যুগ এই রাজ্যের গ্রাম থেকে ম্যালেরিয়া ও বসন্ত রোগ নির্মূল হয়ে গিয়েছিল। কলেরা রোগ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত থাকলেও ওই সময়ে মহামারির আকার ধারণ করতে পারেনি। ১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গের দাঙ্গায় উৎখাত হওয়া যে লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবী পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে, তারা যাতে এই রাজ্যের সবুজ বিপ্লবেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সেজন্য ডঃ রায় ১৯৫৪ সালে জমিদারি বিলোপ আইন চালু করলেন। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের উদ্যম ও ডাঃ রয়ের কৃষি কর্মপরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গের জমির রং পাল্টে দিল। গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিকল্পনা নতুন করে সাজিয়ে এই চিকিৎসক মুখ্যমন্ত্রী ইংরাজ আমলের শতাব্দী প্রচলিত 'সিভিজ সার্জন ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন' পদের অবলুপ্তি ঘটিয়ে 'চিফ মেডিকেল অফিসার' ও ডিস্ট্রিক্ট মেডিকেল অফিসার' পদ পত্তন করলেন। জেলার ও গ্রাম এলাকার সামগ্রিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য ওই পদাধিকারীরাই দায়ী থাকবেন। গ্রামীণ কৃষি, সমাজ ও সাধারণ উন্নয়নের দায়িত্ব ও অধিকার দিয়ে ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের (বি ডি ও) পদ সৃষ্টি করা হল। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি 'বহুমুখী' উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। ওই পর্যায়েই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন আধুনিক পাঠ্যক্রম চালুর ব্যবস্থা নিলেন তিনি। স্থাপিত হল নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ। এটা সকলেরই জানা ছিল যে, রাজ্যে একজন শিক্ষামন্ত্রী আছেন এবং আলাদা স্বাস্থ্যমন্ত্রী আছেন, কিন্তু এসব কিছুর চিন্তা-ভাবনা ও বাস্তবের নির্ভর করত কেবল একটি মাত্র মানুষের উপর, তিনি হলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। কৃষি, শিক্ষা ও শিল্পায়ন এই সকল ক্ষেত্রেই তিনি রাজ্যের জন্য বিভিন্ন প্রোজেক্ট রূপায়ণ করেছেন বহুক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকার ও পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে ঝগড়া করেই।

১৯৫৫ সালের শেষাশেষি রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রিপোর্ট ও সুপারিশ প্রকাশিত হল। দক্ষিণভারত, ওড়িশা ও মহারাষ্ট্র গুজরাটে ভয়ংকর বিশৃঙ্খলা আরম্ভ

হল। বিহারের বাংলাভাষা অঞ্চলগুলির মাত্র একটু ভগ্নাংশ পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গেও প্রতিবাদের ঝড় উঠল। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস বিহারের মানভূম, সিংভূম ও পূর্ণিয়া জেলা বঙ্গভুক্তির দাবি রেখেছিল রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের কাছে। পুরুলিয়া মহকুমা ও পূর্ণিয়া জেলার ইসলামপুর থানা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ আর কিছু না পাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষ রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের কাছে পুনর্বিচারের দাবি জানালেন। এর পাল্টা প্রতিবাদ জানিয়ে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল ও রানীগঞ্জ শিল্পাঞ্চল দাবি করলেন সেহেতু ওই শিল্পাঞ্চলে হিন্দি ভাষীদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। এর পাল্টা প্রতিবাদে অতুল্যবাবু বর্ধমান জেলার শেষপ্রান্ত যেখানে দামোদর নদ বিহার ও বাংলার সীমানা স্থির করেছে, তার পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত বাঙালি অধ্যুষিত কয়েকটি গ্রামের উপর পশ্চিমবাংলার দাবি রেখে তিনি ওই গ্রামগুলিতে জনসভা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। বিহার সরকার অতুল্যবাবুর বিহার প্রবেশ নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করলেন। অতুল্যবাবু ওই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দামোদর নদের পশ্চিমপাড়ে উপস্থিত হলে বিহার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করল। নেহরু অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতাদের তিরস্কার করলেন এই বলে...like Hitter's demand and for a corridor over polish territory. এই রকম একটা উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বাংলা ও বিহারের সংযুক্তির প্রস্তাব দিলেন। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলে নেহরু ডাঃ রায়ের প্রস্তাবে অভিনন্দন জানালেন। এর ফলে দুই প্রতিবেশী রাজ্যের কংগ্রেসের উত্তেজনা প্রশমিত হল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে বামপন্থীরা প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করল। বামপন্থী নেতৃবৃন্দ প্রতিটি জনসভায় বিহারিদের "অসভ্য অশিক্ষিত, বর্বর" আখ্যা দিয়ে বললেন, "বিধান রায় বাংলার সমাজ ও শিক্ষাজীবনকে বিহারিদের ধাঁচে গড়ে তুলতে চাইছেন।" এই সময় ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসের কোন একসময়ে দেশের খ্যাতনামা পদার্থ-বিজ্ঞানী ও বামপন্থী এম পি ডঃ মেঘনাদ সাহা মারা গেলেন। ডঃ সাহার শূন্য আসন পশ্চিম কলকাতায় কমিউনিস্টরা ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা মোহিত মৈত্রকে প্রার্থী মনোনীত করল। কংগ্রেস প্রার্থী দিল বিখ্যাত আইনজ্ঞ অশোক সেনকে। ডাঃ রায় এই সময় ঘোষণা করলেন যে এই উপনির্বাচনের ফলাফলকে তিনি তাঁর বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি প্রস্তাবে সমর্থন ও বিরোধিতা বলে চিহ্নিত করবেন। এই উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী পরাস্ত হলেন। ভোটের ফল ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ডাঃ রায় তাঁর বাংলা-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিয়ে জানিয়ে দিলেন "যেহেতু জনগণ আমার সংযুক্তির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে, সেহেতু আমি বাংলা-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিলাম।" প্রস্তাবে প্রত্যাহার করে নিলেও তিনি একথা বলতে দ্বিধা করেননি যে "যদি বাংলা ও বিহারের সম্মেলন

ঘটত তাহলে ভারতবর্ষে এক নতুন জাতীয় ঐক্যবোধ গড়ে উঠতে পারত।"

১৯৫২ সালের নির্বাচনে সারা দেশে কংগ্রেস সরকাব গঠন করাতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রবলভাবে এই প্রচার আবম্ভ করে দিল যে, চীনে যেমন কমিউনিস্ট বিপ্লবের কাছে চিয়াং কাই শোকের জাতীয়তাবাদী কুযোমিন্টাং (কে এম টি) পার্টির পরাজয় ঘটেছে, তেমননি ভারতবর্ষেরও অনুরূপ ঘটনা ঘটবে নেহরু-ডাঃ রায়ের নেতৃত্বাধীন জাতীয়বাদী কংগ্রেসের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই কমিউনিস্টরা পশ্চিমবঙ্গকে ওদের 'বিপ্লবের' প্রথম সোপান বলে চিহ্নিত করেছিল শিল্পে অনগ্রসরতা, ব্যাপক হারের বেকারত্ব ও বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুর সামাজিক উত্তেজনা, অনিশ্চয়তা ও হতাশাকে সামনে রেখে। কিন্তু ডাঃ রায় একে প্রতিহত করার পথ বেছে নিলেন পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক শিল্পায়ন কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও উদ্বাস্তুদের জন্য নতুন নতুন পুনর্বাসন পরিকল্পনা রচনার মধ্য দিয়ে। ডাঃ রায় দেশবিভাগে বিপর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গের নেতৃত্ব গ্রহণের প্রথম দিন থেকেই পশ্চিমবঙ্গকে শিল্পসমৃদ্ধ রাজ্যে পরিণত করার স্বপ্ন দেখছিলেন। তিনি বৃহৎ শিল্প কারখানা, বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, বৃহৎ বৃহৎ জলাধার বৃহৎ ও মাঝারি সেচ প্রকল্প তৈরি কবে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু তাই বলে কৃষি উৎপাদনকে তিনি কখনই ব্যাহত করেননি। তিনি নিবিড় ও ব্যাপক চাষ পদ্ধতি এই রাজ্যের জন্য চেয়েছিলেন। তিনি ভেবে নিয়েছিলেন যে, কেবল আমন ও বোরোধান উৎপাদনের মধ্য দিয়ে বাংলার চালের চাহিদা মিটবে না। তাঁরই আমলে বাংলার চাষীরা ক্ষুদ্র সেচের সহায়তার উচ্চ ফলনশীল ধান আই-আর-৮ ধান চাষ আরম্ভ করেছিল। ধান রোয়ার দিন থেকে ৭৫ দিনে এই ধান কৃষকের ঘরে আসে। এই কর্মকাণ্ডের মধ্যে ডাঃ রায় বজবজে অথবা পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে তেল শোধনাগার নির্মাণের কথা ভাবছিলেন। বার্মাশেল ও ক্যালটেক্স, এই দুটি বৃহৎ তেল কোম্পানি হয় বজবজে কিংবা পূর্বাঞ্চলের অন্য কোন স্থানে তেল শোধনাগার নির্মাণের পরিকল্পনা দিল। ইতিমধ্যে অসমের নাহারকাটিয়ার প্রচুর পরিমাণে ক্রুড অয়েলের (Crude oil) ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হওয়ায় পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের কোনস্থানে ওই তেল শোধনের জন্য যথার্থ শোধনাগার নির্মাণের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল। ডাঃ রায় তখন কলকাতার ধারে কাছে শোধনাগার নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে সুপারিশ করলেন। কলকাতার মতো বৃহৎ বিপণন বাজার পূর্ব ভারতে আর কোথাও নেই, এজন্য ডাঃ রায়, কলকাতাকেই অগ্রাধিকার দেওয়ার দাবি জানালেন। কিন্তু অসমে এই প্রশ্নে আন্দোলন আরম্ভ হল। যেহেতু তেল পাওয়া গিয়েছে অসমের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে, সেহেতু শোধনাগারটি ওই তেলকূপের সন্নিকটেই নির্মাণের জন্য অসম দাবি রাখল। অসম ও পশ্চিমবঙ্গের এই বিবাদের মধ্যে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ হস্তক্ষেপ করলেন। তিনি চাইলেন, বিহারের বারৌনিতে তেল শোধনাগার হওয়া উচিত। তাঁর প্রস্তাব

অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত বারৌনিতেই পূর্ব ভারতের তেল শোধনাগার নির্মিত হল।

১৯৫৩ সালের ২৫ জন এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিং নোরগে ও এডমন্ড হিলারি রাইটার্স বিল্ডিংসে ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করলে তাঁদের মধ্যে ভারতে পর্বতারোহণের একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন নিয়ে আলোচনা হয়। ডাঃ রায় তখনই এ-ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে আলোচনা করেন। নেহরু খুব আগ্রহের সঙ্গে ডাঃ রায়ের প্রস্তাবে রাজি হলে দার্জিলিঙে স্থাপিত হল দেশের প্রথম পর্বত আরোহণ শিক্ষাকেন্দ্র বা 'হিমালয়ান মাউন্টেনারিং ইনস্টিটিউট'। নেহরু এই শিক্ষায়তনের সভাপতি ও ডাঃ রায় সহ সভাপতির দায়িত্ব নিলেন। তেনজিং নোরগে নিযুক্ত হলেন এই শিক্ষণকেন্দ্রের প্রথম প্রধান শিক্ষক-নির্দেশক। দেশের তরুণ তরুণীদের মনে দুঃসাহসিক পর্বতারোহণের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করতে বিধানচন্দ্র রায়ের কল্পনা ও উদ্যোগ ছাড়া কখনই এই শিক্ষায়াতনটি দার্জিলিঙে প্রতিষ্ঠিত হতে পারত না। প্রতি বছরে এই শিক্ষায়তনের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ছেলে-মেয়েরা পুলিশ সামরিক বাহিনী ও বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনী ও এমনকি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে চাকুরি পেয়ে থাকে। অতীতে ইংরাজ আমলে দিল্লিতে কোন প্রাদেশিক সরকারের দফতর বা ভবন ছিল না। কিন্তু এক্ষত্রে ডাঃ রায় জাতীয় এক নতুন নজির সৃষ্টি করলেন। ডাঃ রায় দিল্লিতে সাধারণতঃ তাঁর এক ডাক্তার বন্ধুর বাড়িতে থাকতেন। কখনও কখনও এক রাত বা একটা দিন হয় নেহরু কিংবা সর্দার প্যাটেলের বাড়িতে থাকতেন। কিন্তু ১৯৪৯ সালে দিল্লিতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে যোগ দিতে ডাঃ রায় বহু অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন। কিন্তু দিল্লিতে অফিসারদের এক জায়গায় থাকার খুব অসুবিধা দেখা দিল। কলকাতা ফিরেই তিনি ঠিক করলেন যে দিল্লিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি বাড়ি থাকা দরকার। তিনি বাড়ি কেনাবেচার দালাল লাগিয়ে জানতে পারলেন যে, এক ইংরাজ মহিলা তাঁর হেইলি রোডের বাড়ি বিক্রি করতে চান। তিনি নিজে বাড়িটি দেখে পছন্দ করলেন। বাড়ির সামনে পিছনে অনেকখানি জমি। বাড়িটি কেনার পর তিনি নিজেই তার নামকরণ করলেন "বঙ্গ ভবন" নাম দিয়ে। ৪৭ বছর আগে তিনিই দেশের প্রথম একজন মুখ্যমন্ত্রী যিনি জাতীয় রাজধানীতে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের নামে সরকারি বাসভবনের পত্তন করলেন যে সময় পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বিরোধী সদস্যরা ডাঃ রায়ের দিল্লিতে বাড়ি কেনার তীব্র সমালোচনা করে বলেছিলেন, "সরকারি অর্থ দিয়ে ব্যক্তিগত প্রমোদ ভবনের পত্তন!" ডাঃ রায় ক্বচিৎ কখনও এই বাড়িতে এক আধদিন থেকেছেন। তাঁর আমলে এটা প্রধানত অফিসারদের দিল্লি থাকাকালীন অস্থায়ী আবাস হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। "বঙ্গভবনের" অবস্থান দিল্লি সেক্রেটরিয়েট ও পার্লামেন্ট ভবনের সন্নিকটে বলে ডাঃ রায় ওখানে বসে মাঝে মাঝে সরকারি কাজকর্ম করতেন। তাঁর এই কাজগুলির সবটাই ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হয়ে তদ্বির করা ও পশ্চিমবঙ্গের জন্য কিছু আদায় করা। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন পরিকল্পনা

সংক্রান্ত কোন ফাইল বিভিন্ন কেন্দ্রীয় দফতরে পড়ে থাকলে ডাঃ রায় ওই দফতরের সংশ্লিষ্ট ডেপুটি সেক্রেটারিকে 'বঙ্গভবন'-এ চা খেতে আমন্ত্রণ করে আনতেন। এই সব অফিসাররা ডাঃ রায়ের সান্নিধ্য পেয়ে এতই খুশি হতেন যে, তাঁরা ডাঃ রায়ের অনুরোধ রক্ষা করে ফাইলে অনুকূল নোট দিয়ে দিতেন। ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাজে বিলম্ব অনেক কম হত। এসম্পর্কে ডাঃ রায়ের মন্তব্য ছিল এই : "সব দেবতাকেই ফুল বেলপাতা দিতে হয়, তা সে ছোটই হোক আর বড়ই হোক।" ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গের জন্য দিল্লিতে 'বঙ্গভবন' স্থাপন করার পর অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে আরম্ভ করবেন। ফলে জাতীয় রাজধানীতে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের আবাসিক ভবন নির্মিত হল। ওড়িশার বিজু পট্টনায়ক তাঁর প্রথম দফার মুখ্যমন্ত্রিত্বের আমলে (ডাঃ রায় ও নেহরুর জীবদ্দশায়) বিধানচন্দ্র রায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ওড়িশার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করেছিলেন। তিনিও ডাঃ রায়ের মতো কেন্দ্রীয় সরকারের যেসব দফতর ওড়িশার উন্নয়নের ব্যাপারে যুক্ত, সেসব দফতরের অফিসারদের উৎকলভবনে আমন্ত্রণ করে আনতেন।

ডাঃ রায় ১৯৫৩-৫৪ সালেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, কলকাতা বন্দরের জন্য একটি সহায়ক বন্দরের প্রয়োজন। তাঁর বিজ্ঞানী মন ধরে ফেলেছিল যে, যেহেতু কলকাতা আগাগোড়া একটি নদী বন্দর, যেহেতু কালচক্রের আবর্তনে হুগলি নদীর নাব্যতা কমে গেলে কলকাতা বন্দরের, পক্ষে বিপর্যয় আসতে পারে। এজন্য তিনি ১৯৫৩-৫৪ সালে তমলুকের কাছে গেঁওখালি পরিদর্শন করেন। হলদি নদী যেখানে সমুদ্র মোহনায় গিয়ে পড়েছে, সেখানে গেঁওখালি অবস্থিত। পর্তুগিজ ও ইংরাজরা এদেশে বাণিজ্য করতে আসার অনেক আগে থেকে দেশীয় বণিকেরা গেঁওখালিকে বহির্বাণিজ্য বন্দর হিসাবে ব্যবহার করে গিয়েছিল। গেঁওখালির সঙ্গে তিনি চব্বিশ পরগনা জেলার উপকূলবর্তী গ্রাম ফ্রেজারগঞ্জের পরিদর্শন করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গ তথা পূর্বভারতের জন্য দ্বিতীয় সহায়ক বন্দর নির্মাণ করা। কিন্তু যেহেতু গেঁওখালি ও পার্শ্ববর্তী হলদিয়া গ্রাম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের কোলাঘাট স্টেশন দু থেকে আড়াই ঘণ্টার দূরত্বের মধ্যে সেহেতু তিনি হলদিয়া গেঁওখালি এলাকাকেই কলকাতা বন্দরের সহায়ক বন্দর নির্মাণের স্থান হিসাবে পছন্দ করলেন। তিনি হলদিয়া বন্দরের নির্মাণকার্য দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু হলদিয়া যে একটি বন্দর ও শিল্পনগরী হয়ে উঠতে পারে, একথা ভেবে ডাঃ রায় হলদিয়ায় একটি জাহাজ নির্মাণ কারখানা গড়ার প্রস্তাব দিয়ে তিনি পরিকল্পনা কমিশনের কাছে সুপারিশ পাঠিয়ে ছিলেন। কিন্তু কলকাতা বন্দরের অস্তিত্বরক্ষার জন্য গঙ্গা নদী মুর্শিদাবাদ জেলার যে গ্রামের কাছে একদিকে ভাগীরথী ও পদ্মা নাম নিয়ে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে, সেখানে ব্যারাজ তৈরি করে গঙ্গার মূল প্রবাহকে নদী বিজ্ঞানের 'সাইফুন' প্রথায় ভাগীরথীতে টেনে আনার জন্য ব্যবস্থা নিতে বললেন ভারত সরকারকে। ডাঃ রায়ের উদ্যোগ ও ভারতের জাতীয় জীবনের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার স্যার

বিশ্বেশ্বরাইয়ার সুপারিশে সেই ফরাক্কা গ্রামেই নির্মিত হল ফরাক্কা ব্যারাজ, যা এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে কলকাতা বন্দরকে। স্বাধীনতার সময় বঙ্গপ্রদেশ ভাগ হওয়ায় ঐতিহাসিক রেল সেতু হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পাকিস্তানের অংশে পড়ায় ভারতীয় উত্তরবঙ্গ কার্যত পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। ডাঃ রায় ফরাক্কা ব্যারাজের উপর দিয়ে রেলপথ ও সড়কপথ নির্মাণের প্রস্তাব করলেন যাতে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির মানসিক ও দৈহিক নৈকট্য দ্রুত স্থাপিত হয়।

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া

১৯৫৩ সালের ২৩ জুন শেষ রাতে ডাঃ বায় তাঁর ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক জীবনে আর একটি মর্মান্তিক আঘাত পেলেন সেটি হল কাশ্মীরে গৃহবন্দী অবস্থায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অকাল প্রয়াণ। এই গ্রন্থে আগে অনেকবারই উল্লেখ করা হয়েছে শ্যামাপ্রসাদের পিতা স্যার আশুতোষের সঙ্গে বিধানের নিবিড় স্নেহসিক্ত সম্পর্কের কথা। বঙ্গ রাজনীতিতে বিশেষ করে দেশ বিভাগকালীন রাজনীতি ও তাব অব্যবহিত পরের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ডাঃ বায়েব সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের সম্পর্কের কথাও বারংবার এসে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় শিল্পমন্ত্রী থাকার সময় পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নে বিশেষ করে চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন নির্মাণ কারখানা স্থাপনে ও খড়্গপুরে দেশের প্রথম কারিগবি বিশ্ববিদ্যালয় আই-আই-টির প্রতিষ্ঠার শ্যামাপ্রসাদের সাহায্য ছিল অপরিসীম। যদিও শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুতে উত্তাল কলকাতায় কিছু লোক ডাঃ রায়ের বাড়িতেও প্রদেশ কংগ্রেসের বাড়িতে ইট-পাটকেল ছুড়েছিল ; কিন্তু ডাঃ রায ও রাজ্যের অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের সুসম্পর্ক বঙ্গ রাজনীতিতে কারও কাছে অবিদিত ছিল না। শেষ রাতে শ্যামাপ্রসাদের মরদেহ তাঁর ভবানীপুবের বাড়িতে পৌঁছানোর অব্যবহিত পরেই ডাঃ রায় শ্যামাপ্রসাদের বাড়িতে তাঁর মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বিধানকে দেখে শ্যামাপ্রসাদের মাতৃদেবী অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলেছিলেন, "বিধান তুমি থাকতে আমার শ্যামা ভুল চিকিৎসায় মরে গেল।" পরের দিনই ডাঃ রায় স্পেনে ও টেলিগ্রাম পাঠিয়ে কাশ্মীরের তখনকার মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লার কাছে শ্যামাপ্রসাদের চিকিৎসার প্রেসক্রিপশন চেয়ে পাঠান। ২৩ জুন সন্ধ্যায় শ্যামাপ্রসাদকে একটি ইনজেকশন দেওয়ার উল্লেখ ছিল প্রেসক্রিপশনে। তখন ডাঃ রায় শেখ আবদুল্লার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, "যে রোগী রক্তচাপবৃদ্ধি জনিত রোগে ভুগছে, তাঁকে রক্ত চাপ কমানোর ইনজেকশন না দিয়ে কেন রক্তচাপ বৃদ্ধির ইনজেকশন দেওয়া হল?" "কেন শ্যামাপ্রসাদ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে আমাকে সংবাদ দেওয়া হল না?" ডাঃ রায় তাঁর মন্ত্রিসভার এক বিশেষ বৈঠক ডেকে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুতে

গভীর শোক প্রকাশ করেন। এছাড়া ক্যালকাটা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার শোক প্রকাশ করেছিলেন।

ওই বছরেই অর্থাৎ ১৯৫৩ সালে ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক জীবনে আর একটি স্মরণীয় ঘটনার সূচনা করলেন। সেটি হল জমিদারি বিলোপ ব্যবস্থা। তিনি ১৯৫৩ সালের ২৫ জানুয়ারি মুর্শিদাবাদ থেকে এক অনুষ্ঠানে বাংলার জমিদারি প্রথার অবসান ঘটালেন। পলাশির যুদ্ধের ৩৬ বছর পর ১৭৯৩ সালে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সূচনা করে বাংলায় এক নতুন মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করলেন। এই জমিদারশ্রেণী জমির মালিকানা ও অধিকার নিয়ে প্রায় দেড়শ' বছর বাংলার অর্থনীতি ও সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করেছে। ডাঃ রায় সেই জমিদারি প্রথার অবসান ঘটিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে অবলুপ্ত করে ওই বছরেই বিধানসভায় নতুন আইন প্রণয়ন করলেন। যে আইনে কৃষক ও জমির উপর রায়তীস্বত্ব জন্মাবে ও ভাগচাষীর অধিকার শুরুতেই থাকবে। অনেক বৃহৎ ও মাঝরি জমিদার তাঁদের জমিদারি স্বেচ্ছায় সরকারের হাতে তুলে দিলেন। বিনিময়ে সরকার তাঁদের ক্ষতিপূরণ ও প্রাসাদ ও অট্টালিকা সমূহ যাকে নিয়ে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করলেন। বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্বাধীনতার পরবর্তী যুগগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মেরুকরণে জমিদারি বিলোপ আইন এক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে, যা কখনও কখনও রক্তক্ষয়ী হয়ে উঠেছে। এই সময়ে ডাঃ রায় প্রধানত কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির দুটি বড় বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এর একটি হল ট্রামের এক পয়সা ভাড়া বৃদ্ধি ও অন্যটি হল শিক্ষক আন্দোলন।

ট্রামভাড়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন

১৯৫৩ সালের জুন মাসে কলকাতায় ইংরাজদের পরিচালিত ঐতিহাসিক ট্রাম কোম্পানি ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া এক পয়সা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল। এদিকে ৫ জুলাই (১৯৫৩) তারিখে ডাঃ রায়ের চোখের ছানি কাটাতে ভিয়েনা যাওয়া ঠিক। এই সময় রাজ্যের কমিউনিস্টদের নেতৃত্ব বামপন্থী কয়েকটি দল ও কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসা কৃষক প্রজা মজদুর পার্টি ট্রামের ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিল। প্রবীন গান্ধীবাদী ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জিকে সভাপতি ও কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসুকে সেক্রেটারি করে 'ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করা হল। ট্রাম কোম্পানি স্থির করেছিল যে জুলাই মাসের প্রথম সোমবার থেকে বর্ধিত ভাড়া চালু করা হবে।

কলকাতার থমথমে অবস্থায় ডাঃ রায় ৫ জুলাই (১৯৫৩) ইউরোপ রওনা হয়ে গেলেন। আন্দোলন প্রথম দিন থেকেই হিংসাত্মক ছিল। যেসব যাত্রী বর্ধিত ভাড়া দিতে রাজি তাদের ট্রাম থেকে জোর করে নামিয়ে মারধর করা হল। বহু যাত্রীর গায়ে অ্যাসিড বালব নিক্ষেপ করা হল। অসংখ্য ট্রাম পুড়ল, বহু সরকারি বাসের ক্ষতি হল। লাঠি, গুলি, টিয়ার গ্যাস, বিক্ষোভ ও হরতালে কলকাতা উত্তাল। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের বন্ধ হয়ে গেল। ট্রাম কোম্পানি ট্রাম চালনা বন্ধ করে দিল। বিক্ষোভকারীরা বহু জায়গায় ট্রামের লাইন তুলে ফেলল। সন্ধ্যার পর শহরের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের সঙ্গে বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের খণ্ডযুদ্ধ চলল প্রায় দেড় মাস ধরে। এই সময় কলকাতা ময়দানে পুলিশের হাতে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা প্রহৃত হলেন। আন্দোলন জটিল থেকে জটিলতর হল। খবরের কাগজগুলি অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কালিপদ মুখার্জির বিরুদ্ধে আক্রমণ শাণিত করল। ডাঃ রায় ইউরোপ সফর সংক্ষিপ্ত করে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি কলকাতা ফিরে এলেন। তিনি ফিরেই প্রহৃত সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বললেন ও পুলিশ তাদের কী অবস্থায় কীভাবে পিটিয়েছে তা জেনে নিলেন। এতে রিপোর্টারদের ক্রোধ অনেকটা প্রকাশিত হল। এরপর তিনি খবরের কাগজের ও নিউজ এজেন্সির মালিক ও সম্পাদকদের ডেকে পাঠালেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অমৃতবাজার পত্রিকার তুষারকান্তি ঘোষ, আনন্দবাজার পত্রিকার সুরেশচন্দ্র মজুমদার, স্টেটসম্যান পত্রিকার জনসন সাহেব, পি টি আই, নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ ও ইউ পি আই-এর বিধুভূষণ সেনগুপ্ত। অবশেষে ডাঃ রায় ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি ও সাংবাদিক নিগ্রহের বিষয়দুটির তদন্ত করে মতামত দেওয়ার জন্য এক সদস্যের একটি বিচারবিভাগীয় ট্রাইবুন্যাল গঠন করলেন। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় ওই ট্রাইবুন্যালের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন। ট্রাইবুন্যালের রায় সাপেক্ষে ট্রামের এক পয়সার ভাড়া বৃদ্ধি স্থগিত হইল। দেড় দুমাসের মধ্যে এই ট্রাইবুন্যালের রায় বের হল। ট্রাইবুন্যাল ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি যুক্তিসঙ্গত বলে রায় দিলেন। সাংবাদিক প্রহারের ব্যাপারে সাংবাদিকদের বক্তব্য অর্থাৎ সাংবাদিকদের কর্তব্যরত অবস্থায় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা অমান্যের অধিকার আছে, এটা ট্রাইবুন্যাল খারিজ করে দিলেন। ১৯৫০ সালের গোড়াতে চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন নির্মাণ কারখানার ভিত্তি স্থাপনের পর থেকেই তিনি দুর্গাপুর নিয়ে স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রায় একই সঙ্গে রাজ্য সরকারের পরিচালনায় দুর্গাপুর প্রোজেক্টস ও কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে ও ব্রিটিশ সহায়তায় দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা গড়ে তুললেন। এটি হল ভারতে প্রথম সরকারি উদ্যোগের ইস্পাত নির্মাণ কারখানা। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারিতে তখনকার সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি প্রধান নিকিতা ক্রুশ্চভ ও প্রধানমন্ত্রী মার্শাল বুলগানিনকে ডাঃ রায় নির্মীয়মান দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা ঘুরিয়ে দেখান। ৭৪-৭৫ বছর বয়সের

সন্ধিক্ষণে বিধানচন্দ্র রায় বুঝতে আরম্ভ করছিলেন টেনিসনের কবিতার সেই লাইনটি Sands of time are running out তাই তিনি একসঙ্গে কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের দ্রুত উন্নয়নের জন্য অসংখ্য কাজ হাতে নিলেন। ওইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কল্যাণী উপনগরী হরিণঘাটা দুগ্ধ ও পশুপালন উন্নয়নকেন্দ্র, বেলগাছিয়া দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্প, পাতিপুকুরে লেডি প্রেস্টন কলোনি বা লেকটাউন পত্তন ও পূর্ব কলকাতার বিস্তীর্ণ জলাজমি বা লবণ হ্রদ (সল্টলেক) ভরাট করার কাজ। এরই সঙ্গে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজি করিয়ে বর্ধমান জেলার রূপনারায়ণপুরে 'হিন্দুস্থান কেবলস' স্থাপনের উদ্যোগ নিলেন।

রেলওয়ে পুনর্বিন্যাস

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের ভাবনার সঙ্গে এই রাজ্যের একটার পর একটা সমস্যাও তাঁকে তাড়া করেছে তাঁর সমগ্র মুখ্যমন্ত্রিত্বের জীবনকে। ১৯৫৩ সালে ভারতীয় রেলওয়ের শতবার্ষিকী বছরে ডাঃ রায় জানতে পারলেন যে, রেলওয়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে দেশের রেলওয়ের প্রশাসনকে পুনর্বিন্যাস করার নামে কলকাতা থেকে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ও বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের সদর দফতর দুটিই বিলুপ্ত হচ্ছে এবং এই দুই রেলের অনেক বিভাগ উত্তরপ্রদেশে ও বিহারে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গোপনসূত্রে এই খবরটি পেয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা ডাঃ রায়কে জানান। পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে অবিচার রুখতে ডাঃ রায় আবার তাঁর তরবারি শাণিত করে ছুটলেন দিল্লিতে। এই পরিকল্পনার, প্রধান নায়ক ছিলেন গোপালস্বামী আয়েঙ্গার। কিন্তু সহ-নায়কের ভূমিকায় ছিলেন দুই প্রবল শক্তিশালী মুখ্যমন্ত্রী উত্তরপ্রদেশের গোবিন্দ বল্লভ পন্থ ও বিহারের ডঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ। রেলমন্ত্রী গোপালস্বামী আয়েঙ্গারের সঙ্গে প্রথম বৈঠকে ডাঃ রায় প্রচণ্ড কথা কাটাকাটির মধ্যে বৈঠক থেকে 'ওয়াক আউট' করেন। পরে নেহরুর মধ্যস্থতায় আর একটি বৈঠকে গোবিন্দ বল্লভ পন্থ ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহের সঙ্গে ডাঃ রায়ের খুব রূঢ় বাক্য বিনিময় হয়। তারপর ডাঃ রায়ের সমর্থন নিয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ বারো ঘণ্টার সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল ডাকলেন। এই অবস্থার মধ্যে ১৯৫৩ সালের শেষে অথবা ১৯৫৪ সালের গোড়ায় লালবাহাদুর শাস্ত্রী দেশের রেলমন্ত্রীর দায়িত্ব হাতে পান। লালবাহাদুরকে ডাঃ রায় খুবই স্নেহ করতেন। শাস্ত্রীজি ডাঃ রায়ের সঙ্গে বসে একটা সমাধান সূত্র বের করলেন। সমাধানসূত্র এল এরূপ : ইস্ট ইন্ডিয়ান ও বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের সদর দফতর দুটি কলকাতাতেই থাকবে। ইস্ট ইন্ডিয়ান 'ইষ্টার্ণ রেলওয়ে'

নাম নিয়ে তার নিয়ন্ত্রিত এলাকা থাকবে মোগল সরাই পর্যন্ত, 'বেঙ্গল নাগপুর' 'দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে' নাম নিয়ে তার আওতায় আগের মতো একদিকে ওয়ালটেয়ার ও অন্যদিকে নাগপুর পর্যন্ত থাকবে ও তৃতীয় সাবেক বেঙ্গল-আসাম রেলওয়ের শিয়ালদা ডিভিশনের পুরোটাই যুক্ত হবে ইস্টার্ন রেলওয়ের সঙ্গে। ১৯৫৩ সালে রেলওয়ের শতবর্ষের বছরেই রেলওয়ে বোর্ড দার্জিলিং হিমালয়ান রেলপথ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। রেলওয়ে বোর্ডের যুক্তি হল, এই রেলপথ একটি অতি পরিবহন ব্যবস্থা। আর একদিকে এটি রক্ষণাবেক্ষণের খরচ এত বেশি যে পুরো ব্যবস্থাটাই ক্ষতির উপর দাঁড়িযে। ডাঃ রায় রেলবোর্ডকে জানালেন যে দার্জিলিঙের পাহাড়ি রেল ব্যবস্থা ভারতীয় রেলব্রিজের এক অত্যাশ্চর্য স্থাপত্য কৌশল ও পৃথিবীতে আর কোথায়ও এরকম ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া যাবে না। সুতরাং ভারতীয় রেলের ঐতিহ্যের কথা ভেবেও ওই রেলপথ চালু রাখা দরকার। কিন্তু রেলওয়ে বোর্ড সিদ্ধান্তে অবিচল রইল। তখন ডাঃ রায় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে লিখলেন যে, দার্জিলিঙের পাহাড়ি লোকদের জীবিকার ক্ষেত্র খুবই সংকুচিত। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলপথটি ওই লোকদের কর্মসংস্থানের একটি উৎস। এই রেলে চড়তে যারা পৃথিবী থেকে হাজার হাজার লোক ওখানে আসে। রেলপথটি না থাকলে দার্জিলিঙের উপর ভ্রমণকারীদের আকর্ষণ কমে যাবে। 'রেলওয়ে বলছে যে রক্ষণাবেক্ষণের খরচ অনেক বেশি। তাহলে কোটি কোটি টাকা খরচ করে তাজমহলের রক্ষণাবেক্ষণ কেন করা হচ্ছে? তাজমহল বন্ধ করে দিলেই তো হত!" —ডাঃ রায়ের ওই মন্তব্যের পর নেহরু রেলবোর্ডকে পূর্ব সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে নির্দেশ দেন। ওই সময়ে বেলকর্তৃপক্ষ কালিঘাট-ফলতা ও বেলগাছিয়া দমদম বালিরহাট লাইট রেলওয়ে বন্ধ করেছেন ও রেলের কয়েক হাজার একর জমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে হস্তান্তরিত করেন। এই ব্যবস্থায় ডাঃ রায়ের কোন আপত্তি ছিল না।

দুর্গাপুর উপনগরী নির্মাণ ও নগরীর সম্প্রসারণ ও জনগণের সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য ডাঃ রায় যে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন তাঁর স্থপতি বিদ্যার এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ধরা দেবে। দুর্গাপুরের শিল্পকেন্দ্রগুলিকে ঘিরে উপনগরী গড়ে তুলতে যে ধরনের রাস্তা, পার্ক, ক্রীড়া উদ্যান, বেচাকেনার শ্রেণীবদ্ধ দোকান, বাজার, শিক্ষায়তনগুলির নকশার খুঁটিনাটি ডাঃ রায় চোখ দিয়ে দেখে রূপায়ণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি স্থির করলেন যে, সময় ও জনসংখ্যার সঙ্গে তাল রাখতে গেলে দুর্গাপুর রেল স্টেশনের সম্প্রসারণ দরকার। জি টি রোড থেকে প্রশস্ত চার লেনের সড়ক দুর্গাপুর উপনগরী ও স্টেশনের দিকে মধ্যে ওখানে রেললাইনের উপরে যে ওভারব্রিজ নির্মাণ করা হবে, তার খরচ রেল পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও দুর্গাপুর ইস্পাত নির্মাণ কর্তৃপক্ষ বহন করবে। কিন্তু দুর্গাপুর ইস্পাত নির্মাণ কর্তৃ পক্ষ প্রথম ওভারব্রিজ নির্মাণের এক তৃতীয়াংশ ব্যয়ভার বহন করতে রাজি হয়েও পরে

পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জানিয়ে দেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার এক-তৃতীয়াংশ ব্যয়ভার বহন করতে রাজি নন। এই কথা শুনে ডাঃ রায় এতই চটে গিয়েছিলেন যে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী টি টি কৃষ্ণমাচারি ফোন করে বলেন,"তোমরা কেন্দ্রীয় নেতারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে মধু চুষে নেওয়ার বেলায় খুব পটু, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গকে কিছু দেবার বেলায় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি। এভাবে বেশিদিন চলতে পারে না। আমি জওহরকে সব কিছু লিখে জানাচ্ছি।" এরপর কৃষ্ণমাচারি দুর্গাপুর ইস্পাত কর্তৃপক্ষকে ওভারব্রিজের এক-তৃতীয়াংশ ব্যয় ভার বহন করার নির্দেশ দিলেন। ডাঃ রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন রাজ্যের উন্নয়নের কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে গিয়ে সবিস্ময়ে দেখেছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়নের এমন কোন অঙ্গন নেই, যেখানে বিধান রায়ের ভাবনা কাজ করেনি কিংবা কোন প্রোজেক্ট রিপোর্ট তিনি তৈরি করে দেননি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর যতবার ডাঃ রায় চোখের চিকিৎসার জন্য ইউরোপ গিয়েছেন, ততবারই তিনি সেখান থেকে নিয়ে এসেছেন পশ্চিমবঙ্গের জন্য নতুন নতুন শিল্পভাবনা। পঞ্চাশের যুগের মাঝামাঝি সময়ে যুগোশ্লাভ প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো পশ্চিমবঙ্গ সফরে এলে ডাঃ রায় মার্শাল টিটোর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে গ্যাসভিত্তিক শিল্প সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। মার্শাল টিটো এ ব্যাপারে ডাঃ রায়কে সব রকমের সাহায্যের আশ্বাস দেন। ১৯৫৮-৫৯ সালে ডাঃ রায় ইউরোপ থেকে আমেরিকা যান। তাঁর আমেরিকা সফরের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় তদারকি করার দায়িত্বে ছিলেন 'এয়ার ইন্ডিয়া'র নিউইয়র্কস্থিত বাঙালি অফিসার অশোক দত্ত। অশোক দত্ত মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র ও দীর্ঘকালের আমেরিকা প্রবাসী। ডাঃ রায় নিউইয়র্কের হোটেল থেকে বেলেগ্রেডে টিটোর সঙ্গে ফোনে কথা বলে চূড়ান্ত করেছিলেন দুর্গাপুর গ্যাস গ্রিডের ব্যবস্থাপনা। এক্ষেত্রে আমেরিকা থেকে মার্শাল টিটোর সঙ্গে কথা বলা নিয়ে এক বিষম কূটনৈতিক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। ডাঃ রায় অশোক দত্তকে বললেন যে, এখনই হোটেলের অপারেটারকে বেলগ্রেডে মার্শাল টিটোর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ করিয়ে দেয়। কিন্তু তখন আমেরিকায় কড়া নিয়ম ছিল যে আমেরিকা থেকে কোন সমাজবাদী রাষ্ট্রে ফোন করতে গেলে আমেরিকার পররাষ্ট্র দফতরের (State Department) আগাম অনুমতি দরকার। এই কড়াকড়ির জন্য টিটোকে ফোনে পেতে অপারেটারের দেরি হচ্ছিল। ডাঃ রায় অশোক দত্তের কাছে জানতে চাইলেন কেন বেলগ্রেডের লাইন পেতে দেরি হচ্ছে। অশোকবাবু কারণ ব্যাখ্যা করতে ডাঃ রায় ভয়ানক রেগে গিয়ে অশোকবাবুকে বলেছিলেন, "তুমি আজই আমাকে লন্ডনের প্লেনে চড়িয়ে দাও। আমি লন্ডন থেকে টিটোর সঙ্গে কথা বলব।" বছর খানেক বাদে অশোক দত্ত ডাঃ রায়ের অতিথি হিসাবে কলকাতায় আসেন এবং রাইটার্স বিল্ডিংসে 'প্রেস কর্নার'-এ সাংবাদিকদের কাছে এই চমকপ্রদ ঘটনার কথা বলেন। দ্রুততাই ছিল তাঁর পশ্চিমবঙ্গ শিল্পভাবনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কর্মমুখর মুখ্যমন্ত্রিত্বের জীবনে দুর্গাপুর শিল্পনগরীর পত্তন বারে বারে ঘুরে আসবে। ১৯৫৪ সাল থেকে মাত্র আট বছরের মধ্যে এক দুরন্ত গতিতে তিনি দুর্গাপুর গড়ে দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গকে। দুর্গাপুর শিল্পনগরী ও প্রায় ২৫ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে দুর্গাপুর উপনগরী গড়ে তুলবার দায়িত্ব তিনি তুলে দিয়েছিলেন করুণাকেতন সেন আই সি এসের উপর। করুণাকেতন সেন প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থ বিদ্যার অতি উচ্চমানের একজন ছাত্র ছিলেন। ডাঃ রায় এই অফিসারের বিজ্ঞানমানসিকতাকে অক্ষরে অক্ষরে কাজে লাগিয়েছেন দুর্গাপুর শিল্প নগরীর প্রতিটি ইট ও প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে। বেল (Bell) কাজে একটি ব্রিটিশ বনর্মটিয়াম কোম্পানির কারিগরি সহায়তায় দুর্গাপুর ইস্পাত নির্মাণ কারখানা গড়ে ওঠে। করুনাকেতন সেন হলেন এই কারখানার প্রথম জেনারেল ম্যানেজার। একজন আই সি এস অফিসার একটি ইস্পাত নির্মাণ কারখানাব জেনারেল ম্যানেজার, এই নজির ভারতবর্ষে এই প্রথম। করুণাকেতন সেন তাঁর সিভিল সার্ভেন্টের জীবনের প্রতিভা, মেধা ও চিন্তার উৎকর্ষাতা দিয়ে ডাঃ রায়ের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে গিয়েছেন। সালে ডাঃ রায়ের মৃত্যুর পুরো একটি প্রজন্ম অর্থাৎ পঁচিশ বছর এই দুর্গাপুর বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং বিহারের অন্তর্গত সমগ্র দামোদর উপত্যকার প্রাণকেন্দ্র হিসাবে স্পন্দিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শেষ বিশ বছরে সামগ্রিকভাবে ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বের অবক্ষয় ও দুর্গাপুরকে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প জীবন হিসাবে শক্ত মুঠিতে ধরে রাখার মতো বাঙ্গালি নেতৃত্বের অভাবই বিধানচন্দ্রের প্রাণের ডালাকে শূন্য করে দেখেছে। যে সময় দুর্গাপুরের পত্তন শুরু হয়েছে, ঠিক সেই সময়েই ডাঃ রায় কল্যাণীর দিকে নজর ফেরালেন। ১৯৪১-৪২ সালে এশিয়া রণাঙ্গনে যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তুঙ্গে ও বঙ্গোপসাগর এলাকায় জাপানি আধিপত্য স্থাপিত হয়েছে, তখন মিত্রশক্তি দমদম বিমানঘাঁটি জাপানিদের হাতে পতনের আশংকায় এক বৃহৎ বিমানঘাঁটি গড়ে তুলেছিল কাঁচরাপাড়া রেল লাইনের পাশে। ব্রিটিশ সরকার রাতারাতি কল্যাণী চাঁদমারি ও কাঁচড়াপাড়া মৌজার প্রায় দশ হাজার একর জমির দখল নিয়ে বসতিশূন্য করে ফেলে। গড়ে উঠল আমেরিকান বাহিনীর তত্ত্বাবধানে এক বিমানঘাঁটি, বিরাট সামরিক ছাউনি, রেলওয়ে সাইডিং ও একটি সামরিক হাসপাতাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ও স্বাধীনতা-দেশবিভাগের পর ওই এলাকাটি ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ডাঃ রায় মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ওই এলাকা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। কাঁচড়াপাড়া সামরিক হাসপাতালে একটি ভাল পরিকাঠামো থাকায় তিনি ওই হাসপাতালটিকে টি বি হাসপাতালে রূপান্তরিত করেন। ১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গের দাঙ্গার পর ওই এলাকায় বিশেষ করে রেললাইনের দুই বঙ্গে অসংখ্য উদ্বাস্তু বসতি গড়ে ওঠে। আর একদিকে ওই দাঙ্গা কলকাতা শহর ও পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলে জনসংখ্যার চাপ ভয়ানকভাবে বাড়িয়ে

তোলে। শিয়ালদা থেকে রেলে মাত্র এক ঘণ্টার দূরত্বে অবস্থিত এই কল্যাণীতে তিনি একটি পরিকল্পিত উপনগরী গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন সামরিক বাহিনীর পরিকাঠামো থাকায় প্রারম্ভিক সড়ক সুবিধা ছিল। এছাড়া ছিল সামরিক বাহিনীর পরিত্যক্ত ছোট বড অনেক ছাউনি। ডাঃ রায় মোট চার হাজার একর জমিতে কল্যাণী উপনগরী পত্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন। ওই সময়ে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কংগ্রেস সভাপতিও বটে। ডাঃ রায় নেহরুকে বাজি করালেন ১৯৫৪ সালের কংগ্রেস অধিবেশন কল্যাণীতে অনুষ্ঠান করবে। স্বাধীনতা ও দেশবিভাগের পর খণ্ডিত বাংলার জাতীয় কংগ্রেসেব বার্ষিক অধিবেশন বসল বাংলায় এই প্রথম। ১৯৫৪ সালের জানুয়ারিতে কল্যাণীতে অধিবেশন বসল। এই অধিবেশন উপলক্ষে ঘরবাড়ি, সড়ক নির্মাণ ও রেল স্টেশন নির্মাণের ফলে উপনগরীর কাজ অনেকটা এগিয়ে গেল। রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে গঙ্গার তীর পর্যন্ত কল্যাণী উপনগরীকে দুটি ব্লকে (এ ও বি) বিভক্ত করা হল। পঞ্চাশের যুগের আরম্ভ থেকেই নদীয়া জেলার কল্যাণী, হরিণঘাটা, কাঁচড়াপাড়া ও রানাঘাট এলাকায় উদ্বাস্তু বসতি বৃদ্ধি পাওয়াও সামাজিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ওই উত্তেজনা প্রশমনের একটি পদক্ষেপ হিসাবে কল্যাণী উপনগবী নির্মাণ করে ডাঃ রায চিন্তা করছিলেন ওখানে কৃষি-ভিত্তিক জীবিকা সম্প্রসারণ কীভাবে করা যায়।

১৯৪৪-৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে বাংলার গভর্নর হয়ে এলেন অস্ট্রেলিয়ান আর জি কেসি। তিনি বাংলার অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে কিছু চিন্তাভাবনা করতেন। কৃষিখামার ও পশুপালন ব্যবস্থা ও তার উন্নয়নে বাংলার এই লাট সাহেবের ব্যক্তিগত আগ্রহ খুব বেশি ছিল। তিনি কল্যাণী হরিণঘাটা অঞ্চলের সামরিক বিমানঘাঁটি ও সেনা ছাউনি কয়েকবার দেখে এখানে একটি আদর্শ কৃষিখামার ও পশুপালন এবং দুগ্ধ বিপণন কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা করলেন। তিনি বুঝে নিয়েছিলেন যে কলকাতা শহরের মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার মধ্যে দুগ্ধ সরবরাহ একটি সমস্যা। তিনি অস্ট্রেলিয়া থেকে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ও কয়েক জোড়া গাই-বলদ এখানে নিয়ে আসেন। অস্ট্রেলিয়ান বিশেষজ্ঞরা হরিণঘাটার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করে দেন। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর লাট সাহেব আর জি কেসি দেশে ফিরে যাওয়ায় ওই পরিকল্পনা নিয়ে তিনি আর এগোতে পারেন নি। তিনি স্বদেশে চলে যাওয়ার দেড় বছরের ভারত স্বাধীন হওয়ায় এক নতুন পরিস্থিতি দেখা দিল। ডাঃ রায় কল্যাণী উপনগরী গড়ে তোলার সময় বাংলাব প্রাক্তন লাটসাহেব কেসি সাহেবের পরিকল্পনাটি পরীক্ষা করেন। তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি সচিব করুনাকেতন সেনকে এই বিষয় নিয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে কথা বলতে তিনি নির্দেশ দিলেন। ভারত সরকারের কৃষি সচিব এইচ এম প্যাটেল আই সি এস হরিণঘাটার পরিকল্পনা দেখতে এলেন। রাজ্যের কৃষি সচিব করুণাকেতন সেন, এইচ এম প্যাটেল ও পশ্চিমবঙ্গ সবকারের প্রথম মিল্ক কমিশনার

এল জি সিঙ্কা হরিণঘাটা গিয়ে পরিকল্পনাটি পর্যালোচনা করে তিন হাজার একর জমির উপর এক আদর্শ কৃষিখামার ও পশুপালনকেন্দ্র গড়ে তুলতে প্রারম্ভিক সিদ্ধান্ত নেন। হরিণঘাটা পশুপালন কেন্দ্রের সঙ্গে ডাঃ রায় যুক্ত করেছিলেন কলকাতা থেকে খাটাল অবসানের পরিকল্পনা।

প্রায় একই সময়ে তিনি পঞ্চাশের যুগের মাঝামাঝি সময় পেরিয়ে দুটি বৃহৎ কর্ম পরিকল্পনায় হাত দিলেন। এর একটি হল কলকাতার সম্প্রসারণের জন্য শহরের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকের হাজার হাজার একর জলাভূমির পুনরুদ্ধার। দক্ষিণের বিদ্যাধরী নদীর আটকে পড়া লবণাক্ত জলের (Back water) উপর গড়ে ওঠা এই জলাভূমিতে ছিল হোগলাবন ও হেতাল বন। আর বিষধর সাপের ও কুমির ছানাদের বিচরণ ক্ষেত্র। নোনা জলের জন্য এ জায়গাকে বলা হত লবণ হ্রদ বা Salt Lake। এই লবণ হ্রদ পুনরুদ্ধারের জন্য ডাঃ রায় যুগোস্লাভ ও ওলন্দাজ সরকারের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। যুগোস্লাভ বিশেষজ্ঞরা প্রথম বাগবাজার খাল দিয়ে লঞ্চে করে কৃষ্ণপুর ক্যানেল দিয়ে বিদ্যাধরী নদীর মুখ পর্যন্ত দেখলেন। পরে হেলিকপ্টারে করে উপর থেকে সমীক্ষা করলেন। ঠিক হল, হুগলি নদী থেকেই পলি তুলে সেই পলি দিয়েই ও জলাজমি ভরাট করা হবে। অন্যদিকে এই পলি তোলার ফলে হুগলি নদীর নাব্যতাও বাড়বে। বাগবাজার খাল হুগলী নদীর যেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে, সেখান থেকে বাগবাজার খালের পাড় দিয়ে কয়েক হাজার ফুট বিরাট বিরাট পাইপের সারি টানা হল। তারপর বিদেশ থেকে আনা শক্তিশালী ড্রেজার দিয়ে হুগলি নদীর বুক থেকে তোলা পলি পাইপের মুখ দিয়ে কামানের গোলার মতো বের হয়ে জলাজমিতে পড়তে আরম্ভ করল, তখন উল্টোডাঙ্গা ও বেলেঘাটার হাজার হাজার মানুষ সেই দৃশ্য উপভোগ করত। প্রারম্ভিক পর্যায়ে প্রায় চার হাজার একর জলাজমি পুনরুদ্ধারের জন্য খরচ ধরা হয়েছিল ২০ কোটি টাকা। লবণহ্রদ উপনগরীর পত্তন করে ডাঃ রায় যে আইন পাস করেছিলেন তাতে এই উপনগরী ক্ষয়িষ্ণু বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের বাসভূমি বলেই চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর আশা ছিল এই লবণহ্রদ উপনগরীই রাজ্যের 'দ্বিতীয় রাজধানী' বা Second Capital হয়ে গড়ে উঠবে। তাঁর মৃত্যুর দশ বছর পর এই উপনগরী তাঁর নামানুসারে সরকারিভাবে 'বিধাননগর' বলে চিহ্নিত হলেও দ্বিতীয় রাজধানী হতে পারল না। হতে পারল না সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মধ্যবিত্তদের বাসভূমি।

ওই সময়ের তাঁর দ্বিতীয় কর্মকাণ্ড হল দণ্ডকারণ্য প্রকল্প। ১৯৫৬ সালের শেষে কিংবা ১৯৫৭ সালের গোড়ার দিকে ডাঃ রায় একটি প্রাইভেট বিমানে হায়দ্রাবাদ থেকে ভিজিয়ানাগ্রাম ও দেশীয় রাজ্য বাস্তারের উপর দিয়ে রায়পুর আসছিলেন। গভীর বনাঞ্চলের উপর দিয়ে ডাকোটা বিমানটি উড়ানের সময় ডাঃ রায় পাইলটের কাছে এই এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান জানতে পারলেন। ততদিনে আন্দামানে বাঙালি উদ্বাস্তু পুনর্বাসন পরিকল্পনা সাংঘাতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল

কমিউনিস্টদের আন্দোলনের ফলে। বিমান থেকে এলাকাটি দেখার পর তিনি মানচিত্র দেখে নিয়ে জানতে পারলেন যে মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা ও মহারাষ্ট্রের এই তিনটি রাজ্যের জমি নিয়ে এই দণ্ডকারণ্য অঞ্চল। মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশার জমিই সবচেয়ে বেশি। বনজ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এই অঞ্চলে জনবসতি খুবই কম। তিনি পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কেন্দ্র হিসাবে দণ্ডকারণ্যের কথা ভাবতে লাগলেন। যেহেতু এই এলাকা দেশের মূল ভূখণ্ডের অংশ সেহেতু কমিউনিস্টরা এখানে উদ্বাস্তুদের আসার পথে তেমন বড় বাধা দিতে পারবে না। তিনি প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে তাঁর অভিপ্রায়ের কথা জানালেন। নেহরু মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা ও মহারাষ্ট্র সরকারকে ডাঃ রায়ের অভিপ্রায়ের কথা জানাতে তাঁরা কতগুলি শর্তে বাঙালি উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে সাহায্য করতে রাজি হলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দফতর ডাঃ রায়কে সরাসরি একথা বলে দিল যে, কেন্দ্রীয় সরকার দণ্ডকারণ্যে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে রাজি। কিন্তু সেক্ষেত্রে আন্দামানে বাঙালি উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দাবি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ছাড়তে হবে। ডাঃ রায় আন্দামানের উপর অগ্রাধিকারের দাবি ছাড়তে বাধ্য হলেন। ১৯৫৭ সালের শেষ দিকে ডাঃ রায় কলকাতা থেকে একদল সাংবাদিককে নিয়ে মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর বিমানঘাটিতে নামলেন। ১৯৫৮ সালের প্রথম দিন থেকেই দণ্ডকারণ্য উন্নয়নের কাজ আরম্ভ হল। গঠিত হল মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম চিফ সেক্রেটারি ও ভারতের প্রথম নির্বাচন কমিশনার সুকুমার সেনকে ভারত সরকার দণ্ডকারণ্যের প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত করলেন। দেশবিভাগের পর পশ্চিম পাকিস্তান আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে বিপুল অভিজ্ঞতার অধিকারী মিঃ ফ্লেচার আই সি এস (Mr. Fletcher ICS) নিযুক্ত হলেন এই প্রকল্পের চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার হিসাবে। সেই সময়কার প্রথিতযশা বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার, (যিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কনস্ট্রাকশনবোর্ডের চিফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন) ব্যান্যার্জিকে বিধান পাঠিয়ে দিলেন দণ্ডকারণ্যের চিফ ইঞ্জিনিয়ারের পদে। পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা সরকারের বেশ কিছু বাঙালি অফিসার এই উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজে এসে যোগ দিলেন। ১৯৫৮ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজ আরম্ভ হল পশ্চিমবঙ্গের শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের আগমনের মধ্য দিয়ে। সালের গোড়ার ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার কয়েকটি স্থানে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ হলে প্রায় এক হাজার হিন্দু পরিবার সীমান্তে পৌঁছালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের সরাসরি নিয়ে আসেন দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের জন্য। ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে পূর্ববঙ্গের রাজশাহী ও পাবনা জেলার ব্যাপক দাঙ্গা হয়। এই দাঙ্গায় খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সাঁওতাল ও রাজবংশীরা। হাজার হাজার সাঁওতাল ও রাজবংশীরা পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলায় এসে আশ্রয় নেয়। এক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওই

লোকদের মালদা থেকে সরাসরি ট্রেনে তুলে দণ্ডকারণ্যের পথে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু এসময়ের কমিউনিস্ট ও অন্যান্য কয়েকটি বামপন্থী দল বিভিন্ন স্টেশনে ওই ট্রেনের কামরায় উঠে এই প্রচার চালায় : "দণ্ডকের জঙ্গল থেকে রাবণ সীতাকে চুরি করেছিল। সেখানে এখনও রাক্ষস রাবণেরা মানুষ ধরে ধরে খায়। "এই প্রচারকার্যের ফলে কিছু সংখ্যক সাঁওতাল রাজবংশী উদ্বাস্তু ট্রেন থেকে নেমে পালিয়ে যায়।

পরিকল্পনার ধাঁচ নিয়ে নেহরুর সঙ্গে মতবিরোধ

একটু পিছনে ফিরে যাওয়া যাক। ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জগতে এটা খুবই সুবিদিত যে, কমিউনিস্ট মতবাদে ও সোভিয়েট রাশিয়া ধাঁচে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় বিশ্বাসী যে কয়েকজন প্রথিতযশা ব্যক্তি নেহরুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ তাঁদের অন্যতম। নেহরুর উপর তাঁর প্রভাবও ছিল অপরিসীম। ভারতের বহু বিতর্কিত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রচয়িতা ছিলেন তিনি। ১৯৫৫ সালে নেহরুর অধ্যাপক মহলানবিশকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাঠামো তৈরি করতে বলেন। ১৯৫৫ সালের ২৯মে নেহরু মহলানবিশ কাঠামোর এক সংক্ষিপ্তসার বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে পাঠিয়ে দেন তাঁদের মতামতের জন্য। ডাঃ রায়ও যথারীতি প্রধানমন্ত্রীব দফতর থেকে নেহরুর চিঠির সঙ্গে মহলানবিশ কাঠামোর বয়ান পেলেন। এটাও সকলেরই জানা যে, অধ্যাপক মহলানবিশ তাঁর খসড়ায় সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন দেশে লৌহ-ইস্পাত-সিমেন্ট প্রভৃতি ভারি শিল্প স্থাপনের প্রতি। তাঁর ওই খসড়ার কৃতি প্রধান ভারতবর্ষে কৃষির ক্ষেত্রে কোনই গুরুত্ব দেওয়া ছিল না। গুরুত্ব ছিল না ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসারে। জুন মাসে (১৯৫৪) ডাঃ রায় পরিকল্পনা কমিশনের কাছে নোট পাঠিয়ে মহলানবিশ কাঠামোর বিরোধিতা করে লিখলেন যে, রাজনৈতিক নীতি, আদর্শ ও অর্থনৈতিক প্রবাহে সোভিয়েট ইউনিয়নের পরিকল্পনা রচিত হতে পারে। সেই মানদণ্ডের নিরিখে কখনই ভারতের মতো দেশের জনগণের জন্য পরিকল্পনা রচনা হতে পারে না। ভারতের পরিকল্পনার শিল্প ও কৃষির মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান প্রয়োজন এবং এই প্রশ্নে কখনই কোনভাবে আপস করা চলতে পারে না। কিন্তু নেহরু ও অধ্যাপক মহলানবিশ কেউই ডাঃ রায়ের কথায় কর্ণপাত না করে সোভিয়েট ইউনিয়নের কায়দায় ভারতবর্ষকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে চালাতে চাইলেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অধ্যাপক মহলানবিশ যে বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিলেন, তা থেকে একটি ভারতীয় প্রজন্মও অমৃতময় ফল ভোগ করতে পারেনি। রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন বিধান তাঁর সহজাত কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিতেন দেশের অর্থনৈতিক

উন্নয়নের ক্ষেত্রেও তাঁকে ওই কাণ্ডজ্ঞান পরিচালিত করেছে। অধ্যাপক মহলানবিশের প্রভাবে নেহরু সোভিয়েট ধাঁচের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বিধান সেদিন যে স্বাভাবিক দেশীয় বোধের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা তখন দিল্লি ও কলকাতার বহু লোকেই জেনেছিলেন ও তাঁরা ডাঃ রায়ের মতেরই সমর্থক ছিলেন। কিন্তু বিধান এই মতান্তরকে এক তিক্ত বিতর্কের মধ্যে নিয়ে যেতে চাননি। ফলে তিনি নেহরু মহলানবিশের চিন্তাধারার কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। কিন্তু ইতিহাসের নির্মম পরিহাসে পঁচিশ বছর পর সোভিয়েট ইউনিয়ন নিজেই এক কর্তৃত্বের পরিকল্পনার কুফল বুঝতে পেরে সেই পথ থেকে সরে এসে পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকরণের পথ অনুসরণ করল এবং ভারতবর্ষও অনেক নাকানি চোবানি খেয়ে ওই ভুলের সংশোধন করল। কিন্তু তখন অনেক অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। যাহোক, এর আগে ১৯৫৪ সালের ৩ জানুয়ারি চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন কারখানা থেকে শততম ইঞ্জিনটি বেরিয়ে আসার দিনে ডাঃ রায় রেলমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে নিয়ে চিত্তবঞ্জনে গেলেন। শততম ইঞ্জিনটি যখন পত্রপুষ্প ও আলোক মালায় সজ্জিত হয়ে কারখানা থেকে হুস্ হুস্ শব্দে বেরিয়ে এল, তখন ডাঃ রায় বললেন কীভাবে সশস্ত্র সাঁওতালরা রেলওয়ের সার্ভেয়ারদেব জমির দখল নিতে বাধা দিয়েছিল। সে সময তাঁকে ছুটে আসতে হয়েছিল ও সাঁওতালদের পার্শ্ববর্তী গ্রামে বিকল্প জমি ও ইঞ্জিন নির্মাণ কারখানায় কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শান্ত করতে হয়েছিল।

ওই বছরেই ১৬ ফেব্রুয়াবি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশন চলার সময় রাজ্যেব অধিকাংশ স্কুলের শিক্ষকেরা ধর্মঘটে নামলেন ও ডালহৌসি স্কোয়ারে ১৪৪ ধারা অমান্য করার চেষ্টা কবলেন। পুলিশ তাঁদের লাঠিচার্জ টিয়ার গ্যাস দিযে ছত্রভঙ্গ ও বহু শিক্ষককে গ্রেফতার করল। সন্ধ্যার পর থেকে কলকাতা সাংঘাতিক আকার ধারণ করল। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি এমন একটা জায়গায় পৌঁছাল যে, মাঝরাতে শহরে সামবিক বাহিনীকে তলব করতে হল। ডাঃ বায় নিজে লালবাজারে পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ছুটে গেলেন পরিস্থিতি বুঝতে। ওখানে প্রধানমন্ত্রী নেহরু ডাঃ রায়কে ফোন করে কলকাতাব পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। পরের দিন ডাঃ বিধান রায় পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বিরোধীদের আক্রমণের জবাবে এক ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন "শিক্ষকেরা আজ তাঁদের দাবি আদায়ের জন্য যেভাবে ছাত্রদের কাজে লাগিয়েছেন ও সরকারের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছেন, তাতে এই পশ্চিমবঙ্গে একদিক ছাত্ররাই শিক্ষকদের কাছে বুমেরাং হয়ে আসবে।"

১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ববঙ্গের (পূর্বপাকিস্তান) নির্বাচনে মুসলিম লীগ পর্যুদস্ত হলে সেখানে লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্টের নেতা হিসাবে এ কে ফজলুল হক সাহেব মুখ্যমন্ত্রী হলেন। সুরাবর্দি ও মৌলানা ভাসানির আওয়ামী লীগ ও হক সাহেবের কৃষক প্রজা পার্টির কোয়ালিশন সরকার গঠনের তিন মাসের মধ্যে বাংলার কিংবদন্তি জনপ্রিয় মানুষ ফজলুল হক কলকাতা সফরে এলেন। ২মে (১৯৫৪) তারিখে হক

সাহেব রাইটার্স বিল্ডিংসে এলেন তাঁর পুরানো অন্তরঙ্গ বন্ধু ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করতে। হক সাহেবের কাছে ছিল এটি এক স্মৃতি বিজড়িত আবেগের মুহূর্ত। সতেরো বছর আগে (১৯৩৭) অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের মুখ্যমন্ত্রী (প্রিমিয়ার) হিসাবে এই রাইটার্স বিল্ডিংস ছিল তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। হক সাহেব রাইটার্সে পৌঁছলে ডাঃ রায় দোতলায় লিফটের কাছে দাঁড়িয়ে হক সাহেবকে অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর অবিভক্ত ও বিভক্ত বাংলার এই দুই তেজোদৃপ্ত পুরুষ সরকারি সম্মেলন কক্ষ 'রোটান্ডায়' গিয়ে বৈঠক করলেন। হক সাহেব এই সম্মেলন কক্ষ থেকে বেরিয়ে তাঁর আমলের বহু রিপোর্টারদের দেখে তাঁদের অনেককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বরিশালি কণ্ঠে বললেন, "গঙ্গায় ডুইব্যা গিয়া বুড়ি গঙ্গায় ভাইস্যা উঠছি।" অর্থাৎ ১৯৪৩ সালে তাঁকে গভর্নর স্যার জন হার্বার্ট যেভাবে বরখাস্ত করেছিলেন, তা উপস্থিত সাংবাদিকদের স্মরণ করিয়ে দিলেন। পরে তিনি রিপোর্টারদের বললেন "আমি এটা বুঝি যে দুই বাংলার মানুষের ভাল সম্পর্কের জন্যই দুই বাংলার মধ্যে অবাধ চলাচলের বাধা-নিষেধ দূর হওয়া দরকার। আমি এ ব্যাপাবে একটা কিছু করব এবং আশা করি পশ্চিমবঙ্গের সহযোগিতায় এ সম্পর্কে কাজের কাজ কিছু করতে পারব।" সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা বিধানের প্রশ্নে হক সাহেব একথা বললেন, "আমি দুই বাংলার আমার হিন্দু ও মুসলমান ভাইদের এই আশ্বাস দিতে চাই যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা যাতে একই দেশমাতৃকার সন্তানের মতো সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে, তা আমি অবশ্যই নিশ্চিত করব। ওই উদ্দেশ্য পূরণের প্রথম পর্যায়ে আমি আমার মন্ত্রিসভায় অন্তত দুজন হিন্দু মন্ত্রী রেখেছি।" হক সাহেব তাঁর কলকাতা অবস্থানকালে এলগিন রোডে সুভাষচন্দ্রের পৈতৃক বাড়িতে ও বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের এক সংবর্ধনা সভায় তাঁব অন্তরের স্বচ্ছ অনুভূতিকে প্রকাশ করে বললেন, "দুই বাংলার মানুষের মধ্যে যে কৃত্রিম বাধা নিষেধ তৈরি করা হয়েছে তা আমি ভারতের জনগণের সহযোগিতায় ভেঙে দিতে পারব।" এছাড়া তিনি একথাও বললেন যে, পূর্ববঙ্গ ভারতের সঙ্গে তাঁর আলাদা সম্পর্ক স্থির করবে এবং তিনি পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানিয়ে বললেন, পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে কেবল অর্থ, প্রতিরক্ষা এবং কমনওয়েলথ বাদে পররাষ্ট্র বিষয়। কিন্তু ফজলুল হক সাহেবের ওই নির্ভীক আদর্শবাদিতা তাকে আবার ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিল। ১৯৫৪ সালের ৩০মে পাকিস্তান সরকার তাঁকে বরখাস্ত করে পূর্ববঙ্গ প্রদেশের শাসনভার গভর্নরের অধীনে ন্যস্ত করলেন। ডাঃ রায় হক সাহেবকে দিয়ে দুই বাংলার মানুষের অবাধ যাতায়াতের অন্তবায় 'ভিসা' ব্যবস্থার ছক করার যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

১৯৫৬ সাল যেমন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের রাজনৈতিক জীবনে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ এনেছিল, তেমনি ওই একই রকমের হয়তো আরও সুদূরপ্রসারী চ্যালেঞ্জ জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বের কাছে হাজির করেছিল। তা ছিল রাজ্য পুনর্গঠন

কমিশনের রিপোর্টের ফলশ্রুতি। জাতীয় আন্দোলনের মধ্যভাগ থেকেই ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলির সীমানা পুনর্গঠনের দাবি জানিয়ে এসেছে কংগ্রেস। স্বাধীনতালাভের পর থেকে এই দাবি রাজ্যগুলিতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, ওড়িশায় দক্ষিণ ভারতের তেলুগু ও মালয়ালিভাষী অঞ্চলে, বোম্বাই প্রদেশের মারাঠাবাদ অঞ্চলে ও মধ্যপ্রদেশের মারাঠীভাষী এলাকার ওই দাবি জোরালো হয়ে উঠেছিল। ভারত সরকার এই সব দাবি বিবেচনা করে রিপোর্ট দিতে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠন করলেন ১৯৫৪ সালে। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন পাটনা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি স্যার সৈয়দ ফজল আলি ও সদস্য ছিলেন সর্দার কে এম পানিক্কর ও পণ্ডিত হৃদয় নাথ কুঞ্জুরু। ১৯৫৫ সালের শেষদিকে কমিশন ভারত সরকারের কাছে যে রিপোর্ট পেশ করল তাতে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে পশ্চিম ভারতের মারাঠাবাদ অঞ্চলে ওড়িশার আগুন জ্বলে উঠল। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও হয়ে উঠল অগ্নিগর্ভ। পশ্চিমবঙ্গকে ওই আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য ডাঃ রায় পাটনা ছুটে গেলেন ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের সঙ্গে বৈঠক করে এক যুক্ত বিবৃতিতে বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব দিলেন। (যে পরিস্থিতিতে বিধান রায় ওই প্রস্তাব দিয়েছিলেন ও যে পরিস্থিতির মধ্যে তিনি ওই প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তা এই গ্রন্থে আগে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে)। লোকসভার বামপন্থী সদস্য বিজ্ঞানী ডঃ মেঘনাদ সাহার আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর উত্তর কলকাতার শূন্য আসনে উপনির্বাচন হল মে মাসে (১৯৫৬)। পশ্চিমবঙ্গ বিহার সংযুক্তি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস বিরোধী দলগুলি যখন আন্দোলনে উত্তাল, তখন ডাঃ রায় ঘোষণা করলেন যে, উপনির্বাচনের রায় যদি কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে যায়, তাহলে তিনি ওই রায় মেনে নিয়ে বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেবেন। কারণ, উপনির্বাচনে এটাই ছিল পশ্চিমবঙ্গের 'ইস্যু'। ৩মে উপনির্বাচনের ফল ঘোষিত হল। বামপন্থী প্রার্থী মোহিত মৈত্র কংগ্রেসপ্রার্থী অশোক সেনকে প্রায় ৩৬ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করলেন। ফল ঘোষণার অব্যবহিত পরেই ডাঃ রায় সংযুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিলেন। ৪মে (১৯৫৬) তিনি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহকে পরিস্থিতি সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে এক চিঠি দিয়ে বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাবের সমাপ্তি ঘটালেন। ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে ডাঃ রায় প্রধানমন্ত্রী নেহরু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ ও কংগ্রেস সভাপতি ইউ এন ডেবরকে অবহিত রাখলেন। উল্লেখযোগ্য যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির জন্য ডাঃ রায়ের প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রায় ও কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ ভারতে ওড়িশায় ও বোম্বাই গুজরাটে যে আগুন জ্বলেছিল তাতে প্রতি এক হাজার মানুষের প্রাণনাশ হয়েছিল। সরকারি বিশেষ করে রেলের সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছিল কয়েক হাজার কোটি টাকার। পশ্চিমবঙ্গ ওই কমিশনের রায়ে পেয়েছিল বিহারের মানভূম

জেলার পুরুলিয়া মহকুমা (চাসনালা বাদে) ও পূর্ণিয়া জেলার ইসলামপুর থানা। পশ্চিমবঙ্গ সর্বসাকুল্যে জমি পেল ৩ হাজার ৮১২ বর্গ কিলোমিটার ও লোকসংখ্যা পেল দশ লাখের কিছু বেশি। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস একথাই বলবে যে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রায়ের পর জাতির ঐক্যের অস্তিত্ব যেভাবে ধাক্কা মেরেছিল, তা ছিল দেশবিভাগের পরে সবচেয়ে বড় ধাক্কা। ডাঃ রায়ের পরাভূত বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব অন্তত পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারকে সেই অগ্নির ঘৃতাহুতি থেকে রক্ষা করেছিল। এই বছরগুলিতে অর্থাৎ ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে বন্ধ আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব তথা বিশ্ব রাজনীতির বহু কর্ণাধারকে ডাঃ রায় তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে প্রভাবিত করেছেন। এঁরা হলেন সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান নিকিতা ক্রুশচভ, সোভিয়েট ইউনিযনের প্রধানমন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন, যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো, ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসি, মিশরের প্রেসিডেন্ট কর্নেল নাসের, আফগানিস্তানের রাজা মহম্মদ জাহির শাহ, বর্মার প্রধানমন্ত্রী উ-নু থাইল্যান্ডের প্রিন্স নরোত্তম সিহানুক, সিংহলের (শ্রীলংকা) প্রধানমন্ত্রী সলোমন বন্দরনায়ক। তাঁর আমলে কলকাতা বিমান বন্দর ছিল অন্যতম আন্তর্জাতিক বিমান বন্দব। পৃথিবীর কোন দেশই তখন কলকাতাকে অবহেলা করতে পারত না। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে পাকিস্তানের দুই বাঙালি প্রধানমন্ত্রী ডাঃ রায়ের ব্যক্তিগত আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমজন বগুড়ার মহম্মদ আলি। তিনি ১৯৫৫ সালের শেষদিকে অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার বিমানে খুব বড় রকমেব যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য দমদম বিমানবন্দরে আটকে পড়েন। অবিভক্ত বাংলার একসময়কার অর্থমন্ত্রী মহম্মদ আলির বাবা ও ঠাকুর্দা ডাঃ রাযের ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন। মহম্মদ আলি বিমানবন্দরে আটকে পড়েছেন, এই খবর পেয়েই ডাঃ রায় অফিসারদের পাঠিয়ে মহম্মদ আলি ও তাঁব স্ত্রীকে ওযেলিংটন স্কোয়ারের বাড়িতে নিয়ে এলেন ও তাঁদের মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করলেন। আর একবার ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী শাহিদ সুরাবর্দির সঙ্গে ডাঃ রায়ের দমদম বিমানবন্দরে এক একান্ত বৈঠক হয়। এই বৈঠকে সুরাবর্দিকে লেখা নেহরুর একটি ব্যক্তিগত চিঠি ডাঃ রায় সুরাবর্দির হাতে তুলে দেন। চিঠিটি ছিল মিশরে সুয়েজ খাল কোম্পানি জাতীয়করণ করার পর মিশরের উপর ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের যুক্ত আক্রমণ সংক্রান্ত। সুরাবর্দি ওই সময় জাপান সফর করে করাচি ফিরছিলেন। নিকিতা ক্রুশ্চেভ ডাঃ রায়ের ব্যক্তিত্বে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উল্লেখ করে ডাঃ রায়কে ভারতের অন্যতম জাতীয় নেতা বলে চিহ্নিত করেছিলেন। মার্শাল টিটোর ক্ষেত্রেও তাই। ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে মার্শাল টিটোর কাছ থেকে অনেক ব্যক্তিগত সহযোগিতা পেয়েছিলেন। ১৯৬২ সালে ডাঃ রায়ের মৃত্যু সংবাদ জেনে ওই দুই রাষ্ট্রনায়ক প্রধানমন্ত্রী নেহরুর কাছে তাঁদের ব্যক্তিগত দুঃখ ও শোক জ্ঞাপন

করেছিলেন।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের বাংলার অন্যতম সৃজনশীল প্রতিভা সত্যজিৎ রায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর উপন্যাস 'পথের পাঁচালি' চিত্রায়িত করতে গিয়ে নিদারুণ অর্থসংকটে পড়লেন ১৯৫৪ সালে। ডাঃ রায় ওই সময়ে তাঁকে সরকারিভাবে অর্থ সাহায্য করলেন। ঠিক ওই সময়ে তিনি বাংলার আর এক সৃজনশীল প্রতিভা নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। রানীক্ষেতে উদয়শঙ্করের নৃত্য একাডেমি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলে ডাঃ রায় উদয়শঙ্করকে বিভিন্নভাবে আর্থিক সাহায্য করলেন এবং উদয়শঙ্কর ও অমলাশঙ্করকে তিনি কলকাতায় তাঁদের একাডেমি স্থানান্তরণের জন্য উৎসাহিত করলেন। এসময়ে ১৯৫৫ সালের গোড়ায় ডাঃ রায় একবার হৃদরোগের আক্রান্ত হলেন। কিন্তু ১৯৫৭ সালের আগেই তিনি দ্রুত সেরে উঠে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের (১৯৫৭) জন্য পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসকে নতুনভাবে সংগঠিত করতে উদ্যোগী হলেন। ১৯৫৭ সালের নির্বাচন ডাঃ রায় ও সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে কংগ্রেসের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। একদিকে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু স্রোত অব্যাহত গতিতে পশ্চিমবঙ্গে আসছে ও বামপন্থী বিশেষ করে কমিউনিস্টরা তাদের দ্রুত ভোটার হতে সাহায্য করছে। অন্যদিকে ১৯৫৩ সালের এক পয়সার ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিরোধ আন্দোলন ও ১৯৫৪ সালেব শিক্ষক আন্দোলন শহরাঞ্চলে কংগ্রেসকে রাজনৈতিকভাবে দুর্বল কবে ফেলেছিল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালিদের এক অংশ কমিউনিস্টদের দ্বারা প্রভাবিত ও অন্যদিকে কমিউনিস্ট নয় কিন্তু তীব্র কংগ্রেসবিরোধী এরকম দলগুলিও কতকটা শক্তিশালী হয়ে ওঠায় ডাঃ রায় ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষ উদ্বিগ্ন হযে পড়লেন। এই পরিস্থিতিতে বামপন্থীবা সম্মিলিতভাবে গান্ধীবাদী নেতা ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে সামনে রেখে রাজ্যে একটি অকংগ্রেসি বিকল্প সরকারের গঠনে ডাক দিল। ওই বছরে ফেব্রুযারি মাসের গোড়ায় পূর্ব কলকাতার বেলেঘাটায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির (এ আই সি সি) অধিবেশন বসল। সে সময় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মোট আসন সংখ্যা ছিল ২৫১। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচনের দিন স্থির হল। প্রধানমন্ত্রী নেহরু তিন তিনবার পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী এলেন। ডাঃ রায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষের সঙ্গে সারা পশ্চিমবঙ্গ চষে ফেললেন। কিন্তু তাঁর নিজের নির্বাচন কেন্দ্র বউবাজার অবহেলিত হল যথারীতি। এই নির্বাচনে কংগ্রেস বিরোধী যে ফ্রন্ট গড়ে উঠেছিল তারা কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ট্রাম কর্মী মহম্মদ ইসমাইলকে নিয়ে কমিউনিস্টরা অত্যন্ত গর্হিত সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় প্রচার আরম্ভ করল। ওই সময় বউবাজার কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৬৫ হাজারের কিছু বেশি। তার মধ্যে মুসলিম ভোটারদের সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে ২৯ হাজার। কমিউনিস্টরা এই প্রচার চালাতে লাগল "ইসমাইলকে ভোটে জেতাও, তাহলে ইসমাইল সাহেব মুখ্যমন্ত্রী

হবে। কলকাতা শহর মুসলমানেরা ও পাকিস্তান ফিরে পাবে।" আবার অন্যদিকে উদ্বাস্তু কলোনিগুলিতে কমিউনিস্টদের প্রচার ছিল এরকম, "দেশবিভাগের জন্য কংগ্রেসই দাযী, কংগ্রেসই এদেশে মুসলমানদের ফেলে যাওয়া ঘর বাড়িতে রিফিউজিদের ঢুকতে দিচ্ছে না", এই পবস্পরবিরোধী প্রচারের মধ্যে ১ মার্চ (১৯৫৭) ভোট হল। চৌরঙ্গিতে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া'র অফিসে বউবাজার কেন্দ্রের ভোট গণনা আবম্ভ হল। গণনায় এক সময়ে ডাঃ রায় মহম্মদ ইসমাইলের চেয়ে কয়েকশো ভোটে পিছিযে থাকার খবর বিদ্যুৎ গতিতে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল। কলেজ স্ট্রিট অঞ্চল থেকে কমিউনিস্ট 'লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের এক মিছিল চলল ভোট গণনা স্থলেব দিকে। কলকাতাব উর্দু কাগজগুলিতে এভাবে খবর বের হল "ইসলামেব পদতলে হিন্দুর শির ঢলে পড়ল..."। শহরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দিল। শেয পর্যন্ত পোস্টাল ভোট গণনার ডাঃ রায় মাত্র ৫৪০ ভোটে জিতলেন। ভোটের ফল ঘোযণার পর কয়েক হাজার কংগ্রেস সমর্থকদের সঙ্গে কমিউনিস্ট মিছিলকারীদের প্রচণ্ড মারামারি বেধে গেল। পুলিশ টিযাবগ্যাস শেল ফাটিয়ে ও ১৪৪ ধাবা জারি করে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ কবলে। দিল্লিতে উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত নেহরু ভোট গণনাফলেই থেকে ডাঃ বায়কে অভিনন্দন জানালেন ও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

১৯৫৭ সালেব নির্বাচনেব ফলাফলে পশ্চিমবঙ্গে শহবাঞ্চলে কংগ্রেস কিছুটা ধাক্কা খেলেও গ্রাম এলাকায় কংগ্রেসের জন সমর্থন একবকম অটুটই ছিল। শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত অধ্যুষিত এলাকায় কংগ্রেসেব ভোট কমায় ডাঃ বায কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে রাজ্যেব উন্নয়নের পুনর্বিন্যাসের কথা ভাবতে লাগলেন। এই সময এ আই সি সি'র 'ইকনমিক বিভিউ'তে এরকম একটা ইঙ্গিত দেওয়া হল যে, দেশের একটি নতুন প্রজন্ম স্বাধীনতার পরবর্তী দশ বছরে কংগ্রেসেব কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই সমীক্ষায নেহরু এতটা বিচলিত হযে পড়লেন যে, তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর পদত্যাগেব চিন্তার কথা জানালেন। তিনি বললেন, দেশের সামনে কংগ্রেসের কোন বিকল্প নেই। সুতরাং তিনি "কংগ্রেসের শরীরে নতুন রক্তস্রোত প্রবাহিত করার জন্য" কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। নেহরুর এই চিন্তায় ডাঃ রায় এতই বিচলিত হয়েছিলেন তিনি বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রীদের অবিলম্বে দিল্লিতে যেতে অনুরোধ করলেন। (সেই সময় একমাত্র কেরল রাজ্যেই কমিউনিস্টরা সরকার গড়েছিল)। বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা ডাঃ রায়ের সভাপতিত্বে এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিলেন যে "কোন অবস্থাতেই জওহরলালকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে যেতে দেওয়া হবে না।" সেইসময 'শঙ্করস উইকলি'তে (Shankar's Weakly) ব্যঙ্গ চিত্রশিল্পী শঙ্করের হাত থেকে একটি অবিস্মরণীয় কার্টুন বেরিয়েছিল। কার্টুনটি ছিল এরকম . ডাঃ রায় একটি মোটা লম্বা দড়ি দিয়ে জওহরলাল নেহরুকে চেয়ারের সঙ্গে কযে বাঁধছেন

ও অন্যান্য মুখ্যমন্ত্রীরা ডাঃ রায়কে দড়ি ধরে এগিয়ে দিচ্ছেন। যাহোক, ডাঃ রায় বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের জন্য নতুন চিন্তাভাবনা আরম্ভ করলেন। এ সম্পর্কে ডাঃ রায়ের ভাবনা ছিল এরকম : কলকাতা শহর ও তার পঁচিশ ত্রিশ মাইল এলাকার যে বিপুল জনসংখ্যা রয়েছে তাদের ৭০ ভাগই হল সাবেক পূর্ববঙ্গের লোক। চলতি কথায় 'দেশ' বলতে যা বোঝায়, তা এদের কাছ থেকে ধবাছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছে. কিন্তু এই লোকদের অনুভূতিতে ওই অস্তিত্ব অটুট। এই মানসিক কাঠামো সামাজিক উত্তেজনার একটি বড় উৎস। এজন্য এই লোকদের ক্ষেত্রে উন্নততর বাসস্থানের বন্দোবস্ত কবা সবচেয়ে জরুরি। এই চিন্তা থেকেই ডাঃ রায় দ্রুত কল্যাণী উপনগরীর কাজ শেষ করার উপর জোর দিলেন। পাতিপুকুবে 'লেডি প্রেস্টন কলোনি' নামক এলাকার জমি ভরাট করে ঘরবাড়ি নির্মাণ আরম্ভ করলেন। আরম্ভ করলেন পূর্ব ও উত্তর কলকাতায় একাধিক হাউজিং এস্টেটের কাজ। কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টকে দিয়ে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও শ্রমিকদের জন্য একাধিক আবাসন প্রকল্পের সূচনা করলেন। সল্টলেক জমি ভরাট কবার কাজের গতি বাড়িয়ে দিলেন। গঙ্গার দুই পাড়ে হুগলির বাঁশবেড়িয়া থেকে চব্বিশ পরগনা জেলাব বজবজ পর্যন্ত সমগ্র এলাকার নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য পরিকল্পনা রচনা করতে গড়ে তুললেন কলকাতা মেট্রপলিটন প্লানিং অর্গানাইজেশন (সি এম পি) ও ডাঃ রায় বিশ্বাস করবেন যে, ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলের মানুষদের জন্য বাসগৃহ ও নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য যতটা বেশি করা যাবে, ততই রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্তেজনা কমবে। পরিণতিতে আইন-শৃংখলা রক্ষায় সবকারের খবচের পরিমাণও কমবে। এই সামাজিক লক্ষ্য নিয়েই তিনি সল্টলেকের জমি বণ্টন কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত বাঙালিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে নিয়মবিধি বচনা করে বিধানসভায় বিবৃতি দিয়েছিলেন। ১৯৫৭ সালের ১ জুলাই তাঁর ৭৬ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে প্রদেশ কংগ্রেসের আয়োজিত অনুষ্ঠানে সে সময়কার অগ্রগণ্য কংগ্রেস নেতা দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এস কে পাতিল ও গুলজারিলাল নন্দা যোগ দেন। তাঁরা ডাঃ রাযকে এই বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন, "ভারতবর্ষে রাজনৈতিক নেতা, চিকিৎসক ও রাষ্ট্রনেতা হিসাবে ডাঃ রায়ের সমকক্ষ লোক খুব কমই আছেন। ইতিহাস তাঁকে স্মরণ করবে এক মহান জাতির একজন স্থপতি হিসাবে।" এই অনুষ্ঠানে ডাঃ রায়কে তাঁর বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কংগ্রেস কর্মীবা ৭৬ হাজার টাকা উপহার দেন। ডাঃ রায ওই পুরো টাকা তুলে দেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষের হাতে কংগ্রেসের নতুন বাড়ি নির্মাণের জন্য।

সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সঙ্গে রাজনৈতিক মন কষাকষি

১৯৫৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে ডাঃ রায় তাঁর রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনে একটি বড় আঘাত পেলেন। ১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের সময় তিনি রাজ্যের কংগ্রেস নেতৃত্বের ভবিষ্যতের কথা ভাবছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে রাজ্যের জনগণের কাছে যেসব কংগ্রেস নেতা নেতৃত্বের অধিকার নিয়ে যেতে পারে। তাঁদের বয়স ৫৫ থেকে ৭৫ বয়সের মধ্যে। তাঁদের পরে একটা বড় শূন্যতার জায়গা তিনি দেখতে পেলেন। তিনি ৩৫ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে কিছু লোক খুঁজছিলেন যারা নিজেদেব এক পবিচয় নিযে দেশের মানুষের কাছে নেতৃত্বের দাবি নিয়ে দাঁড়াতে পাবেন। তাঁর দৃষ্টি পড়ল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দৌহিত্র সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের উপর। দেশবন্ধুর কন্যা অপর্ণা দেবীর এই পুত্রটিকে ডাঃ রায় শৈশব থেকে স্নেহ কবে আসছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টার হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে আরম্ভ করেছেন সিদ্ধার্থশংকব রায়। ডাঃ বায় সিদ্ধার্থবাবুকে কংগ্রেস রাজনীতিতে টেনে আনলেন।

১৯৫৭ সালের নির্বাচনে তিনি সিদ্ধার্থকে ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কবার জন্য বেছে নিলেন। নির্বাচনের পর তিনি সিদ্ধার্থকে তাঁর মন্ত্রিসভায় বিচারমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করলেন। সিদ্ধার্থবাবুব বয়স তখন মাত্র ৩৬ বছর এবং প্রথম ধাপেই ডাঃ রাযেব মন্ত্রিসভায় পা দিয়েই ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মর্যাদা পাওয়ায় সিদ্ধার্থবাবুর রাজনৈতিক গুরুত্ব বেশ বেড়ে গেল। সিদ্ধার্থবাবুও সরকারি কাজকর্ম শিখছিলেন ও বিভিন্ন আইন প্রচারে খসড়ার মুসাবিদায় তালিম নিচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ১৯৫৮ সালেব ৯ মার্চ ডাঃ রায সিদ্ধার্থবাবুর কাছ থেকে এক পাতার একটি পদত্যাগপত্র পেলেন। যে আক্রমণাত্মকভাবে পদত্যাগপত্রটি লেখা তাতে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ডাঃ বায অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তবু তাঁর আস্থা ছিল, তিনি তাঁর প্রায় অর্ধশতাব্দীর পারিবারিক সম্পর্কের জোরে সিদ্বার্থকে তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে সরিয়ে আনতে পারবেন। ডাঃ বায় সিদ্ধার্থবাবুর বেলতলা রোডের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করার অনুবোধ জানালেন। কিন্তু সিদ্ধার্থবাবু তাঁর অনুবোধ তো শুনলেনই না, বরং ডাঃ বাযের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করলেন। কিন্তু তবুও ডাঃ রায় হাল ছাড়লেন না। তিনি দেশবন্ধুর অনুজ ও পার্টনার বিখ্যাত ব্যারিস্টার পি আর দাশের শরণাপন্ন হলেন যাতে দাশ সাহেব সিদ্ধার্থবাবুর উপর চাপ সৃষ্টি করেন। পি আর দাশ তাঁদের পরিবারের অকৃত্রিম বন্ধু বিধানের অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থবাবুকে ফেরাতে পারেননি। ২৪ মার্চ রাজ্য বিধানসভায় সিদ্ধার্থবাবু এক সাংঘাতিক বিবৃতি দিযে ডাঃ রায়, খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন, স্বরাষ্ট্র পুলিশ মন্ত্রী কালিপদ মুখার্জি ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোযের বিরুদ্ধে কতগুলি মারাত্মক অভিযোগ তুললেন। ঘটনার অব্যবহিত পরে দিল্লিতে

সাংবাদিকেরা প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে সিদ্ধার্থবাবুর বিবৃতি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি মন্তব্য করেছিলেন "এটা একজন ক্রুদ্ধ যুবকের (Angry young man)" কাজ। নেহরু সিদ্ধার্থবাবুর বিবৃতিকে আদৌ কোন আমল দিলেন না। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি থেকেই বিরোধীরা ডাঃ রায়কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ধাক্কা দিয়ে কোণঠাসা করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এবার বিরোধীরা তাদের আক্রমণের পক্ষে এমন একজনকে হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিল যাঁর বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও ডাঃ রায় কোন ব্যক্তিগত প্রত্যাঘাত করতে পারবেন না। এটাই ছিল বিরোধী দলগুলির বড় চাতুরি। ২৭ মার্চ (১৯৫৮) বিরোধী দলগুলি ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বিধানসভায় এক অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন। বিরোধী নেতাদের প্রবল আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে নিকম্পচিত্তে ৭৫ বছরের বৃদ্ধ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় শান্ত ও অনুত্তেজিত কণ্ঠে এই জবাব দিয়েছিলেন—"সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁর সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই। এই বিতর্কে আমার বিরুদ্ধ পক্ষের সদস্যেরা এমন সব কথা বলেছেন যে যেন আমি কোনভাবে দায়ী নই (...not villian of peace)। কিন্তু তাঁরা এটা সন্দেহাতীতভাবে জানুন যে, আমি রাজনৈতিকভাবে আমার সরকারের হয়ে কথা বলছি। আমার যে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিরোধীদের সকল অভিযোগ পরিচালিত, আমি যে সব বিষয়ের সকলকিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করছি। আমার যে দুজন মন্ত্রীকে বারংবার আক্রমণ করা হয়েছে, তাঁরা এমন সব বিষয়গুলি দেখাশোনা করছেন যে সব কাজ সমাজের সব ব্যক্তিবিশেষদেরই করতে হয়। যে মানুষ বহু কাজের বিপুল বোঝা মাথায় নিয়ে চলেন, তাঁকে খুঁজে বের করে গালাগালি দেওয়া খুব সহজ।" ডাঃ রায় রাত সাড়ে নটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত এক উদ্দাম ও উত্তপ্ত বিধানসভায় তাঁর সরকারের বক্তব্য পেশ করার পর রাত সোয়া এগারোটা নাগাদ ভোটাভুটিতে অনাস্থা প্রস্তাব খারিজ হয়ে যায়। এর কয়েকদিন পরে সিদ্ধার্থবাবু ভাবানীপুর কেন্দ্র থেকে তাঁর বিধান সভার সদস্যপদ ত্যাগ করেন। তিন মাস পর ওই কেন্দ্রের উপনির্বাচনে সম্মিলিত কংগ্রেস বিরোধী দলগুলির প্রার্থী হিসাবে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় কংগ্রেস প্রার্থী মেয়র বিজয় কুমার ব্যানার্জিকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে রাজ্যের রাজনীতিতে কমিউনিস্টদের শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য করলেন। এটা বোধ হয় ভাগ্যের নির্মম পরিহাস যে পরবর্তী প্রায় দুটি প্রজন্মের কমিউনিস্টরা সিদ্ধার্থবাবুকে তাদের চরম শত্রু বলে গণ্য করেছেন। দেশ বিভাগের পর বঙ্গ রাজনীতির এটা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা। সিদ্ধার্থবাবু যদি কখনও অকপটে তাঁর রাজনৈতিক স্মৃতি বিশ্লেষণ করেন, তাহলে তাঁকে স্বীকার করতেই হবে যে, ১৯৪৮ সাল থেকে বাংলায় কংগ্রেসকে দুর্বল করে কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখলের যে কৌশল জাল বিস্তার করেছিল, সিদ্ধর্থবাবু ১৯৫৮ সালে সেই জালেই ধরা পড়েছিল।

পঞ্চাশ সাল থেকেই পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বিরোধী দলগুলি আগস্ট

ও সেপ্টেম্বর মাসকে সরকার বিরোধী বিক্ষোভের সময় হিসাবে বেছে নিয়েছে। ওই সময় গ্রাম এলাকায় দিন মজুরদের কাজ থাকে না চাল ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। এছাড়া সর্বোপরি উদ্বাস্তুরা তো রয়েছেই। ১৯৫৯ সাল দেশবাসী খাদ্যসংকট দেখা দিলে পশ্চিমবঙ্গ বর্ষা আরম্ভের পরপরই এর প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পডল। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী অজিতপ্রসাদ জৈন ২৩ আগস্ট ১৯৫৭ লোকসভার এক বিবৃতি দিয়ে বললেন যে, সরকার দেশের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সমস্যার মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নেহরু অজিতপ্রসাদকে সরিয়ে এস কে পাতিলকে খাদ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্টরা ও অন্যান্য কংগ্রেসবিরোধী দলগুলি রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের অপসাবণ চাইলেন। প্রফুল্ল সেনকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য কমিউনিস্টরা নেহরুর কাছে গোপন দরবার করলেন। নেহরুও বিধানকে ওই প্রস্তাব বিবেচনা করতে বললেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় এক ইঞ্চিও নড়লেন না। ৩১ আগস্ট বিকালে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বিরোধীদলগুলি এসপ্লানেড ইস্টে এক বড় জমায়েত করল। তারপর সেখান থেকে বিরোধী নেতারা মিছিল নিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংসের দিকে এগিয়ে চললেন। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের কাছে ১৪৪ ধারা এলাকায় পুলিশ মিছিলকারীদের বাধা দিল। বিক্ষোভকাবীদের সঙ্গে পুলিশের তুমুল খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হল। লাঠি ও টিয়ার গ্যাস দিয়ে বিক্ষোভকারীদের নিরস্ত করতে না পেরে পুলিশ গুলি চালাল। সন্ধ্যার পর থেকে সারা শহবে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। রাতের দিকে কংগ্রেস অফিসগুলি ও মানিকতলা এলাকায় অতুল্য ঘোষের বাড়ি আক্রমণের চেষ্টা হল। ১ সেপ্টেম্বর (১৯৫৭) একদল ছাত্র বিক্ষোভকারী ডাঃ রায়ের বাড়ি আক্রমণের চেষ্টা করল। চেষ্টা হল খাদ্য দফতরে হামলা করার। পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় সামরিক বাহিনীকে তলব করা হল। প্রায় বারোদিন ব্যাপী খাদ্য আন্দোলনে পুলিশ ও সৈন্যদের গুলিতে ৩১ জন লোক নিহত হল। আহত হল তিন শতাধিক লোক। আন্দোলন বেশিদিন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না দেখে আন্দোলনের নেতারা ৮ সেপ্টেম্বর ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করে প্রস্তাব দিলেন যে, খাদ্যমন্ত্রী হিসাবে প্রফুল্ল সেনকে সরিয়ে দিলেই আন্দোলন প্রত্যাহার করা যেতে পারে। ডঃ রায় তাঁদের সাফ সাফ জবাব দিলেন যে প্রফুল্ল সেনের অপসারণের দাবি তিনি কিছুতেই মানবেন না। তাঁর যতদিন প্রয়োজন ততদিনই তিনি প্রফুল্ল সেনকে খাদ্যমন্ত্রীর পদে রাখবেন। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি নাগাদ ঘূর্ণিঝড় ও ভয়াবহ বন্যা দক্ষিণবঙ্গকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেল। বন্যার বিপর্যয় দেখতে নেহরু এলেন। ডাঃ রায় নেহরুকে নিয়ে পরপর তিনদিন নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুরের বন্যা বিধ্বস্ত এলাকাগুলি বিমানে ও হেলিকপ্টারে সফর করলেন। প্রধানমন্ত্রী নেহরুর এই সফরে ডাঃ রায় তাঁর খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। সেই সময় ত্রাণ দফতরও প্রফুল্ল সেনের

অধীনে ছিল। বিমানে নেহরু পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে যত কথা জানতে চেয়েছিলেন, তার সবগুলির জবাব দিয়েছিলেন প্রফুল্ল সেন। পরে শোনা গিয়েছিল নেহরু তাঁর এই সফবেব সময়ে ডাঃ রায়কে বলেছিলেন "প্রফুল্লকে আমাকে দিয়ে দিন..." ডঃ রায় নাকি সহাস্যে জবাব দিয়েছিলেন, "কেন? আপনি তো কমিউনিস্টদের কথা শুনে প্রফুল্লকে তাড়িয়ে দিতে বলেছিলেন।"

১৪

জীবনের শেষ অধ্যায় ঃ সাফল্যের চূড়ায় বিধান (১৯৫৯-৬২)

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জীবনের শেষ তিন বছর অর্থাৎ ১৯৫৯ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে ১৯৬২ সালের জুন পর্যন্ত সময়ে তিনি ছিলেন সাফল্যের শীর্ষে। দীর্ঘ ১৪ বৎসর যেসব সমস্যাসমূহ তাঁকে ব্যস্ত রেখেছিল তা প্রায় সবই সমাধান হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিমবাংলার অর্থনীতি তুঙ্গে। বেকার সমস্যা আর নেই। তাঁর সামনে কোন আভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ নেই। জাতীয় রাজনীতিতেও তাঁর স্থান অত্যন্ত সম্মানজনক। তবে পশ্চিমবঙ্গে ও জাতীয় রাজনীতিতে ঘটে যাওয়া কতগুলি ঘটনা ডাঃ রায়কে খুবই ব্যস্ত করে তুলেছিল। এদিকে ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মৃত্যুর পর নেহরুর ব্যক্তিগত নিঃসঙ্গতা খুব বেড়ে যায়। ফলে মনের দিক থেকে ও নির্ভীক পরামর্শের জন্য ডাঃ রায় ছাড়া নেহরুর কাছে আর তেমন কেউ রইলেন না। ১৯৫৯ সালের গোড়া থেকেই কেরলের প্রথম কমিউনিস্ট সরকার জনসাধারণের রোষ ও বিদ্বেষের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়ে। কমিউনিস্টদের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে জনগণর প্রতিবাদও বিক্ষোভ এমন এক জায়গায় চলে যায় যে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভার সহকর্মিবৃন্দ রাস্তাঘাট অবাদে চলাফেরা করতে পারছিলেন না। প্রতিদিনের বিক্ষোভ মিছিল ও ধর্মঘট হরতালে কেরলের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। ভারতের হতচকিত কমিউনিস্ট পার্টি এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজছিল। ইন্দিরা গান্ধী তখন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি কেরল সফর করে এসে কেরলে রাষ্ট্রপতির শাসনেব দাবি জানালেন। কিন্তু কেরলের রাজ্যপাল ডঃ বি রামকৃষ্ণ রাও নেহরুকে রাষ্ট্রপতিব শাসন জারি না করার পরামর্শ দিলেন। কারণ কমিউনিস্ট সরকারের পদত্যাগ অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। নেহরু ডাঃ রায়ের পরামর্শ চাইলেন। ডাঃ রায়ও কেরলের রাজ্যপালের মতকেই জোরালো সমর্থন জানালেন। এর পরেই ইন্দিরা গান্ধী ত্রিবান্দ্রমে এক বিরাট জনসভার তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্য কেরলে রাষ্ট্রপতি শাসনের জন্য আবার দাবি জানালেন। ইন্দিরা ত্রিবান্দ্রম থেকে ফেরার পর নেহরু রাজ্যপাল ডঃ বি রামকৃষ্ণ রাওকে দিল্লি ডেকে পাঠালেন। জারি হল রাষ্ট্রপতির শাসন। বিরক্ত হয়ে ডাঃ রায় রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি অতুল্য ঘোষকে ডেকে এমন কথা

বলেছিলেন, "কমিউনিস্টদের বিক্ষোভ মিছিল তো আবার এ মাসেই হবে। ওদেব নিজের রাজ্যে তো ওরা রাস্তায় বের হতে পারছে না।" ঠিক তাই হয়েছিল, দু'তিন ধরে কমিউনিস্টরা কেরলে রাষ্ট্রপতির শাসনের 'প্রতিবাদে' কলকাতায় জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিল করল। দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে যখন এই অবস্থা। তখন সীমান্তেব খুব কাছেই চীন অধিকৃত তিব্বতে তিব্বতীদের অবিসম্বাদিত ধর্মগুরু দলাই লামার অনুগত খাম্পা (Khampa) সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে চীনাদের সংঘাত আরম্ভ হল।

১৯৫০ সালে চীন তিব্বতের দখল নেওয়ার পর থেকেই ভারত ও চীনের প্রচলিত আন্তর্জাতিক সীমান্ত ম্যাকমোহন লাইন (Mcmohan line) নিয়ে চীন বিতর্ক তুলল। নেহরু ১৯৫৪ সালে চীন সফরের সময় ও ১৯৫৬ সালে বান্দুং সম্মেলনে (Bandung Conference) চীনের সঙ্গে পঞ্চশীলের বৌদ্ধ আদর্শ অনুযায়ী একাধিক চুক্তি করলেও চীন ম্যাকমোহন লাইনকে ভারত ও চীনের সীমানা বলে মানতে রাজে হল না। এদিকে তিব্বতীদের ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করা দলাই লামার সঙ্গে চীনা কমিউনিস্টদের সম্পর্কের অবনতি ঘটতে আরম্ভ করল। লাসাতে দলাই লামার প্রাসাদের ও দলাই আত্মীয় পরিজনদের নিরাপত্তার দায়িত্ব যুগ যুগ ধরে খাম্পাদের উপর ন্যস্ত ছিল। কিছু চীনা সৈন্যেরা খাম্পাদের সরিয়ে প্রাসাদের দায়িত্ব নিতে চাইলে খাম্পারা প্রতিরোধ করল। ফলে তিব্বতে সশস্ত্র খাম্পা বিদ্রোহ দেখা দিল। বহু চীনা সৈন্য মারা গেল। চীনা ট্যাঙ্ক বাহিনী লাসা শহর ঘিরে ফেলল। কয়েকহাজার খাম্পা বিদ্রোহী সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত শহর কালিম্পঙ পৌঁছানো সঙ্গে বহুসংখ্যক আহত খাম্পা বিদ্রোহীদের নিয়ে এল। চীনা সরকার খাম্পা বিদ্রোহীদের চীনের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানালেন। ভারত সরকার ওই দাবি প্রত্যাখ্যান করলেন ও নেহরু লোকসভায় জানালেন, মানবিক কারণেই খাম্পাদের কালিম্পঙে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে এবং যে দেশ থেকে ভগবান বুদ্ধ তাঁর বাণী দেশে দেশে প্রচার করেছিলেন, সে দেশ কখনই বুদ্ধ অনুগামীদের তাড়িয়ে দিতে পারে না। চীনা সরকার সরকারিভাবে কালিম্পংকে দায়ী করলেন "চীনাবিরোধী ষড়যন্ত্রের অন্যতম ঘাঁটি" হিসাবে। এই অবস্থায় ডাঃ রায় দার্জিলিং জেলার প্রশাসনকে শক্তিশালী করলেন ও তিব্বতী শরণার্থীদের জন্য উত্তরবঙ্গের কয়েকটি স্থানে নতুন শরণার্থী শিবির স্থাপন করলেন। এ সময়েও নেহরু প্রতিনিয়ত ডাঃ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছিলেন। এদিকে খবর পাওয়া গেল দলাই লামা তাঁর মা (বোন) আত্মীয় পরিজনদের নিয়ে গোপনে লাসার প্রাসাদ ত্যাগ করে ভারত সীমান্তের দিকে রওনা হয়েছেন। চীনের সঙ্গে অসম ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে উচ্চ সতর্কতা আরোপ করা হল। ডাঃ রায় ওই অঞ্চলে দলাই লামার আগমন ঘটলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে তা অনুমান করে বহু অভিজ্ঞ ও পদস্থ অফিসারকে শিলিগুড়ি ও দার্জিলিঙের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত দলাই লামা অসম সীমান্তের

বম-ডিলা অঞ্চলে দিয়ে ভারতে প্রবেশ করলেন। তাঁকে সেখান থেকে আমিনগাঁওতে এনে ভারতীয় কর্তৃত্বে ট্রেনযোগে শিলিগুড়ি নিয়ে আসেন। শিলিগুড়িতে ট্রেন বদল করে দলাই লামা তাঁর সঙ্গীদের উত্তরভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এই কাজটি ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গের অফিসারদের দিয়ে নিপুণভাবে সম্পন্ন করালেন। নেহরু ও ডাঃ রায় উভয়েই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন সেদিন। কারণ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এশিয়া ভূখণ্ডের এটি ছিল এক অন্যতম রাজনৈতিক ঘটনা।

এদিকে চীনের সঙ্গে যখন ভারতের সীমান্ত সম্পর্কের ক্রমাবনতি অব্যাহত, তখন কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার কয়েকটি ছিটমহল বিশেষ করে বেরুবাড়ি ছিটমহল পাকিস্তানকে দেওয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ডাঃ রায়ের এক সাংঘাতিক সংঘাত দেখা দিল। ১৯৫৮ সালের অক্টোবরের গোড়ার জেনারেল আয়ুব খাঁ পাকিস্তানে ক্ষমতা দখলের কয়েকদিন আগে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খাঁ নুন দিল্লিতে আসেন। সেই সময় দেশের পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তের কিছু সংখ্যক মৌজা ও ছিটমহলের বিনিময় ও হস্তান্তর নিয়ে নেহরু ও নুনের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী পূর্ব-পাকিস্তানের রংপুর জেলার অন্তর্গত দহগ্রাম ছিটমহল অধিকার পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহাব জেলাকে দেওযার কথা। অন্যদিকে হলদিবাড়ি রেলস্টেশন সংলগ্ন বেরুবাড়ি ছিটমহল পূর্ব পাকিস্তানের রংপুর জেলাকে হস্তান্তর করার কথা। লোকসভায় নেহরু-নুন চুক্তি অনুমোদিত হল। কিন্তু ডাঃ রায় বেরুবাড়ির ৭০-৭৫ হাজার ভারতীয় নাগরিককে পাকিস্তানের হাতে তুলে দিতে অস্বীকাব করলেন। আন্তর্জাতিক রীতি অনুযায়ী নেহরু ওই চুক্তি পালন করতে ডাঃ রায়কে চাপ দিতে লাগলেন। পশ্চিমবঙ্গে বেরুবাড়ি হস্তান্তর বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠল। ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বেরুবাড়ি হস্তান্তরের বিরুদ্ধে এক সর্ব-সম্মত প্রস্তাব পাস করালেন। ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্ট বেরুবাড়ির ভারতীয় ভূখণ্ড পাকিস্তানকে হস্তান্তরের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর এক ইনজাংশন জারি করল। নেহরু ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থের সঙ্গে ডাঃ রায়ের সম্পর্কের ভয়ানক টানা-পোড়েন